

৫

কিম্বা কিম্বা মুজিব

Who Killed Mujib?

এ. এল. খতিব



liberationwarbangladesh.org

উৎসর্গ

হাসিনা ও রেহানা

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

হু কিল্ড মুজিব

লেখক ■ এ.এল. খতিব

অনুবাদ ■ আবিষ্কার অনুবাদ সেল

সম্পাদনা ■ ফরিদ আহমেদ দুলাল

প্রচ্ছদ ■ সারা টোফিকা

প্রথ্যাত শিল্পী শাহাবুদ্দিনের আংকা ছবি অবস্থানে

প্রকাশক ■ এসডি আসান

আবিষ্কার

২৫৩-২৫৪, কনকর্ত এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

প্রকাশকাল ■ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

© ■ আবিষ্কার

বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণ ■ মেঘদৃত

২৫৩-২৫৪, কনকর্ত এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

মুদ্রণ ■ মিলিন অফসেট প্রেস

৯ নীলক্ষেত্র বাবুপুরা, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

মূল্য ■ চারশত টাকা

ISBN 978 984 8962 15 2

Who Killed Mujib

by

A.L. Khatib

Edited by FARID AHMED DULAL

Published by ABISHKAR

Concord Emporium Shopping Complex

Kantabon, Dhaka-1205

Phone: +88-02-9674099

E-mail: abishkarpublication@yahoo.com

Price : Tk. 400 Or \$ 10.00 only

Printed in Bangladesh

এ এল খতিব

ঢাকা থেকে হঠাত একটা চিঠি এল—ইংরেজিতে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি সংকলন বার হবে। চিঠির নিচে লেখা এএল খতিব। চিঠি চালাচালি চলতে লাগল বেশ কিছুদিন। এক সময়ে সংকলন গৌণ হয়ে তার জ্ঞানগা নিল সৌহার্দ্য। অবশ্য চাকুৰ আলাপ তারও পরে। কলকাতায় আমার বাল্যবন্ধু কালীসাধন দাশগুপ্তের বাড়িতে। অনেকদিন পর একবার সেই সংকলনের কথা ওঠায় খতিব দৃঢ়ৰ করে বলেছিল প্রকাশক না পাওয়ায় ওর গোটা পরিশ্রমটাই মাটে মারা গেছে।

খতিবের দেশ কোথায়, বাড়িতে কে আছে না আছে, এমন কি বিয়ে করেছে কিনা, হিন্দু না মুসলমান, খৃষ্টান না বৌদ্ধ—এসব জিগ্যেস করার কথাও কোনোদিন মনে হয় নি। আশেশব কলঘোর—গুধ এইটুকুই জ্ঞানতাম। ও যে মারাঠী, সমুদ্রে কাজের সূত্রে ওর বাবা থাকতেন শ্রীলঙ্কায়—এসব পরে জেনেছি। সেই কবে করাটী থেকে ঢাকায় এসেছিল। তারপর আর পাকিস্তানে ফিরে যায় নি। বাংলা না বললেও একটানা বিশ বছর ধরে বাঙালীর সঙ্গেই ছিল তার সমানে ওঠাবসা।

দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর খতিবের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল স্বাধীন বাংলাদেশে। একটা হাফ হাতা বুশ শার্ট, পাঞ্জুন আর চঞ্চল—এই ছিল তার বরাবরের পোশাক। রাত পোহাতেই প্রেস ক্লাবে হানা দিয়ে খতিবকে আমি খুঁজে বার করলাম। ততদিনে খতিব হয়ে গেছে মনে প্রাণে বাঙালী। বাংলা বোকে কিন্তু ইংরেজি বলে। আমাকে নিয়ে গিয়ে প্রেস ক্লাবের দোতলায় তার সাবেক ঘরটা দেখাল। দেয়ালে প্রকাও একটা গর্ত। পাক সৈন্যরা ঐ ঘর লক্ষ্য করে গোলা দেশেছিল। ওর দৃঢ়ৰ, তাতেও ওর প্রচুর দামী দামী বই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এরপর ‘বাংলাদেশ অবজার্ভার’ এর নিজস্ব সংবাদদাতা হয়ে খতিব চলে আসে দিল্লীতে। সাহিত্য আকাদেমির সভায় প্রায়ই তখন আমাকে দিল্লী যেতে হত। দিল্লীতে খতিব যখন যেখানেই থাকুক আমি ঠিক খুঁজে বার করতাম। ঐ কয়েকটা বছরে আমাদের পুরনো বস্তুত আমরা নতুন করে ঝালিয়ে নিয়েছিলাম। তখন দেখেছি, দিল্লীতে থাকলেও ওর মন পড়ে থাকত ঢাকায়।

আবার একটা ভালো সময় আসবে বাংলাদেশের। খতিব তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাহলেই সে আবার ঢাকায় ফিরে যেতে পারবে। মুঞ্জিব যেদিন খুন হল সেদিন আমি দিল্লীতে। খতিবের চোখ থেকে আমি সেই প্রথম আগুন ঠিকরোতে দেখি।

সম্পত্তি বলতে খতিবের ছিল শুধু বই। পাকিস্তানী গোলায় একটা বড় অংশ পুড়ে গেলেও, ঢাকা থেকে চলে যাওয়ার সময় নিজেকে ফতুর করে বিমানভাড়া দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ছটা স্টিলের ট্রাক ভর্তি বই।

জাহাজের ক্যাটেন হয়ে দরিয়ায় ভেসে বেড়ানো ছিল খতিবের ছেলেবেলার স্মৃতি। অন্দুরে ফেরে হল স্থলবন্দী কলম-ঠেলা সাংবাদিক, কিন্তু সারাটা জীবন সে ছিল লেখক হওয়ার অপেক্ষায়। যখন ওর প্রথম বই ছাপা হয় তখন ওর ঘোল বছর বয়স। কবিতার বই। নাম 'হাইসপারিং স্টারস'। সাইনিশ বছর পর সেই বই আবার সে নতুন করে ছাপিয়েছিল বোধহয় এটাই জানাতে যে, সাহিতাই তার জীবনের পাটরাণী। শীঘ্ৰ প্রকাশিতব্যের তালিকায় ছিল তার আরও তিনটি ইংরিজি বই। 'যেখানে শাপলা হাসে' (প্ৰবন্ধ সংকলন), 'ধূলোৱ আলপনা' আৱ কালৈবেশাৰী' (উপন্যাস)। সঞ্চীব দণ্ডেৰ কাছে খতিবের অপ্রকাশিত আৱও পাতুলিপিৰ খবৰ মিলবে।

হঠাতে হৈ কৈ কৈ বেৰিয়ে গেল 'হু কিন্তু মুজিব'। তিন মাস বেস্টসেলারেৰ কোঠায় থাকতে থাকতে অতৰ্কিতে সে বই বেপাতা হয়ে গেল। পাকিস্তানে বেৰিয়ে গেল তাৰ অনন্মোদিত উৰু সংক্ৰণ। কপাল পুড়ল খতিবেৰ। ন্যায্য পয়সাৰ কিছুই সে পেল না। বাংলা তর্জমাৰ অনুমতিই মিলল না। এৱ পৱেৱ বই তৈৱি হচ্ছিল—হু কিন্তু জিয়া'। তাৱও শেষৱৰক্ষা হল না।

সাংবাদিক, কবি এওল খতিব এৱ জনু ভাৱতেৰ মহারাষ্ট্ৰেৰ রঞ্জগিৰি জেলায়। কেউ বলেন কলমো। কেউবা বলেন মারাঠী। তিনি তাৰ সাংবাদিকতাৰ জীবনও শুভ কৈবল্যে কলমোতেই ১৯৪০-এ। 'শিলং ডেইলি নিউজ' পত্ৰিকায় কিছু কাজ কৰাৰ জন্য তিনি যুক্ত হন টাইম অব শিলং'-এৰ সাথে। ১৯৫৫তে তিনি পাকিস্তানেৰ কৱাচীতে 'ডেইলি অবজাৱভাৱ' পত্ৰিকাক উপসম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুৰু কৈবল্যে। কৱাচী থেকে তিনি বদলি হয়ে চলে আসেন বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে)। পৱেৱতী সময়ে এওল খতীব 'দি ডেইলি মাৰ্শিং নিউজ' পত্ৰিকায় কাজ কৈবল্যে এবং ১৯৮০তে একই পত্ৰিকা থেকে অবসৱ গ্ৰহণ কৈবল্যে। ১৯৮০-তে অবসৱ গ্ৰহণেৰ পৱে বাংলাদেশ অবজাৱভাৱ পত্ৰিকাক প্ৰতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন কৈবল্যে ভাৱতেৰ প্ৰতিনিধি হিসেবে।

তাৰ সাংবাদিকতা জীবনে অভিজ্ঞতাৰ আলোতেই এওল খতীব রচনা কৈবল্যে 'হু কিন্তু মুজিব' গ্ৰহণ কৈবল্যে। এওল খতীব-এৱ শেষ জীবন কাটে অৰ্ধকটে। অকৃতদাৰ সাংবাদিক এওল খতীব ১৯৮৪তে দিল্লীতে মৃত্যুবৰণ কৈবল্যে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, যিনি গোটা জাতিকে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে চেতনার সেই শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে যান, যে শীর্ষবিন্দুতে দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা-ভিন্ন বিকল্প কিনুর চিন্তাও করেনি; যে চেতনা নিরন্তর বাঙালি জাতিকে সশ্রেষ্ঠ যুক্তে প্রাণিত করেছিলো এবং নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুক্তে ত্রিশলক প্রাণ, দুইলক্ষ মা-বোনের সম্মত ও গোটা জাতির সীমাহীন দুর্ভোগের মূল্যে কেনা বিজয়ের পৌরবে ভাস্বর করে তুলেছিলো; তারই মহানায়ক জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান বিজয়ের মাঝ সাড়ে তিনি বছরের মাথায় কতিপয় ষড়যন্ত্রকারী উচ্চাভিলাসী সেনাকর্মকর্তার হাতে সপরিবারে শহীদ হন। আপাতদৃষ্টিতে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের দুর্ঘটনাটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা হলেও এর সাথে নানান আন্তর্জাতিক চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল ছিলো বলেই জানা যায়। বাঙালি জাতি যে চেতনায় ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো, ১৫ই আগস্টের সেই পৈশাচিক ঘটনার পর জাতি যেন হঠাতে কক্ষচূড় হয়ে পড়লো, হঠাতে যেন বিপরীত স্থানে এগিয়ে যেতে চাইলো; চললো স্বার্থেকার আর ক্ষমতালিকার নানা ষড়যন্ত্র, চললো ইতিহাস বিকৃতির অপসংস্কৃতির কৌশল; কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা ভুলে গিয়েছিলো, ইতিহাস তার নিজের নিয়মেই চলে এবং যা ইতিহাসের অনুষঙ্গ তা কোথাও না কোথাও অবিকৃত অবস্থায়ই থেকে যায়। অনুসন্ধানী মানুষ তাকে ঠিক খুঁজে পায়।

১৯৮৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর পূর্বাংশের মানুষের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রেক্ষাপটে এ অংশের মানুষের আন্দোলন-সংগ্রাম, বিশেষত আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধুর মেত্তত, ৬ দফা দাবী উপস্থাপন, ১১ দফার সাথে সংহতি, আইয়ুব বান-এর সামরিক শাসন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯-এর গণ আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, আওয়ামী লীগ-এর নিরঙুশ বিজয়, ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খানের গড়িয়েসি, ৭ই মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ২৫ শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর পৈশাচিক হামলা, বিপ্লবী সরকার গঠন, পাকিস্তানে কারাগারের অক্ষকার সেল-এ বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষা, বিজয়ীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ, ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে ষড়যন্ত্র, ১৫ই আগস্টের নির্মতা, ১৫ই আগস্ট পরবর্তী খন্দকার মোতাকের সরকার, স্বাধোবিত খুনিদের প্রতি নানান কৌশলে সহানুভূতি প্রদর্শন, তরো নভেম্বর জেলখানার নিরাপদ প্রহরায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা, খালেদ মোশাররফের বিদ্রোহ, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার বিদেশে অবস্থান এবং প্রাণে বেঁচে যাওয়া, কর্নেল তাহেরের বিচারের প্রহসন, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন, ভারত-বাংলাদেশ-রাশিয়া-চীন সম্পর্কের টানাপোড়েন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর রাজনৈতিক অঙ্গে টিকে থাকার সংগ্রাম, ১৯৮১-তে শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন এবং আওয়ামী

লীগ-এর দায়িত্ব প্রহণ ইত্যাদি নানান প্রসঙ্গ বিভিন্ন তথ্য-উপাস্ত এবং ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে তুলে ধরেছেন কলঘোর সাংবাদিক, এ.এল খতীব তাঁর 'হু কিন্ড মুজিব' শিরোনামের বিশ্লেষণধর্মী প্রচ্ছে। এ.এল খতীব রচিত প্রচ্ছটি নয়া দিল্লীর ভিক এস পাবলিকেশন হাউস থেকে ১৯৮১-তে প্রকাশিত হয়।

নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত এ.এল খতীবকৃত ইংরেজি বইটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাস যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি ইতিহাসের সড়ক-মহাসড়কের পাশাপাশি অলিগলির সকানও রয়েছে, রয়েছে ঘটনা পরম্পরার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও। অত্যন্ত প্রাঞ্চল ভাষায় লিখিত প্রচ্ছটি সাধারণ বাঙালি পাঠকের সামনে তুলে ধরতেই আবিক্ষার প্রকাশন এর অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ প্রহণ করেছে। অনুবাদ কর্মে 'আবিক্ষার অনুবাদ সেল' যেমন যথার্থই আন্তরিক এবং সৎ ধাকতে সচেষ্ট থেকেছে, সম্পাদনা কর্মে বঙ্গানুবাদকৃত পাতুলিপিটির মূল বক্তব্য ঠিক রেখে ভাষা বিন্যাস এবং বানানরীতিতে অভিন্নতা রাখতে আমি তেমনি সচেষ্ট থেকেছি মাত্র। সে প্রেক্ষিতে অনুবাদকর্মের ভূমিকা ধাকলেও সম্পাদনাকর্মের তেমনি কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই, তারপরও বাংলাদেশের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর অবদান ও সংগ্রাম, বাঙালি জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং আত্মোৎসর্পণের লিখিত এই দলিলের সাথে নিজের নামের সম্পৃক্তিও কম গুরুত্বের নয়, সেই প্রতীতিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি।

এ.এল খতীবকৃত 'হু কিন্ড মুজিব' প্রচ্ছের অনুবাদ যখন প্রকাশিত হচ্ছে ততদিনে মুজিব হত্যা মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে, কারা এ জগন্য হত্যাকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে যুক্ত ছিলেন তা-ও আজ প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত। যদিও দণ্ডাণ বেশ ক'জন পলাতক ধাকার কারণে তাদের দণ্ড কার্যকর করা যায় নি; কেউ কেউ বিচার প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করায় রেহাই পেয়েছেন; তারপরও প্রকাশিত দীর্ঘ রায় থেকে জানা যায় এ.এল খতীব তার প্রচ্ছে সরাসরি না হলেও যাদের কথা ইঙ্গিত করেছিলেন তারাই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

এছ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সম্পৃক্ত থেকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ও আবাসিক ওবেইদ আগীরদার আমাদের এ উদ্যোগের তত সূচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন; তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশের পাঠকের কাছে বইটি সমাদর পেলে মূল্যবান এ তথ্যবচ্ছ এছ প্রকাশনার সাথে নিজেদের অকিঞ্চিত শ্রমকে মহার্ঘ বিবেচনা করবো। আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণের অঙ্গিকার; সেই প্রত্যাশায়-

বিমীত
ফরিদ আহমদ দুলাল

সূচিপত্র

- ক্রান্তিকাল ১১
মোন্টাকের প্রস্তাৱ ২৮
পাকিস্তানি সুৱ ৪৫
একটি পারিবারিক বিষয় ৬০
এমন লোকেৱা বিপদজনক ৭৯
জয় বাংলা! ৯৪
ক্ষমতা ও ভণামী ১১৪
বিজয়ীৱ প্ৰত্যাবৰ্তন ১২৪
আচ্যেৱ সুইজারল্যান্ড ১৩৮
আমাৱ ভালোবাসা নিও ১৪৯
একজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব ১৬২
রাজনীতিৰ কবি ১৬৯
একটি বিশেষ সম্পর্ক ১৭৯
রাজনৈতিক মধ্যস্থভোগীৱা ১৮৯
মাওবাদী মাওলানা ১৯৮
একটি নতুন বিশ্ব ২০৮
অন্তর্জাতিক ছায়া ২১৫
ছিতীয় বিপ্লব ২৩৬
বিভৎস ২৪৫
পৱিলিষ্ট ২৪৮

ত্রান্তিকাল

আগস্ট ১৯৭৫ ছিল বাংলাদেশের জন্য ত্রান্তিকাল। শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসনে ব্যাপক রান্বদল করাইলেন এবং এমন সব পদক্ষেপ নির্ছিলেন যা সমাজে গুরুতর প্রভাব রাখছিল। দেশে তখন একটি মাত্র রাজনৈতিক দল ছিল- বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। বাকশালে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ দেশের সর্বত্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং বাকশাল দেশের প্রশাসনের অবিজ্ঞেন্দ্র অংশ হতে যাচ্ছিল। ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্নরবুন্দ নিজ নিজ জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমলাদের গুরুত্ব কমে আসবে। সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে দেশের জেলা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত করার পরিকল্পনা ছিল। এটি ছিল একটি বিপুর্বী পদক্ষেপ।

১৪ আগস্ট ১৯৭৫ এর সক্ষ্যাটি অন্যান্য দিনের চেয়ে আলাদা মনে হয়নি।

পরদিন শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতি চলছিল।

১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে একটি কালো পতাকা মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে শেখ মুজিবকে ঘেঁঠার করা হয়েছিল। পরের বছর শেখ মুজিবকে আবার ঘেঁঠার করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নত্তরের কর্মচারিদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে। যখন তিনি মৃত্যু হন তখন তিনি জানতে পারেন তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিকার করা হয়েছে।

পরদিন সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি উপস্থিত হবেন চ্যাম্পেলর হিসেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি ঘোনেড ফোটার প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবকে আগমনের সময় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চে রাতে বাঙালিদের উপর পাক বাহিনীর আক্রমণের পর থেকেই ঘোনেড হামলা আর বোমা বিস্ফোরণ ঢাকাবাসীর জন্য নিত্যনিলের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এ কারণে কারোই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত না। তবুও অনেক ধরণের গুজব শোনা যাচ্ছিল...।

রাত সাড়ে আটটার দিকে শেখ মুজিবকে গণভবন থেকে তার নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন।

শেখ মুজিবের দশ বছর বয়সী পুত্র রাসেল খুবই উত্তেজিত ছিল। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রিলিপাল পরদিন সকালে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানানোর জন্য যে হয়জন স্কুল ছাত্রকে বাহাই করেছেন তার মধ্যে রাসেল একজন।

কাদের সিদ্ধিকী, যাকে মৃত্যুবন্ধে অসম সাহসিকতার জন্য বাধা সিদ্ধিকী নামে ডাকা হতো, তিনি ছিলেন বিভিন্ন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্নরদের মধ্যে একজন। ১৪ আগস্ট সক্ষ্যায় তিনি যখন তার অসুস্থ মাকে দেখতে পি জি হসপিটালে যান

তখন কারওয়ান বাজার এলাকায় একটি ট্যাক্স দেখতে পান। রেডিও স্টেশনের আয় বিপৰীত দিকে হসপিটালের কাছে আরও একটি ট্যাক্স ছিল। মাকে দেখার পর কাদের সিদ্ধিকী গাড়ী চালিয়ে মতিঝিলে যান। সেখানেও একটি ট্যাক্স দেখতে পান: এক কিলোমিটার ব্যাসার্দের মধ্যে তিন তিমটি ট্যাক্স। তিনি ফিরে যেতে শুরু করেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনসিটিউটের কাছে আরও একটি ট্যাক্স অবস্থান করছিল, যা হাসপাতাল থেকে বড় জোড় ২০০ মিটার দূরে। তখন রাত ১১ টা বেজে একটু বেশি। কাদের সিদ্ধিকী গাড়ী নিয়ে শের-এ-বাংলা নগরে গণভবনের কাছে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে যান। রক্ষীবাহিনীর উপ-পরিচালক আনোয়ারুল আলম শহীদ তাকে জানান বেঙ্গল ল্যাঙ্গারকে তিনটি ট্যাক্স বের করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ঢাকার রাস্তায় চারটি ট্যাক্স কেন দেখা যাচ্ছে। জবাবে শহীদ জানান, “আপনি হয়ত একটি ট্যাক্স দুবার দেখেছেন।” হতে পারে। শহীদ একজন সাবেক ছাত্রনেতা এবং তিনি মুক্তিযুক্ত সংগ্রহীতাবে অংশ নিয়েছিলেন। তার কথায় সদেহ করার কোন অবকাশ ছিল না।

প্রতি বৃহস্পতিবার রাতেই কুটিন করে ট্যাক্স মহড়া অবৃষ্টিতে হতো এবং মাসে দুবার বেঙ্গল ল্যাঙ্গার ও সেকেন্ড আর্টিলারি যৌথ মহড়া করত।

কাদের সিদ্ধিকীর বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। তিনি তার বোনকে সকালে তাকে ঘুম থেকে ডাকতে নিষেধ করেন। বেশ কিছুদিন ধরেই গৰ্ভনরদের ট্রেনিংয়ের জন্য তিনি খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরদিন এক মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম সমাপ্ত হবার কথা, যে অনুষ্ঠানে সব মন্ত্রীদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল।

কাজেই পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার কোন প্রয়োজন ছিল না।

রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তাবিধান ব্রিলিয়ার জামিল সেদিন একটি বিশ্রামহীন রাত কাটান। তার জ্বী অসুস্থ ছিলেন আর এর মধ্যেই পরদিন সকালে তাকে রাষ্ট্রপতিকে প্রহরা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটি তার জন্য নতুন কোন দায়িত্ব ছিল না, তবুও তিনি বেশ অস্বত্ত্বে ছিলেন। তাকে মাঠ পর্যায়ের গোয়েন্দা ইউনিটের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে তখন পর্যন্ত তার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হত্তাত্ত্ব করা হয়নি। জামিলের স্ত্রী তাকে ঘুমাতে বলেন। জবাবে জামিল বলেন ‘আমি ঘুমাতে পারছি না।’

খন্দকার মোস্তাক আহমেদও সেদিন নির্ধূম রাত কাটান। পুরোনো ঢাকার ৫৪ আগামসি লেনে তার বাসায় সেদিন অনেক দর্শনার্থী এসেছিলেন। আগত দর্শনার্থীদের একজন ছিলেন তার ভাতিজা মেজের রশিদ।

সে রাতে তাহের উদীন ঠাকুরও প্রচণ্ড উত্তেজিত ছিলেন। যে কোন ফোন কল আসা যাই তিনি আঁতকে উঠেছিলেন। নামায পরে তিনি নিজের স্নায় ঠাণ্ডা রাখার

চেষ্টা করছিলেন। রাতে গোসল করে তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন, যেন ঐ অসময়েই তার কোন একটি বৈঠকে যাওয়ার কথা রয়েছে। বাড়িতে আসা একজন অতিথি তার এহেন উদ্বেগিত অবস্থা দেখে বেশ অবাক হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানানোর সর্বশেষ প্রস্তুতি চলছিল, সেখান থেকে শেখ মুজিবের পুত্র কামালের ফিরে আসতে মধ্যরাত পার হয়ে যাব। একই সময়ে ঢাকা সেনানিবাসেও একটি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের সর্বশেষ প্রস্তুতি চলছিল।

রাতের অন্ধকার থাকতেই কর্নেল ফার্মক বেঙ্গল ল্যাঙ্গারের জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, এসব জওয়ানদের বুনিদের ছোট দল হিসেবে শিকারে যাবার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তিনি নিজে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোষাকে ঢাকা বেঙ্গল ল্যাঙ্গারের জওয়ানদের দেখতে লাগছিল মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট এর শয়তানের দঙ্গলের মত।

ফার্মক জওয়ানদের মধ্যে আগুন আর বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি জওয়ানদের বলেন শেখ মুজিব বিদেশী শক্তির কাছে দেশ বিক্রি করে দিয়েছেন এবং সেনা বাহিনী ও ল্যাঙ্গার ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করছেন। তিনি জওয়ানদের ভীতিকে কাজে লাগান এবং তাদের ইসলামের দোহাই দিয়ে উপুক্ষ করেন।

তখন চূড়ান্ত-আঘাত হানার সময় এসে গিয়েছিল।

তারা তিনটি সারিতে বিভক্ত হয়ে পথে নামে। তাদের ল্যাবস্থ দুই কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে ছিল।

ভোর হওয়ার ঠিক আগে আগে রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা তাড়াতড়া করে শের-এ-বাংলা নগরে এমএনএ হোস্টেলের বাইরে অবস্থান নেয়। তাদের অধিকাংশের পরনে ছিল লুকি আর পা ছিল খালি। আশে পাশের এলাকায় বসবাসকারিয়া কিছু বুরো ঝঠার আগেই রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের সরিয়ে দেয়া হয়। এয়ারপোর্টের রানওয়ে ধরে খুব দ্রুত একটি ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসে, একটি দেয়াল ভেঙ্গে দেয় এবং ট্যাঙ্কের কামানটি ক্যাম্পের দিকে তাক করা থাকে।

সর্বমোট ত্রিশটি ট্যাঙ্ক সেদিন ঢাকার বিভিন্ন কৌশলগত শুরুত্পূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হয়েছিল। *

শেখ মুজিব, তার ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এবং তার ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণির বাস ভবন সে রাতে একই সঙ্গে ধিরে ফেলা হয়।

সেনা সদস্যরা শেখ মুজিবের বাড়ির চারদিক থেকে গুলি ছুড়তে শুরু করে। নিচ তলায় জানালার কাচ ভেঙ্গে গুলি চুক্কিল ঘরের মধ্যে, সব কটি শোবার ঘর ছিল নিচতলাতেই। একটি বুলেট মুজিবের ছোট ভাই শেখ নাসেরের হাতে আঘাত করে।

বাড়ির সবাই শেখ মুজিবের ড্রেসিং রুমে আশয় নিয়েছিলেন, কারণ এই কটিই তখন তুলনামূলক নিরাপদ ছিল। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকসেনাদের এ বাড়ি দেরাও করার ঘটনারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

মুজিব কয়েকজন কর্মকর্তাকে ফোন করেন।

বেগম মুজিব তার একটি শাড়ি ছিঁড়ে তাই দিয়ে নাসেরের হাতে ব্যান্ডেজ করে দেন।

কামাল নিচে নেমে আসেন এবং বাড়ির নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেন, কিন্তু তাদের আগেই নিরত্ব করা হয়েছিল। যখন কামাল নিরাপত্তা রীদের প্রতিরোধ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করছিলেন সে সময় মেজর হৃদা বাড়িতে প্রবেশ করেন। নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে স্যালুট করে।

মেজর হৃদার সাথে থাকা লোকদের একজন কামালকে গুলি করে।

ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার জামিল দ্রুত শেখ মুজিবের বাসভবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে বহনকারি জিপাটি যখন মুজিবের বাড়ি থেকে যাত্র কয়েকশো মিটার দূরে ছিলো তখন সোবাহানবাগ মসজিদের কাছে কয়েকজন জওয়ান চিৎকার করে তাদের থামতে বলে 'হল্ট'। জামিল তার পরিচয় দেন। জওয়ানরা আগে থেকেই তাকে চিনতে পেরেছিল। জামিলকে ধামানোর জন্যই তাদের সেখানে রাখা হয়েছিল। তারা হমকির সুরে জামিলকে জানায় 'এ পথে যে যাবার চেষ্টা করবে তাকে গুলি করার নির্দেশ আছে আমাদের উপর।' তৃদের হমকি উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে জওয়ানরা তাকে গুলি করে।

ততক্ষণে সেনা সদস্যরা মুজিবের বাড়িতে তচনছ তরু করে দিয়েছে। তারা আবিক্ষার করে একটি কক্ষ চারদিক থেকে বক্স- এটি ছিল শেখ রেহানার শোবার ঘর। সেনারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে, ফলে একটি আলমারি ভর্তি জিনিস ঘরের মেঝেতে ঝানঝানিয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতে যেমন করেছিলেন সেভাবেই মুজিব ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আর বলেন "ওরা কি চায় আমাকে দেখতে দাও।" সে রাতে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের মুরোমুরি হয়েছিলেন। আজ সামনে তার নিজের দেশের সেনারা।

মুজিব একটি চেক লুঙ্গি আর সাদা ফুতুয়া পরে ছিলেন।

সিঙ্গুলেট মুজিবের সঙ্গে হৃদার দেখা হয়। তিনি বলেন 'তাহলে তুমই এসব করছ। কি চাও তুমি?' 'আমরা আপনাকে নিতে এসেছি', জবাব আসে। মুজিব বাজ খাই কঠে বলেন 'তুমি কি আমার সাথে কৌতুক করছ? আমি কখনোই এদেশকে ধ্বংস হতে দিবনা।' হৃদা বিত্রুত হয়ে পড়েন। একজন গৃহকর্মী চিৎকার করে বলে ওঠে 'কামাল তাই আর নেই।' এ সময় হাবিলদার মোসলেহ উদীন টেরেস থেকে নেমে

আসছিলেন, তিনি গালাগাল করেন এবং পেছন থেকে ব্যর্থক্রিয় অঙ্গ দিয়ে মুজিবের ওপর গুলি চালান।

জওয়ানরা যা পাছিল তাই কুড়িয়ে নিছিল। বেগম মুজিব মিনতি করেন “তোমাদের যা ইচ্ছা নিয়ে যাও, শুধু আমাদের প্রাণে মেরো না।” কিন্তু গুলির শব্দ শব্দে তিনি বেরিয়ে আসেন। তিনি বলেন “তোমরা তাকে হত্যা করেছ, আমাকেও হত্যা কর।” তাকে চিরতরে নিষ্ঠক করে দেয়া হয়।

শেখ জামাল, তার স্ত্রী রোজী এবং কামালের স্ত্রী সুলতানা তখনও ড্রেসিং রুমের ভেতরে ছিলেন। স্টেন গানের এক ঝাঁকগুলিতে তারা তিনজনও নিহত হলেন।

বন্দুকধারীরা বাথরুমে নাসেরকে খুঁজে পায় এবং গুলি করে হত্যা করে।

রাসেল এক কোণায় ক্ষয়ে কুকড়ে ছিল। “আমাকে আমার মার কাছে নিয়ে যাও” বলে সে কেঁদে ওঠে। নৃশংস খুনিদের একজন বলে “আমরা তোমাকে তোমার মার কাছেই পাঠাবো।” একজন পুলিশ অফিসার অনুনয় করেন রাসেলের জন্য “ও তো একটা বাচ্চা মাত্র।” সেই পুলিশ অফিসারও মারা যান। গুলিতে একটি হাত উড়ে যাওয়ার পরও রাসেল অনুনয় করছিল “আমাকে মেরোনা, আমাকে মেরোনা।” উত্তরে এসেছিল একটি বুলেট।

রাসেলের মৃতদেহ পড়ে ছিল তার মার পাশেই।

মুজিবের বাসভবনে পৌছাতে ফারুক ও রশিদের দেরি হয়ে গিয়েছিল। সবাই নিহত হয়েছেন এটা নিশ্চিত হ্বার জন্য ফারুক বাড়ির উপরে উঠেছিলেন। তিনি কাউকে ফোনে সংবাদ জানান।

শেখ মণি সাহায্যের জন্য এখানে সেখানে ফোন করছিলেন। কিন্তু কোন সাহায্যই আসছিল না।

মণি বসার ঘরে আসলেন সেনা সদস্যদের সাথে দেখা করতে, যারা ইতিমধ্যেই গায়ের জোড়ে তার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। মণির উপর গুলি চালানোর ঠিক আগের মুহূর্তে তার স্ত্রী ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে তার সামনে দাঁড়ান। “সরে পড়ুন” চিৎকাৰ করে বলল একজন জওয়ান আৰ গুলি চালানো হল।

স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ রক্তের গঙ্গার মধ্যে পড়ে রইল।

মণি সাথে সাথে মারা গেলেও, আরজুর দেহে তখনও প্রাণ ছিল। তিনি বললেন “আমাকে পানি দাও।” তার তিন বছর বয়সী ছেলে শেখ ফজলে নূর তাপস তাকে জিঞ্জেস করল “মা তুমি আৰ বাবা মেৰোতে শয়ে আছো কেন?” কোন উত্তর আসল না। বিশ্বায়ে ভয়ে বিমুচ্ছ হয়ে ছোট ছেলেটি বলে উঠল “তুমি কথা বলছ না কেন?” আরজুর মধ্যকার মাত্সন্তা জেগে উঠল। তিনি শেষবারের মত বললেন “আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমাকে বাঁচাও। আমার দু'টি ছোট বাচ্চা আছে।”

তখন আরজুর গর্তে ছিল তার তৃতীয় সন্তান।

যখন সেরনিয়াবাত বুঝতে পারলেন সেনারা তার বাড়িটি ধিরে ফেলেছে তিনি শেখ মুজিব কে ফোন করলেন। মুজিব জানালেন তিনি কিছুক্ষণ পর তাকে ফোন করবেন। তিনি তার জামাতা শেখ মণিকেও ফোন করলেন। ফোন বাজলেও শেখ মণির বাসা থেকে কেউ ফোন তুলছিলেন না।

সেরনিয়াবাত নিচে বসার ঘরে নেমে এলেন। তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যারা, ভাঙ্গে শহীদ, বাড়িতে আগত অতিথিরা এবং কাজের লোকেরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে ছিলেন। সবাই ছিলেন শুধু তার পুত্র হাসানাত বাদে। হাসানাত ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা, তিনি বাড়ির সামনের দরজায় ব্যারিকেড দিয়ে ছিলেন এবং সময় ক্ষেপণের চেষ্টায় বাড়ির দিকে যেই এগিয়ে আসবে তাকেই গুলি করার হুমকি দিছিলেন। তিনি পেছনের জানালা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সব জায়গাই সেনাসদস্যরা ছিল। তিনি ফাঁদে আটকা পড়েছিলেন। তিনি একটা ড্রেসিং রুমে আটকা পড়েছিলেন, তার হাতে একটি রিভলবার ছিল এবং মারা যাবার আগে অন্ত একজন খুনিকে হত্যা করতে তিনি বদ্ধ পরিকর ছিলেন।

মেজর শাহরিয়ার এবং হৃদার (যারা তখন সেলাবাহিনীর সদস্য ছিলেন না) নেতৃত্বে একটি দল সেরনিয়াবাতের বাড়িতে প্রবেশ করে। সেরনিয়াবাত বলেন “আমাকে তোমাদের কমান্ডিং অফিসারের সাথে কথা বলতে দাও”। “আমাদের কোন কমান্ডিং অফিসার নেই। কিন্তু আপনি কে?” প্রশ্ন করেন মেজর শাহরিয়ার। যখন শাহরিয়ার সেরনিয়াবাতের পরিচয় জানতে পারেন তখন তার মুখে বীকা হাসি খেলে যায়। পর মুহূর্তেই সেরনিয়াবাত বুলেটের আঘাত নিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। তার কন্যা হামিদা গগনবিদারি চিকিৎসার করে তার বাবাকে আড়াল করতে ঘোপিয়ে পড়েন। বুলেট তার দেহের নিম্নাংশে ও পায়ে আঘাত হানে। হাসানাতের শিশু পুত্র বাবু ভয়ে কেঁদে ওঠে। শহীদ তাকে কোলে তুলে নেয়। তারা দুজনেই গুলিবিন্দু হন। সে সময় ভয়ঙ্কর গোলাগুলি হয়। আরও যারা সেরনিয়াবাতের বাসভবনে নিহত হন তারা হলেন তার ১৪ বছর বয়সী কন্যা বেবি, তার ৯ বছর বয়সী পুত্র আরিফ এবং তিনি জন অতিথি।

সেরনিয়াবাতের স্ত্রী আমিনা, কন্যা হামিদা ও পুত্র খোকন গুলিতে আহত হন।

মেজর হৃদার ভাই নুরুল ইসলাম মন্ত্রুর সারা বাড়ি খুঁজে দেখেন। তিনি জানতে চান “হাসানাত কোথায়?”

খুনিয়া সেরনিয়াবাতের ভাঙ্গে শহীদকে তার পুত্র হাসানাত ভেবে তুল করে।

তখন হাসানাতকে খোঁজা শুরু হয়।

রমনা ধানার ওসি বেগম সেরনিয়াবাত, হামিদা ও খোকনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান।

গোলাগ্নিতির শব্দে ধানমণি এলাকায় বসবাসকারি জনেক ভারতীয় কৃটনীতিক তার বাড়ির ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান। তার চেয়ে কয়েক ফুট দূরে তার এক প্রতিবেশী যিনি একজন প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা এবং বর্তমানে একজন সফল ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ভঙ্গিতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তখন একটি রকেট ছোঢ়া হল। এর মাধ্যমে সংকেত দেয়া হল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মিশন সফল হয়েছে।

সাবেক মুক্তিযোদ্ধা এবং বর্তমানে ব্যবসায়ী এমনভাবে মাথা ঝাকালেন যেন কেউ তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কৃটনীতিকের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি হেসে বললেন “সব শেষ হয়েছে। আপনার রেডিওটি চালু করুন।”

তখন সকাল ছয়টা বেজে এক মিনিট।

চাকা রেডিও থেকে ঘোষণা করা হচ্ছিল সেনাবাহিনী শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছে। বার্তা ঘোষক নিজেকে মেজের ডালিম হিসেবে পরিচয় দেন এবং বলেন “খন্দকার মোস্তাক আহমদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শেখ মুজিবকে বন্দী করা হয়েছে এবং তার সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে।”

পরে আর একটি ঘোষণায় জানানো হয় “পদচ্যুত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সকালে সেনাবাহিনী কর্তৃক তার বাসভবনের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার সময় নিহত হন।”

প্রকৃত খবর ধীরে ধীরে প্রকাশ করা হচ্ছিল।

ঘোষণাটির একটি সংশোধিত রূপে জানানো হয় শেখ মুজিবের বাসভবন থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়।

যোহ্যদপুরে বাণি এলাকায় একটি রকেট বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত হয়। ডয়ক্ষর বিস্ফোরণের শব্দে এলাকাবাসীর মুম্ব ভাসে। আলি আকসাদ এটিকে আরও একটি অন্তর্যাত্মক তৎপরতা মনে করে শেখ মুজিবকে ফোন করেন। ফোন বাজলেও ওপাশ থেকে কেউ ধরছিল না। তখন আলি আকসাদ শেখ মণিকে ফোন করেন। সেখানেও একই অবস্থা। তিনি তখন মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদসশ আরও কয়েকজন মন্ত্রীকে ফোন করে খবর দেন। তারাও তাঁকে জানান শেখ মুজিবের বাড়িতে কেউ ফোন ধরছে না।

আকসাদ রেডিও চালু করলেন। রেডিও তখন শেখ মুজিবের নিহত হওয়ার খবর প্রচার করছিল। প্রচণ্ড ভয় আকসাদকে গ্রাস করল। দেশটা কি আরেকটা ইন্দোনেশিয়া হয়ে যাবে?

“তুমি কি খবর শনেছ?” একজন শুভাকাঙ্ক্ষী প্রশ্ন করেন আকসাদকে। জবাব আসে “হ্যাঁ।” ঐ শুভাকাঙ্ক্ষী আকসাদকে বলেন “এক্ষণি পালিয়ে যাও” এবং ফোন কেটে দেন।

আকসাদকে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার ছিল না। তিনি খুব দ্রুত তার স্তী ও দুই সন্তান নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। বাচ্চারা প্রশ্ন করলে তিনি তাদের বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন বলে সান্তান দেন।

তিনি হিতীয়বারের মত ভয়াবহ আতঙ্কে দেশভ্যাগ করছিলেন।

“ওঠো!” কাদেরের বোন চিংকার করে তাকে ডাকলেন। “তোমার ফোন এসেছে।” তার আরেক বোন তাঁকে ফোন করেছেন। তিনি বললেন “দেশে অভ্যুত্থান হয়েছে।” কাদের কিছু না বুঝেই প্রশ্ন করলেন “অভ্যুত্থান? তার বোন তাঁকে বললেন “যত দ্রুত পার পালিয়ে যাও। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। ওরা তোমাকেও খুঁজতে আসবে।” বেতারে প্রচারিত ঘোষণাটা ফোনে পরিষ্কার শোনা গেল।

একটি হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে কাদের সিদ্ধিকী বাড়ি ছাঢ়লেন। তার ড্রাইভার তাঁকে নিয়ে বের হতে রাজি হলো না। কাদের ভাবলেন দীর্ঘ তিন বছর ধরে বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসা ড্রাইভারও এই বিপদের সময় তার কথা উন্মুক্ত না। তিনি ড্রাইভারকে বললেন “আমাকে গাড়ির চাবি দাও।” ড্রাইভার কোন উত্তর দিল না, কিছুক্ষণ পর সে এক প্রতিবেশীর গাড়ি নিয়ে এল এবং প্রায় হাকুমের সুরে বলল “গাড়িতে উঠুন।”

রেডক্রসের প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফা বাড়ির দেয়াল টপকে একটি গোয়াল ঘরে শূকিয়ে থাকলেন। তিনি একদম ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তার প্রতিবেশীরা দয়া করে তাকে ধরিয়ে দেননি, কিন্তু তাঁকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়াটাও তাদের জন্য বিপদজনক ছিল।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বস্টারের সহকারীরা মুজিব হত্যার সংবাদ তাঁকে জানানোর জন্য হন্তে হয়ে খুঁজছিলেন; কিন্তু রাষ্ট্রদূত তার বাসভবনে বা সাধারণত যেসব জায়গায় তাঁকে পাওয়া যায় তার কোন জায়গায়ই ছিলেন না। ভোর ছয়টার সময় তিনি কোথায় ছিলেন?

মিশন সফল হওয়ার খবর রশিদ তার চাচা মোস্তাককে সাথে সাথেই জানিয়ে দেন। তবুও যখন রশিদ কিছু সৈন্য নিয়ে মোস্তাককে রেডিও স্টেশনে নিতে যান, তখন মোস্তাক বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন “তুমি কি নিচিত বঙ্গবন্ধু মৃত?”

পশ্চার এক মাসি তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন “কোন বাপের বেটাই বঙ্গবন্ধুরে খুন করতে পারবো না।”

মোস্তাকের মত্তালয়ের একজন কর্মকর্তা তার স্তীকে বলেছিলেন “তুমি কি মোস্তাকের চোখগুলো লক্ষ করেছ? তার চোখগুলো ঠিক সাপের মত। এমন মানুষ নিজের শার্থের জন্য খুন করতে পারে। ওর আশে পাশে আমি সব সময়ই অব্যক্তি বোধ করি।

কর্মকর্তার স্তু তার উত্তির কথা ঘনে হেসেছিলেন। কিন্তু সেই মোস্তাক এখন দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। এখন এদেশের কি হবে?

সাপেরা দাঁতে শান দিচ্ছিল।

১৩ আগস্ট থেকে মাহবুবুল আলম চাবী কুমিল্লা থেকে নিয়োজ হন। কুমিল্লা একাডেমীতে তার সহকর্মীরা কাউকে কিছু না জানিয়ে তার চলে যাওয়া নিয়ে চিত্তিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ উদয় হন ১৫ আগস্ট সকালে ঢাকা রেডিও স্টেশনে, তার সাথে ছিলেন মোস্তাক এবং তাহেরউদ্দীন ঠাকুর।

এই দুটি অধীয় ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতার পথ বদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, অবশ্যে তারা সফলভাবে মুখ দেখেছেন।

দিন্তিতে শাল কেন্দ্রীয় স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে ভাষণ দিতে যাওয়ার আগে আগে ইন্দিরা গান্ধী মুজিব হত্যার খবর জানতে পারেন। খবর পেয়ে তিনি হতবাক হয়ে যান।

তিনি আগেই মুজিবকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তার জীবন হ্রাসকির মুখে রয়েছে; কিন্তু মুজিব এই আশঙ্কা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন “ওরা আমার সন্তানের মত।”

ঢাকা রেডিও থেকে এই বাণীটি নিয়মিত প্রচারিত হতে থাকল “দুর্নীতি, অবিচার এবং বৈরতত্ত্বের অবসানের পর এখন দেশের মানুষের সামনে দেশসেবা করার প্রকৃত সুযোগ তৈরি হয়েছে। আসুন আমরা এই সুবর্ণ সুযোগের সম্বৰহার করি।”

“ধূর” বলে নিজের রেডিওটিতে বিরক্তিতে ঘৃষি বসিয়ে দিলেন আশরাফ, একজন প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা। “সুযোগ! সুযোগ! মোস্তাকের চক্রন্ত অবশ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। সব বিশ্বাসঘাতকেরা এখন আবার বেরিয়ে আসবে। আমাদের আবার ওদের বিরক্তে যুদ্ধ করতে হবে।”

আশরাফের স্তু কাঁদছিলেন।

অনেক নারীই প্রকাশ্যে মুজিবের জন্য কেঁদেছিলেন।

একজন সাংবাদিক খুব আনন্দের সাথে তার প্রতিবেশীকে জানালেন “মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।” বলেই তার মনে হল হয়তো তিনি একটু বেশি আগেই আনন্দ উদ্যাপন করে ফেলছেন। তিনি ভাবলেন “যদি মুজিব সত্ত্বাই নিহত না হয়ে থাকেন?” মনে সন্দেহ নিয়ে সাংবাদিক তার রেডিওটি চালু করলেন খবরটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। রেডিওর খবর শুনে তার ভয় কেটে গেল, এই মুহূর্তে ভয়ের কিছু নেই।

এই সাংবাদিকটি ছিলেন মুসলিম লীগ সমর্থক। কিন্তু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে অনেকেই তার জন্য সেদিন শোক করেছিলেন।

ঢাকা থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে সাভারে রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে কেউ কেউ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বললেও অনেকেই মেজরদের সাথে সংঘাতে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। তারা বলছিলেন “আমাদের তো কোন ট্যাঙ্ক-বিহুর্সী কাথান নেই।” রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক নুরুজ্জামান এই মুহূর্তে লক্ষণে ছিলেন, সিদ্ধান্ত নেয়ার মত কেউ সাভারে ছিলেন না।

রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা শেখ মুজিবের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহযোগী তোফায়েল আহমেদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তোফায়েল শোকে এতটাই কাতর ছিলেন যে লড়াইয়ের আদেশ দেয়ার অবস্থা তাঁর ছিল না।

ঢাকায় অবস্থানকারী একজন ভারতীয় সাংবাদিকের স্ত্রী তাকে ঘূর থেকে জাগিয়ে বললেন “তাড়াতাড়ি ওঠো। কিন্তু একটা ঘটেছে। কারফিউ দেয়া হয়েছে। রেডিওতে খবর শোন।” তার স্ত্রী তাকে মুজিব হত্যার খবরটি সরাসরি দেননি।

ঢাকা রেডিও থেকে বার বার জানানো হচ্ছিল শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন এবং খন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন।

সাংবাদিক তার রিপোর্ট লিখলেন এবং সচকিত ভাব নিয়ে কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্টেডিয়ামের কাছে একটি ট্যাঙ্ক অবস্থান করছিল। এখানে ওখানে লোকজনের ছোট ছোট জটলা দেখা যাচ্ছিল।

টেলিগ্রাফ অফিসের একজন কর্মকর্তা বললেন “আপনি আপনার টেলিগ্রাম এখানে রেখে যেতে পারেন, কিন্তু এটি পাঠানো হবে না। আমাদের কোন টেলিগ্রাম না পাঠানোর নির্দেশ দেয়া আছে।” টেলিগ্রাম অফিসে ইতিমধ্যেই একজন সামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

একজন রেডিও কর্মকর্তা নিশ্চিতে ঘুমাচ্ছিলেন। টেলিফোনের শব্দে তার ঘূর ভাঙলেও অলসভার কারণে তিনি ফোনটি ধরাচ্ছিলেন না। তার স্ত্রী তাকে জানালেন “তোমাকে জরুরী ভিত্তিতে রেডিও স্টেশনে হাজির হতে বলা হয়েছে।” তিনি ফোন ধরলে ওপাশ থেকে হৃকুম আসল “এখনই আসুন।” কি ঘটেছে তা তিনি বোকার চেষ্টা করছিলেন। রেডিওতে দিনের প্রথম সম্প্রচারের সময় তখনও হয়নি। তবুও অভ্যাসবশত তিনি রেডিওটি চালু করলেন খবর শোনার জন্য। ও খোদা! ভয়ঙ্কর; ভয়ঙ্কর!

রেডিও স্টেশনে পৌছে তিনি আবিক্ষার করলেন মেজর শাহরিয়ার স্টেশনের দায়িত্বে আছেন। তার সামনে টেবিলে একটি স্টেনগান রাখা ছিল। একজন অফিসার অনুগত সুরে বললেন “সবাই কাজ করছে।” শাহরিয়ার টেবিলে রাখা অস্ত্রটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন “যতক্ষণ এটি এখানে থাকবে ততক্ষণ সবাই কাজ করবে।”

একই রুকম ঔর্জ্জত্য পাকিস্তানি সেনারা দেখিয়েছিল ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর যখন পাকিস্তানে সেনা শাসন কায়েম করা হয়েছিল।

একজন কর্মেল যখন কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তার সহকর্মী তাকে ফোন করলেন। সহকর্মীটি তাকে বললেন “তুমি কি রেডিওতে খবর শনেছ?” যখন তিনি জানালেন যে খবর শোনা হয়নি, তখন ওপাশ থেকে তাকে বলা হল “তাহলে এখনই শোন।”

একটি মার্কিন সংবাদ সংস্থার রিপোর্টার অভ্যর্থন হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুজিব হত্যার খবর রিপোর্ট করেন। রিপোর্ট বলা হয় বাংলাদেশ একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সম্পূর্ণ উল্লো পথে যাত্রা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি কৃটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে রেডিও পাকিস্তানেও প্রচার করা হয় যে বাংলাদেশ এখন একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র।

তৎক্ষণিকভাবে এ সংবাদটি নিশ্চিত বা অঙ্গীকার করা হয়নি। যখন চতুর্দশের মাধ্যমে মোতাক আহমেদ ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন সে মুহূর্তে এই খবরটি শুরুত্তীর্থীন। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ বেতারের নাম বদলে হয়েছে রেডিও বাংলাদেশ।

পশ্চিম ইউরোপে কোন একটি দেশে বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রদূত এই অভ্যর্থনে ভূট্টোর কি ভূমিকা খাকতে পারে তা তেবে দেখছিলেন। এই রাষ্ট্রদূত যখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দণ্ডের কাজ করতেন তখন ভূট্টো পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। সে সময় একবার ইরানের রাজধানীতে ভূট্টোর কোন একজন পরিচিতের কাছ থেকে একটি প্যাকেট সঞ্চাহ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাকে। সঞ্চাহ করার পর ঐ প্যাকেটটি তরুণ কূটনীতিকের কক্ষ থেকে হারিয়ে যাবার আগ পর্যন্ত এই পুরো কাজটিকে একটি স্বাভাবিক কাজ মনে হয়েছিল।

১১ থেকে ১৪ আগস্ট সময়ে মুজিবের দুই কন্যা হাসিনা ও রেহানা ব্রাসেলসে ছিলেন। রেহানা ছুটি দীর্ঘায়িত না করে বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। ১২ আগস্টে তিনি হাসিনাকে বলেন “আমি ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখেছি দেশের মানুষ আবার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমার খুব ভয় করছে। আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই।

যা হোক, ১৪ আগস্ট বিকেলে হাসিনা ও রেহানা দুজনেই খুব উৎফুল্প ছিলেন।

একটি অনুষ্ঠান থেকে তারা দুজনে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছিলেন। পরদিন সকালে তাদের ফ্রালে যাওয়ার কথা থাকলেও তারা রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের কন্যাদের সাথে গল্প করছিলেন। হাসিনার মনে হঠাতে কুসংস্কার কাজ করতে শুরু করল, তিনি বললেন “আমরা অনেক বেশি হাসছি। ভাবছি সামনে আমাদের অনেক কাদতে হবে কি না।”

পরদিন সকালে বন থেকে হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদের জন্য একটি ফোন আসে। তিনি তার স্ত্রীকে ফোনটি ধরতে বলেন, কিন্তু ওপাশ থেকে ড.

ওয়াজেদকেই চাওয়া হয়। ওয়াজেদ বুঝলেন নিচয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে। ফোনে ড. ওয়াজেদকে বলা হল “এখনই বন এ চলে আসুন।”

যখন হাসিমাকে জানানো হল দেশে একটি অভ্যাসান হয়েছে, তার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল “কেউ বেঁচে নেই।”

সেনা সদরে উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা অভ্যাসানকারী মেজরদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তা ভাবছিলেন। এই মেজররা শুধু একটি অভ্যাসানই করেননি, তারা আগে পিছে না ভেবে ঘোষণা করেছেন দেশের ক্ষমতা এখন সেনাবাহিনীর হাতে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অভ্যাসানের রাজনৈতিক ফলাফল উপেক্ষা করলেও সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা নিয়ে ভাবিত না হয়ে পারছিলেন না। মেজরদের মধ্যে কেউ কেউ বাহিনী থেকে অবাহত পেলেও অনেকেই তখনও বাহিনীতে ছিলেন। এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়া হলে সেনাবাহিনীর ‘চেইন অফ কমান্ড’ বলতে কিছু ধাকবে না। তখন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবস্থান কি হবে?

উর্ধ্বতন সামরিক কর্তাদের কেউ কেউ তাংকণিক ব্যবস্থা নেয়ার কথা বললেও, অনেকে ছিমত পোষণ করেন এবং পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। যতক্ষণ তাদের নিজ নিজ চাকুরী বহাল আছে ততক্ষণ অপ্রয়জনীয় বুঁকি নেয়ার দরকার কী?

মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন উদ্যোগহীন ব্যক্তি এবং তার কর্তৃত সব সময়ই তার সহকারী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের চালেঙ্গের মুখে ছিল।

যখন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অভ্যাসানকারী মেজরদের বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে তা নিয়ে তর্ক করছিলেন তখন মেজর ডালিম একটি জিপ চালিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের দ্রুত মনস্থির করতে বলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা সে সময় সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

ততক্ষণে সকাল দশটা বেজে গেছে। চার ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কোন ব্যবস্থা নেয়ার ইচ্ছা থাকলে তারা এর মধ্যেই কোন পদক্ষেপ নিতেন।

সকল বাহিনীর প্রধানরাই নতুন সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন।

বিতীয় আর্টিলারি রেজিমেন্টের একজন অফিসার কর্নেল আবু তাহেরকে সকালে ফোন করে জানান যে মেজর রশিদ তাকে বাংলাদেশ বেতারে থাকতে বলেছেন। ঐ অফিসারটি তাহেরকে শেখ মুজিবের নিহত ইওয়ার ব্যবরণ জানান।

শেখ মুজিবের নিহত হবার এবং মোক্তাকের ক্ষমতা প্রাপ্তির খবরে কর্নেল তাহের হতবাক হয়ে যান। তিনি বলেন “আমি তাবছিলাম এর ফলে বাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে এবং এমনকি আমরা আমাদের স্বাধীনতাও হারাতে পারি।”

তাহের আরও জানান “বেলা সাড় এগারোটায় প্রচও দৃষ্টিতা নিয়ে আমি বাংলাদেশ বেতার ছেড়ে আসি। আমি অনুভব করছিলাম জাতির জনকের হত্যার পেছনে বিদেশী শক্তির হাত থাকতে পারে।” ঐ মুহূর্তে তিনি যা অনুভব করছিলেন দিন দুয়েক পর তা একটি অভিযোগ আকারে সামনে আসে।

মোতাক এবং তাহের উকীল ঠাকুর বাংলাদেশ বেতার থেকে বেরিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদে আসেন। তাদের গাড়ির সামনে একটি ট্যাক্সি এবং পেছনে দুটি সাঁজোয়া যান ছিল। মোতাকের চোখ দুটি বক্ষ ছিল যেন তিনি গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন। তাহের উকীল চিঞ্চিতভাবে পাশের মসজিদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মোতাকের গাড়িটি যখন প্রেসক্লাব এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল অনেক সাংবাদিক তার দিকে এগিয়ে যান। একজন কবি চিন্তকার করে প্রশ্ন করেন “আপনার কি কোন লজ্জা নেই? গতকালও আপনি শেখ মুজিবের নামে জয়ধর্মী দিয়েছেন।”

কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেননি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কাজ করেছেন এমন একজন সাংবাদিক মোতাককে তার সাফল্যে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন “আমি বেডিওতে ঘোষণার জন্য আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ভাগিস অভ্যর্থনা সফল হয়েছে। অন্যথায় আমি বিপদে পড়ে যেতাম।”

এমনি আরও কেউ কেউ ছিলেন যারা আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ সে সময় শোকে ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

ক্ষমতা এহশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মোতাক যোহাম্মদুল্লাহকে উপরাষ্ট্রপতি করেন। শেখ মুজিবের সর্বশেষ মন্ত্রী সভায় দুজন সাবেক রাষ্ট্রপতি ছিলেন আবু সাইয়দ চৌধুরী এবং যোহাম্মদুল্লাহ। মোতাকের সরকারে দুজনেরই ছান হয়েছিল। আবু সাইয়দ চৌধুরীকে কামাল হোসেনের পরিবর্তে নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রী করা হয়।

১৯৭১ সালে তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান এবং মোতাক এই কজন মিলে প্রবাসী সরকার গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সহকর্মীদের না জানিয়ে পাকিস্তান সরকারের সাথে সমরোতা করার চেষ্টা করায় মোতাক একা হয়ে পড়েছিলেন। এখন আবার ষড়যন্ত্রের শাখায়ে মোতাক সামনে চলে এসেছেন।

১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে তাজউদ্দীন আহমেদ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। দলে বা সরকারে তার কোন পদ ছিল না। যুক্তকালীন সময়ের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি খুব উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি একজন ভেঙ্গে পড়া মানুষ।

যখন সৈনিকেরা তাজউদ্দীনের বাড়িতে গিয়েছিল তিনি তাদের বলেন “তোমরা আমার নেতাকে খুন করেছ, আমাকেও খুন করে ফেল।” তার আশঙ্কা তখন সত্য

হয়েছে, তার চরম শক্তি এখন ক্ষমতায়। পরিহিতি অন্য রকম হলে তিনি হয়ত লড়াই করতেন, কিন্তু তখন তার কিছুই করার ছিল না।

সংবিধান অনুসারে শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর সৈয়দ নজরুল ইসলামের দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার কথা। কিন্তু সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়ার মত ব্যক্তিত্ব তার ছিল না। একজন তত্ত্বাবধারী তাকে উদ্যোগ নিতে বললেও, তিনি এতোটাই আতঙ্কারূপ ছিলেন যে সামনে কি হবে তাই তিনি ভাবতে পারছিলেন না।

এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান একজন চমৎকার কিন্তু নির্বিশেষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাকে প্রতিরোধ যুক্তের নেতা হিসেবে কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

মুজিব সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এম. মনসুর আলী জনতেন তার নির্দেশ কেউ মানবেনা, তারপরও আজ্ঞাসমর্পণ না করে তিনি পালিয়ে যান। কিন্তু দুদিন পর তার বাসভবনের কাছেই কলাবাগান এলাকা থেকে সেনা সদস্যরা তাকে গ্রেফ্তার করে।

বেলগ্রেড থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় বাংলাদেশে অভ্যাসনের কথা জানতে পারেন ড. কামাল হোসেন। তার স্ত্রী হামিদা এবং কিছুদিন আগেই দেশে ফিরেছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে দেশে ফেরত আসা তার জন্য বিপদজনক ছিল। তিনি বন এ থেকে যান।

কোন অবস্থাতেই তিনি মোতাক সরকারে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বঙ্গদের ড. কামাল বলেন “আমরা সম্মানের সাথে বাঁচবো অথবা মরবো” শেখ মুজিবের মন্ত্রণালয়ের কিছু সংখ্যাক মন্ত্রী ইতিমধ্যেই মোতাক সরকারের সাথে সমরোহ করেছিলেন এবং কেউ কেউ সমরোহ করার জন্য উদয়ীব ছিলেন। কিন্তু অবশিষ্টদের বিকেলে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সেনা সদস্য দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ফলীভূত মজুমদার হস্তানে আক্রান্ত হয়ে পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ছিলেন। যখন সেনা সদস্যরা তাকে বক্সবনে নিয়ে যেতে আসে তখন আরেকজন রোগী কবি জসিমউল্লেহ তাকে শক্ত করে ধরে রাখেন আর সেনা সদস্যদের কাছে আবেদন করেন “উনি একজন ভাল মানুষ তাকে নিয়ে যেও না।”

বিকেলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এ. ই. মোহাম্মদ হোসাইন বক্সবনে দশজন মন্ত্রী ও জয়জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে ঘোলজনের মন্ত্রিসভাকে শপথ পাঠ করান।

দশজন মন্ত্রীর মধ্যে দুজন ছিলেন ফলীভূত মজুমদার এবং মনোরঞ্জন ধর, এ দুজনকে মোতাকের প্রয়োজন ছিল। মোতাক প্রাণপণে চাইছিলেন এটা প্রয়াণ করতে যে মুজিবের জায়গায় তার রাষ্ট্রপতি হওয়া ছাড়া তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাহের উদীন ঠাকুর এতোটাই লজ্জা পাচ্ছিলেন যে নারীদের অনেকে তাকে ‘দুলা মিয়া’ বলছিলেন। তিনি এখন মোতাকের প্রধান সহযোগী।

তিনি একজন প্রতিযন্তী হলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে নতুন সরকারে তিনি একজন অত্যন্ত 'গুরুত্বপূর্ণ' ব্যক্তি ।

বাংলাদেশে রক্তপাতের ঘটনায় ভারতের প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে সংশয়ে থাকা নতুন সরকার ভারতের সাথে যোগাযোগ রাখছিল । তাহের উদীন ঠাকুর তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে জোড়ের সাথে বলেন যে তারা ভারতের সাথে যোগাযোগ রাখছেন, যদিও পাকিস্তান বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি । সংবাদ সম্মেলনে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম তুলে যান, এক পর্যায়ে তিনি জিজেস করেন "মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নামটা যেন কি?" তখন একজন সাংবাদিক তাঁকে মনে করিয়ে দিলে তিনি নামটি ঠিক মত বলেন ।

কর্নেল জামিলের মৃতদেহ সৎকারের জন্য যেন ছেড়ে দেয়া হয় তা বলার জন্য ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কর্নেল ফারুককে ফোন করেন । কর্নেল জামিলকে ঢাকায় কবর দেয়া হবে এই শর্তে ফারুক মৃতদেহ হস্তান্তরে রাখি হন ।

ঢাকাত্তু বনানী কবরস্থানে মুজিবের গ্রী, তিন পুত্র এবং দুই পুত্রবধুকে তাঁদের রক্তাঙ্গ জামা-কাপড় পরিহিত অবস্থাতেই কবর দেয়া হয় । তাঁদের সৎকারের সময় কোন ধর্মীয় রীতি রেওয়াজ পালন করা হয়নি এবং কবরের গায়ে কোন নাম ফলকও ছিল না ।

রেডিও স্টেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ অনুষ্ঠানে আয়োজিত অভিধিদের মধ্যে মোস্তাকের ভাষণের লিখিত কপি বিতরণ করা হয় । ডক্টরলীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ নিজের অবস্থান সম্পর্কে অনিচ্ছিত ছিলেন, তিনি মোস্তাকের ভাষণের কপিটি পড়ে তার প্রশংসা করেন । জবাবে মোস্তাক বলেন "আপনার কি মনে হয় এই ভাষণটি একদিনে লিখা হয়েছে", প্রথমবারের মত মোস্তাক তার উচ্ছ্বাস শুকাতে ব্যর্থ হন ।

তার প্রথম ভাষণে মোস্তাক খুনীদের 'সূর্য সজ্ঞান' এবং 'ডয়হীন হৃদয়ের অধিকারী' বীর বলে সংবোধন করেন । কিন্তু বিজয়ের মূহূর্তে মোস্তাক ডয় পাছিলেন । তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন যে 'এ দায়িত্ব তিনি বাধ্য হয়ে কাঁধে তুলে নিয়েছেন' এবং 'জাতির বৃহত্তর স্বার্থ এবং উত্তৃত পরিহিতির ঐতিহাসিক ওপরতের কথা ডেবেই তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছেন' । তিনি ভাষণে আরও বলেন "আমাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের বক্তৃ রাষ্ট্রের অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে" তিনি ভারতের নাম উত্তোল করেননি । তিনি 'ত্রিপ লাখ শহীদের রক্ত ও দুই লাখ মা-বোনের সম্মুখের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা'র কথাও বলেন । তবুও তিনি ভাষণের শেষ করেন 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' দিয়ে; প্রতিরোধের ঝোগান, বিজয়ের ঝোগান 'জয় বাংলা' কে তিনি বা তার সঙ্গী ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের ঝোগান মনে করতে পারেননি ।

বাংলাদেশে রক্তপাতের ঘটনায় ভূট্টোর প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়াটি ছিল সঠিক ও সময়োচিত, যদিও এটি ছিল সম্পূর্ণ অনুভূতিশূন্য । তিনি বলেন "শেখ মুজিব ও তার পরিবারের কর্ম পরিণতিতে আমি শোকাহত"।" যদিও ১৫ আগস্টে ভূট্টো

তথ্য পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নতুন সরকারকে শীকৃতি দিয়েই ক্ষাতি হননি, বরং অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে বিশেষ করে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোকেও আহবান জানান যেন তারা বাংলাদেশের নতুন সরকারকে শীকৃতি দেন। তিনি বলেন, “এই আহবান জানানোর মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে আমাদের দেশটি হিস্তিত হয়ে যাওয়ার ঘটনার ব্যাখ্যা ডরা অভিজ্ঞতা”।

চাকায় এই হত্যায়জ্ঞের দিনে বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি উপহারের ঘোষণাও দেন। তিনি বলেন “বাংলাদেশের ভ্রাতৃসুলভ জনতার জন্য বুরুষের নির্দর্শন হিসেবে পাকিস্তান সরকার ৫০,০০০ মেট্রিক টন চাল, ১০ মিলিয়ন গজ থান কাপড় এবং ৫ মিলিয়ন গজ সূতি কাপড় পাঠাবে।” তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের ক্ষমতা অনুসারে আরও বড় আকারের সাহায্য দেয়া হবে।

মুজিবকে হত্যা করার কারণেই কি এ উপহার?

১৬ আগস্ট, হত্যায়জ্ঞের পরদিন একজন মেজর এবং একজন লেফটেন্যান্ট কিছু সৈন্যসহ ট্রিপিপাড়ায় হেলিকপ্টারে অবতরণ করেন। তারা গ্রামের পেশ ইয়ামাকে ডেকে পাঠান এবং তাকে প্রশ্ন করেন গ্রামের মানুষ শেখ মুজিবের কবর দিতে চায় কি না। উত্তর আসে যে মুজিবের লাশ তাদের কাছে হত্যাকান করা হলে তারা তার সৎকার করতে রাজি আছে।

গ্রামের মানুষকে বলা হয় তাদের দশ থেকে বারোটি কবর বুঁড়তে হতে পারে, তবে তখনকার মত একটি কবর প্রস্তুত করাই দরকার।

দুপুর আড়াইটায় সৈনিকেরা শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ নিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই গোপালগঞ্জের উপ-বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের একটি শক্তিশালী দল নিয়ে সেখানে হাজির হন।

একজন মেজর লাশটি কবরে নাহিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ কাজটি ইসলাম বিরোধী হত। “আমাদের অবশ্যই মৃতদেহ দেখতে দিতে হবে” গ্রামের মানুষ জোড়ের সঙ্গে দাবি জানায়। মেজর তাদের কাছে জানতে চান “আপনারা কি লাশ না দেখে কবর দিতে পারেন না?” তখন গ্রামের পেশ ইয়াম মৌলভী শেখ আব্দুল হালিম বলেন “আমরা সেটা করতে পারি যদি আপনারা তাকে শহীদের মর্যাদা দেন”。 মেজরের কাছে এ কথার কোন জবাব ছিল না। “আপনারা কি তাকে ইসলামী স্থানে অনুসারে দাফন করাতে চান না?” আবার প্রশ্ন করেন মৌলভী।

এবারও কোন জবাব আসল না।

মুহূর্তটি ছিল শুধু উত্তেজনাকর। সেনা কর্মকর্তারা একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। তাদের উপর পরিকার নির্দেশ ছিল গ্রামবাসী যেন কোন অবহাতেই শেখ মুজিবের মৃতদেহ দেখতে না পায়। কিন্তু একজন মুসলমানকে তার ধর্মীয় অধিকার থেকে

বক্তি করলে অন্য মুসলিমরা কিন্তু হয়ে উঠতে পারে। শেষ পর্যন্ত মেজর দাফন এবং কাফন সম্পন্ন করতে রাজি হন, কিন্তু এগুলো করতে হবে সেনাবাহিনীর উপর্যুক্তিতে।

কফিনটি খোলা হল।

মুজিবের দেহ ছিল বুলেটে ক্ষত বিক্ষত এবং বরফ ভরা কফিনটি ছিল রক্তস্নাত।

বিশয়ে বিমৃচ্ছ হয়ে গ্রামবাসী কফিনটি ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

এই নিস্তব্ধতা ছিল ভয়ঙ্কর। প্রতি মুহূর্তেই আশে পাশের গ্রামগুলো থেকে শত শত মানুষ ভিড় করছিল। তাদেরকে বাধা দিয়ে দূরে রাখা হচ্ছিল, কিন্তু যে কোন সময় তারা বাধা ভেঙ্গে চলে আসতে পারে। লেফটেনেন্ট চিকির করে উঠলেন “জলদি করুন। কি হলো? আমাদের ফিরে যেতে হবে।” “আপনাদের পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হল” হঙ্কার করলেন মেজর।

মুজিবের দেহটি তার গ্রামের বাড়ির বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হল। তারা শরীরে মোট ২৯ টি বুলেটের ক্ষত ছিল। একটি ক্ষত, যা সঁজুবত অটোমেটিক রিভলবারের গুলিতে হয়েছে, ছিল তার পিঠে।

তার কূর্তার এক পকেটে ছিল তার পাইপ আর ভাঙ্গা চশমা।

মুজিবের গ্রামের বাড়িতে কেউ ছিল না এবং আশে পাশের দোকানগাটি সব বঙ্গ ছিল। কেউ একজন একটি সাবান নিয়ে এল। শেষ গোসল করানোর জন্য পানি গরম করার সময় ছিল না। এমন কি সমস্ত রক্তের দাগ পরিকার হওয়ার আগেই মেজর চেঁচিয়ে উঠলেন: “জলদি করুন। আপনাদের আর কত সময় লাগবে।”

মুজিবের মা সায়রা খাতুনের নামে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল থেকে চারটি শাড়ি নিয়ে আসা হল। কিন্তু মেজর কাফনের কাপড় সেলাই করার সময়টুকুও তাদের দিতে রাজি ছিলেন না।

যখন জানতে চাওয়া হল ঘৃতের জানাজার নামায হবে কি না, তখন মেজর জানালেন তা হবে। মেজর একজন পুলিশ সদস্যকে জিজ্ঞেস করলেন তারা জানাজায় অংশ নিতে চায় কি না। পুলিশ সদস্যটি জানালেন তাদের অযু করা থাকলে তারা জানাজায় অংশ নিতেন। তারা জানাজায় অংশ নেন নি।

মুজিবকে তার বাবার কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হল।

মোস্তাকের প্রস্তাব

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সক্ষ্যায় শেখ মুজিব যখন তার দুই কন্যা হাসিনা ও রেহানাকে পাকিস্তানি সেনারা হানা দেয়ার আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন তখন রেহানা তার বাবাকে আকড়ে ধরে থাকেন আর কাঁদতে কাঁদতে বলেন “আমি যাব না। আমাদের যদি মরতেই হয় তাহলে একসাথে মরব।” তাঁকে জোড় করে তার বাবার কাছ থেকে আলাদা করতে হয়েছিল।

কিন্তু এখন রেহানা বিদেশের মাটিতে।

অভ্যর্থনার খবর শোনার পর শেখ হাসিনার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল “কেউ বেঁচে নেই।” কিন্তু কিছু উড়ো খবর শোনা যাচ্ছিল যে তার মা ও ছেট ভাই রাসেল তখন জীবিত আছেন। তিনি এই বিশ্বাস আকড়ে ধরে ছিলেন।

মুজিবের মেয়ের জামাই ওয়াজেদের কাছে ১৬ আগস্ট ঢাকা থেকে একটি ফোন আসে। ফোন করেছিলেন মিসেস আবু সাইয়িদ চৌধুরী, তিনি হাসিনা ও রেহানাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। তিনি হাসিনা ও রেহানাকে সব ধরণের সাহায্য করার আশ্বাস দেন এবং ড. ওয়াজেদকে তারা যেখানে আছেন সেখানেই থাকার উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন সাইয়িদ চৌধুরী লিমাতে জোট নিরপেক্ষ সংযোগে যাওয়ার সময় তাদের সাথে দেখা করবেন। “আমরা তোমাদের পাশে থাকবো” তিনি বলেন।

তাদের নিশেহারা অবস্থার মধ্যেও এই ফোন আসায় তাঁরা অবাক হয়েছিলেন। আবু সাইয়িদ চৌধুরী তাঁদের কোন নিকটজন ছিলেন না। সর্বেপরি তিনি মোস্তাক সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েও তাদের সহায়তা করার কথা বলেছিলেন। এই ফোন নিচয়ই নতুন সরকারের পরামর্শে করা হয়েছে অথবা অন্তত নতুন সরকারের অনুমোদন নিয়ে করা হয়েছে। তাঁদের খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তারা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। যখন একটি মাত্র বাক্য লিখে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন তখন ওয়াজেদের হাত কাঁপছিল।

রাজধানী বন-এ অবস্থান করা আর নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। ঢাকা থেকে এখানে কেউ চলে আসতে পারে। কার্লরুহ-তে ওয়াজেদের একটি ফ্ল্যাট ছিল; আশ্রয় প্রার্থনা করে লেখা চিঠির জবাব আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

ঢাকায় পত্রিকা বিলি করে এমন একটি ছেলে মুজিব হত্যার পরদিন মুজিবের জন্য অনেক কাঁদছিল। এক ভারতীয় সাংবাদিক তাকে ন্যরণ করিয়ে দিলেন “তৃষ্ণি তো মুজিবের অনেক সমালোচনা করতে।” ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিল “ভালো বা মন্দ যাই হোক, তিনিই ছিলেন আমাদের একমাত্র নেতা; তার নিন্দা করতাম কারণ দোষারোপ করার মত আর কেউ আমাদের নেই।”

এই ছেলেটির মত আরও অনেকেই নিজেদেরকে এতিম মনে করছিলেন।

দেশের মানুষের মনের অবস্থা বঙ্গপোসাগরের নিম্নচাপের মতোই ওরুগঠীর ও বিস্ফোরণযুক্তি ছিল; যে কোন মুহূর্তেই এটি একটি ঘূর্ণিঝড়ে ঝুপ্তান্তরিত হয়ে ব্যাপক ধ্বন্যসংজ্ঞ ঘটাতে পারতো।

পুরো পরিস্থিতি বুঝতে পেরে মোন্টাক হত্যায়জ্ঞের সাথে নিজের সম্পৃক্ততা মুছে ফেলতে মরিয়া ছিলেন। গণরোধের শিকার যদি কেউ হয় তা মেজররা হোক।

মোন্টাকের কিছু বক্তু ও সহযোগী সে সময় এটা প্রমাণ করতে ব্যক্ত ছিলেন যে মেজররা নিজেরাই এই অভ্যুত্থান করেছেন এবং এ সম্পর্কে মোন্টাক আগে কিছুই জানতেন না। মোন্টাকের এক বক্তু বলেন “যখন একজন মেজর কিছু সৈন্য নিয়ে তাকে নিতে আসে তখন তিনি প্রথমে তেবেছিলেন যে ওরা তাকেও হত্যা করবে।” কিন্তু যখন বোৰা গেল যে কেউ এই গল্প বিশ্বাস করছে না তখন মোন্টাকের বক্তুরা বলতে লাগলেন যে মোন্টাককে বলা হয়েছিল অভ্যুত্থানটি হবে রক্তপাতহীন। প্রমাণ হিসেবে তারা বলছিলেন যে যখন মোন্টাক হত্যায়জ্ঞের কথা জানতে পারেন তখন তিনি বলেছিলেন “এমন তো কোন কথা ছিল না।”

তাদের যতানুসারে মুজিবের কবর টুপি পাড়ায় দিয়ে মোন্টাক মুজিবের ইচ্ছার প্রতি সম্মত দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন এও বলেন যে, “মোন্টাক ভাই একজন আচ্ছাহভক্ত মুসলিমান, যিনি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন।”

প্রার্থনারত পতঙ্গ?

ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পেরেছিল ‘মুজিবকে সরিয়ে দিতে হবে’। মোন্টাকের ভাতিজা মেজর রশিদ যে তার চাচার চেয়ে কম ভও, তার ভাষ্যমতে “শেখ মুজিবকে নির্বাসিত করা বা তাকে জেলে পাঠানো সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি খুবই ধূর্ত এবং ক্ষমতাধর ছিলেন। তাকে হত্যা করাই ছিল একমাত্র উপায়।”

মুজিব এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাকে নির্বাসিত বা কারাবন্দি করা সম্ভব ছিল না। তাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর একমাত্র উপায় ছিল তাঁকে হত্যা করা।

বুব অল্প লোকই মোন্টাকের সহযোগীদের গল্প বিশ্বাস করেছিলেন, অনেকেই বিশ্বাস করেন ১৩ বা ১৪ আগস্টে যে ভারতীয় হেলিকপ্টারটি বিধ্বন্ত হয়েছিল তা মূলত শেখ মুজিবকে উদ্ধার করার মিশন নিয়ে আসছিল।

ভারতীয় হেলিকপ্টার নিয়ে কোন রহস্য ছিল না। কিছু কিছু ভারতীয় হেলিকপ্টার সত্ত্বেই পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারী করত। ১৪ আগস্ট তারিখে একটি হেলিকপ্টার বিধ্বন্ত হওয়ার প্রেসনেট শেখ মুজিব অনুমোদন করেছিলেন, যা পরদিন পাঠানোর কুখ্য ছিল।

ভারতেও অনেকে বিশ্বাস করেন যে ঐ হেলিকপ্টারটি উদ্ধার করার জন্যই পাঠানো হয়েছিল।

হেলিকপ্টারটি বিধ্বংস হয়েছিল অভ্যন্তরের একদিন আগে, তারপরও শেখ মুজিব 'উদ্ধার তৎপরতা' সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। যে সেনাসদস্যরা ১৫ আগস্ট ভোরে মুজিবের বাড়ি ঘেরাও করেছিল তারা তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে যায়।

আর বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত সমর সেন সে সময় ছিলেন দিচ্ছাতে।

মুজিবের শেষ বার্তা ছিল সাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি ফরহুদিন আলি আহমেদ এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পাঠানো বাণী।

তাহের উদ্দীন ঠাকুরের প্রেস ব্রিফিংয়ের জন্য ১৬ আগস্ট সাংবাদিকরা বঙ্গভবনে অপেক্ষা করছিলেন। দু'জন মেজার উত্তেজিত হয়ে হাঁটাইটি করছিলেন। তাহের ত্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করছিলেন। হৃদা আত্মিনষ্ট হয়ে একা একা হাঁটছিলেন। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি অন্যমনক্ষ থেকেই জবাব দিচ্ছিলেন। ফারুক সাংবাদিকদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন "বন্ধুরা আমি কি আপনাদের জন্য কিছু করতে পারি?"

এরকম মিটি সুরেই কি এই লোকটি হত্যায়ের পরিকল্পনা করেছিলেন? অবাক হয়ে এ কথাই ভাবছিলেন এক সাংবাদিক।

মুজিবের মৃত্যু সংবাদে ভারতে শোক নেমে আসে। কেউ কেউ হ্যাত ভাবছিলেন মুজিব নিজেই এর জন্য দায়ী, কিন্তু বেশির ভাগই মুজিব ও তার পরিবারের মৃত্যুতে শোকাহত ছিলেন। তিনি একজন মহৎ দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে প্রশংসিত ছিলেন।

ভারত সরকারের একজন মুখ্যপাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন "আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হওয়ায় আমরা তাকে সব সময়ই সম্মান করে এসেছি।" এই অভ্যন্তর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও 'প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব' ভারতেও পড়বে।

যুগোয়াভিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার বার্তায় বলেন "যুগোয়াভিয়ার সর্বত্তরের মানুষ বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতার মৃত্যুতে সম্বন্ধেনা জানাচ্ছে। তার মৃত্যুতে ধীর একজন জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতাকে হারালো; আর জেটি নিরপেক্ষ আন্দোলন হারালো জেটি নিরপেক্ষ দেশগুলোর একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে।"

মুজিব হত্যার ঘটনায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল রাজ্জাক শোকাহত হন। কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শেখ সালাহও শোক প্রকাশ করেন।

শেষ মুজিবের প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়ে ফেলায় নিউইয়র্ক টাইমস গভীর দৃশ্যিত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু মৌলবাদীদের দৃষ্টিতে অসাম্প্রদায়িকতা হল ধর্মদ্রোহীতার নিকট উদাহরণ। করাচি থেকে লভনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় পাঠানো খবরে এস. আর. গৌরি লেখেন “মুজিব বাংলাদেশকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রূপান্বিত করে পাকিস্তানের জনগণকে হতাশ করেছেন।”

লভনের টাইমস পত্রিকা যা কৃত্যাত ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য সেনা শাসনকে সমাধান হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য; লিখেছিল “সেনাশাসন দেশটির জন্য প্রয়োজনীয় এবং ফলদায়ক; এর ফলে দেশে নিরবৃক্ষরণ ঘটবে এবং রাজনৈতিক অঙ্গুষ্ঠার ঝুঁকিও কমবে।” গার্ডিয়ানের কুটনৈতিক সংবাদদাতা আশা প্রকাশ করেন যে নতুন সরকার মুজিবের সাম্প্রতিক ‘বামপন্থীনীতি’ গুলো থেকে সরে আসবে।

সুদানের রাষ্ট্রপতি গাফফুর নামিরি ১৬ আগস্ট চার দিনের রাত্তীয় সফরে রিয়াদ আসেন। একই দিনে সৌদি আরব ও সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

সৌদি আরবের রাজা খালেদ মোতাকের প্রতি বার্তায় বলেন “আমার প্রিয় ভাই, আমি আমার নিজের ও সমগ্র সৌদি আরবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা গ্রহণ উপলক্ষে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। স্রষ্টার কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকবে আপনি যেন আপনার গৃহীত উদ্যোগে সাফল্য অর্জন করেন এবং ইসলামের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যেতে পারেন।”

সৌদি আরবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পূর্বশর্ত ছিল দেশটিকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা। স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে ছুড়ে না ফেলে বাংলাদেশের পক্ষে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পরিষত হওয়া সম্ভব ছিল না। মুজিব ভাবতেই পারতেন না যে কেউ তাঁকে বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র করার প্রস্তাব দিতে পারে।

ভুট্টো ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল কাবুলে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমীতে তার ভাষণে বলেন, “১৯৭২ সালে আমি সিমলায় গিয়েছিলাম কারণ তখন আমাদের শাস্তি দরকার ছিল। কিন্তু এখন পাকিস্তানের চেয়ে ভারতেরই বেশি শাস্তি দরকার। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখা এখন ভারত ও বাংলাদেশের নিজেদের স্বার্থের জন্যই দরকার।” তিনি আরও বলেন, “শিগগিরই এ অঞ্চলে কিছু বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।” ভুট্টো ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে সেনা অভ্যাসানের ইঙ্গিত এখানে দিয়েছিলেন ভাবলে সেটা হয়তো একটু বেশি দূরদর্শিতা হয়ে যাবে, তবুও অনেকেই এমন দাবি করেছেন। যাই হোক তিনি শুধু ভুট্টো সরকারকে খুব দ্রুত স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং এ সরকারকে শক্তিশালী করতে তার পক্ষে যা করা সম্ভব তার সবই করেছেন।

১৯৭৪ সালের জুন মাসে তুঠোর ঢাকা সফরে যে ১০৭ সদস্য বিশিষ্ট দল আসে তার মধ্যে থাকা এক সাংবাদিক সফর শেষে করাচীর 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় বাংলাদেশে সামরিক অভ্যর্থনার মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের সম্ভাবনার কথা লিখেন। তার কাছে এ সম্ভাবনাকে চমৎকার মনে হয়েছিল। কেউ ভাবতে পারেন একজন পাকিস্তানির পক্ষে হয়ত সেনা অভ্যর্থনান ছাড়া ক্ষমতার পালা বদলের অন্য কোন উপায় ভাবা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনায় যারা এক ধরণের অসুস্থ আনন্দ পেয়েছিলেন এমন অনেক পাকিস্তানিই সেটি লুকিয়ে রাখতে পারেননি। পাকিস্তানিদের মধ্যে যারা তখনও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে ঢাকায় যৌথ বাহিনীর কাছে পাক সেনার আত্মসমর্পণের অপমান ভুলতে পারেননি তারা ভাবছিলেন এ রক্তাক্ত অভ্যর্থনার মাধ্যমে তাদের অপমানের প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।

কিছু কিছু পাকিস্তানি সংবাদপত্র শেখ মুজিবকে একজন 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার মর্মান্তিক মৃত্যুকে বলে 'পাপের শাস্তি'।

জেড. এ. সুলেরী'র মত পাকিস্তানের তখনকার শীর্ষ পর্যায়ের সকলেই পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দুই টুকরা করার জন্য দায়ী বিশ্বাসঘাতক মুজিবের মৃত্যুতে সন্তুষ্ট ছিলেন। লাহোরের একটি দৈনিকে তিনি মত প্রকাশ করেন যে 'যতোক্ষণ মুজিব জীবিত থাকবেন' ততোক্ষণ পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ব্যাপক হবে না। তার মতে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির আগেই বিনাশর্তে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেয়াটা ছিল একটি ভুল। পাঞ্চাব শেখ মুজিবের বিনাশর্তে মুক্তি মেনে নিতে পারেনি।

সুলেরী'র মতে শেখ মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কোনদিন দীর্ঘাতে পারতো না।

হংকংভিত্তিক ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ-এর ইসলামাবাদ প্রতিনিধি সালামাত আলী বলেন, "মুজিবের পক্ষে ভারতীয় চাপ মোকাবেলাৰ লক্ষ্যে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি মনে করতেন এর ফলে দেশের মধ্যে থাকা পাকিস্তানপক্ষীরা উৎসাহিত হবে এবং তার অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে।"

মোস্তাক এমনটি ছিলেন না।

বাংলাদেশের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হওয়ার ঘোষণার পরে আর কোন পরিবর্তন আসেনি। ঢাকাকে তার অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য ইসলামাবাদ চাপ দিতে থাকে। সামাজিক ছুটির দিনে দুই রাজধানীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে বার্তা আদান-প্রদান ঘটে। ধারণা করা যায় ঢাকা থেকে যে ব্যাখ্যা আর নিশ্চয়তা দেয়া হয় তাতে ইসলামাবাদ সন্তুষ্ট হয়েছিল।

মোত্তাকের হাত শক্তিশালী করা প্রয়োজনীয় ছিল। যদিও তিনি প্রথমে বাংলাদেশকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র করার ঘোষণা দিয়ে পিছিয়ে আসেন, তারপরও তিনিই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক উষ্ণতর করতে পারবেন বলে ভাবা হচ্ছিল। কি হতো যদি মোত্তাক ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা, যে সভায় দলের নাম থেকে “মুসলিম” শব্দটি বাদ দেয়ার সর্ব সমত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সে সভা, ত্যাগ করে বেরিয়ে না যেতেন। এর ১৬ বছর পর ১৯৭১ সালে যখন তার সংহারী সতীর্থৰা দেশের স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারছিলেন না, তখন এই মোত্তাক পাকিস্তানের সাথে আলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করছিলেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার প্রথম ভাষণেই তিনি ‘জয় বাংলা’ স্ট্রোগানটি বাদ দেন।

মুত্তাক আহমেদ নামের একজন শীর্ষ পাকিস্তানি সাংবাদিক বলেন, “বাংলাদেশ নিজেকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করুক বা না করুক, দেশটি ইসলামিক বলয়ের মধ্যেই থাকবে।” তিনি আরও যোগ করেন, “মোত্তাকের চিন্তায় পাকিস্তানের নামই সবার আগে আসা উচিত।”

দেশটি তখন যেন ‘মুসলিম বাংলা’ হয়ে গিয়েছে। এই শব্দটির কথা ভাবায় অনেক পাকিস্তানিই ভুট্টোর প্রশংসা করেন।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর প্রধান অধ্যাপক গোলাম আয়ম বাংলাদেশের নতুন সরকারকে সমর্থন দেয়ার জন্য সকল মুসলিম দেশকে অনুরোধ করেন।

ঢাকা স্বাধীন হওয়ার ঠিক আগে আগে বুকিজীবী হত্যার জন্য দায়ী যে আল-বদর বাহিনী, সে বাহিনীর সদস্যদের জামায়াতে ইসলামী থেকে বেছে নেয়া হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই জামায়াতে ইসলামী নামের দলটিকে নিশিক্ষ করা হয়।

ভুট্টোকে তার কর্মকাণ্ডের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করে খাজা খায়েরুল্লাহ বলেন, “এটি যেন মাত্র তুর হয়। আচ্ছাহ যেন বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে পরিগত করে দেশটিকে ইসলামী শাসনের উজ্জ্বল উদাহরণ করার মত ক্ষমতা খোলকার মোত্তাক আহমেদকে দেন।”

মুক্তিযোদ্ধাদের যোকাবেলো করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের এ দেশীয় দোসররা যে শান্তি করিটি করে তার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন এই খাজা খায়েরুল্লাহ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর খাজা খায়েরুল্লাহকে শেখ মুজিব একটি পাসপোর্ট দেন যাতে করে তিনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারেন। কিন্তু খায়েরুল্লাহনের গন্তব্য সংগত কারণেই ছিল ইসলামাবাদ, কিন্তু মুজিবের পক্ষে একজন পুরোনো বস্তুর করা অনুরোধ না রেখে খাজা সম্ভব ছিল না।

কটুর ভানপছ্টী এমন পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়ে একত্রে একটি 'কনফেডারেশন' গঠন করার সম্ভাবনাটিকে একেবারে উড়িয়ে দেননি।

এর পাশাপাশি এমন অনেক পাকিস্তানি ছিলেন যারা শেখ মুজিবের মৃত্যুতে শোকাহত ছিলেন।

করাচী থেকে প্রকাশিত সাংগীহিক আল ফাতাহ-এর সম্পাদক ওয়াহাব সিদ্দিকী বলেন, "তিনি (মুজিব) তার দেশের অগ্নৈতিক উন্নতির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু হায় তার নিজের লোকেরাই তাঁকে হত্যা করল। তাঁকে হত্যা করা ছাড়া নতুন সরকারের আর কোন উপায় ছিল না কারণ তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাকে জেলে বা নির্বাসনে পাঠালে জনরোধের কারণে সরকারকে বিপদে পড়তে হত।"

এ বক্তব্য এমন একটি সাংগীহিকের পক্ষ থেকে এসেছিল যেটি ছিল চীনপছ্টী এবং এটি ভূট্টোকে সমর্থন দিয়েছিল।

অনেকেই এই অভ্যাসনের পেছনে সিআইএর হাত ছিল বলে সন্দেহ করেছিলেন এবং এ ঘটনার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করার যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। ওয়াহাব সিদ্দিকী আরও এগিয়ে গিয়ে মতামত দেন, "বর্তমানে যা ঘটেছে তা সিআইএ ১৯৬৯ সাল থেকে যে পরিকল্পনা করে আসছে তার ধারাবাহিকতা ছাড়া কিছু নয়।"

রেডিওতে প্রচারিত অভ্যাসনের প্রথম ঘোষণায় খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে বলা হলেও, মোস্তাক চাইছিলেন প্রমাণ করতে যে সেনাবাহিনীই ব্রহ্মণ্ডের হয়ে অভ্যাস ঘটিয়েছে। ১৫ আগস্টে তার ভাষণে মোস্তাক বলেন 'সেনাবাহিনীকে বাধ্য হয়েই ক্ষমতা দখল করতে হয়েছে।' কিন্তু মাত্র ৬ জন নিম্ন পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তা যাদের মধ্যে অনেকেই তখন আর সেনাবাহিনীতে নেই আর দুই থেকে তিনশ সেনা সদস্য এই অভ্যাসনটি ঘটিয়ে ছিলেন। সৈনিকদের মধ্যে অল্প কয়েক জনই শুধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পরিকল্পনার কথা জানতেন। এবং মেজররা নিজেদের যাই ভেবে থাকুন না কেন, প্রকৃত অর্থে তারা ছিলেন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহযোগী মাত্র।

অভ্যাসনের ফলে খুব কুদ্র একটি গোটীর মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল, যাদের একমাত্র ল্যাই ছিল ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। মোস্তাক ছিলেন ধূর্ত, আর মেজররা ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও রোমাঞ্চপ্রেরণ তরঙ্গ। তাদের কোন রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না এবং তারা জানতেন যে তাদের পক্ষে বৃহস্পুর জনতার সমর্থন আদায় করা সম্ভব ছিল না। তারপরও মোস্তাককে একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাপ্ত জনপ্রিয় নেতা এবং অভ্যাসনকারী মেজরদের আদর্শবাচী তরঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছিল।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৭ আগস্ট তার পিজন ডায়রীতে লিখেন যখন মোস্তাক ভারতে এসেছিলেন তাকে 'অন্যান্য নেতাদের মতেই মুজিবের অনুরাগী ভক্ত' মনে হয়েছিল। কিন্তু জয়প্রকাশের বিশেষ সহযোগী এ. সি. সেন বাংলাদেশ থেকে যখন ভারতে ফেরত যান তখন জয়প্রকাশকে জানান যে 'মোস্তাক এখন মুজিবের পেকে দূরে সরে গেছেন' এবং 'এ মুহূর্তে আওয়ামীলীগে সর্বোপরি সারাদেশে মুজিবের নেতৃত্বকে হ্যাকির মুখে ফেলার মত যদি কেউ থাকে, তবে সেটা মোস্তাক।'

জয়প্রকাশ আরও লেখেন, "কে জানত মোস্তাক এমন নির্মম প্রক্রিয়ায় মুজিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করবেন এবং সফলতা লাভ করবেন?" প্রকৃত অর্পে এটি কোন চ্যালেঞ্জ ছিল না- বরং এটি ছিল একটি চক্রান্ত।

জয়প্রকাশ এরপর লিখেন, "শেষ কথা এটাই: মোস্তাক সম্পর্কে আমার মনে দুইটি ধারণা তৈরি হয়েছিল, তাকে অন্যদের তুলনায় বেশি পচিমাপছ্বী আর একটু বেশি মুসলিম চেতনার অধিকারী মনে হয়েছিল।" জয় প্রকাশ আসলে ভদ্রতা করেই একটু কমিয়ে বলছিলেন।

এ. সি. সেন ঢাকায় অবস্থান কালে মোস্তাকের লোকজনের সাথেই বেশি সময় কাটিয়েছিলেন এবং মোস্তাকের সাথে তার উষ্ণ সম্পর্ক ছিল, তারপরও মুজিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার যোগ্যতা মোস্তাকের ছিল এটা ভাবাটা তার পক্ষে নির্বুদ্ধিতা ছিল। এটা কি ইচ্ছা প্রসূত কলনা ছিল না কি সেন ইচ্ছাকৃতভাবেই জয়প্রকাশকে ডুল পথে চালিত করছিলেন।

কর্মেল তাহের তার বক্তব্যে সঠিক কথাটি বলেছেন, "এটা স্পষ্ট ছিল জনগণের মধ্যে মোস্তাকের কোন ভিত্তিই ছিল না। সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ বাদে পুরো সেনাবাহিনীতে তার কোন সমর্থক ছিল না, ঠিক যেমন জনগণের মধ্যেও তার জন্য কোন সমর্থন ছিল না।"

পুরো দেশ তো দূরের কথা, মোস্তাক তার নিজের নির্বাচনী এলাকাতেও জনপ্রিয় ছিলেন না। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি অঞ্জের জন্য হারেননি। তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তার যে জীবনবৃত্তান্ত সরকার প্রকাশ করে তা ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তার ভয়াবহ ফলের লজ্জা কিছুটা ঢেকে দেয়। ঐ জীবন বৃত্তান্তে শেখা হয় "১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে মোস্তাক কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি-হোমনা নির্বাচনি এলাকা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন এবং তার প্রতিষ্ঠিতী পাকিস্তানের একজন সাবেক মন্ত্রী ঐ নির্বাচনে তার জামানত হারান।" কিন্তু ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের বিষয়ে জীবন বৃত্তান্তে ওধু মোস্তাকের পুনর্বার নির্বাচিত হওয়ার কথাটাই লেখা হয়।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৩০০ সংসদীয় এলাকার মধ্যে ২৯১টি তে শতকরা ৭২ ভাগের বেশি ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। এর মধ্যেও মোতাক মাত্র ৭০০ ভোটের ব্যবধানে জয় পান।

পরাজয়ের ভয়ে তিনি মুজিবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে নির্বাচনের আগে তার নির্বাচন এলাকা সফর না করালে হ্যাতো তিনি নির্বাচনে হেরেই যেতেন।

থখন মুজিবকে একজন বক্তৃ জিজ্ঞেস করেছিলেন, “মোতাককে নির্বাচনে জেতাতে সাহায্য করা কি আপনার জন্য খুব জরুরী ছিল?” তখন জবাবে একটু হেসে মুজিব বলেছিলেন, “সে আমার একজন পুরোনো সহকর্মী।”

মোতাকের নির্বাচনী জয়ে সাহায্য করতে পেরে মুজিব নিজের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু মোতাক মুজিবের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষাণ্বিত ছিলেন, এবং তিনি যে অল্পের জন্য নির্বাচনে হারেননি তা নিয়েও তার ক্ষোভ ছিল। খুব কাছের বস্তুদের সাথে আলাপকালে মোতাক প্রায়ই ক্ষোভের সাথে বলতেন, “এত জনপ্রিয় হওয়ার মত এমন কি করেছেন শেখ মুজিব? আমিও তো আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি সাত বছর কারাবন্দীও ছিলাম।”

ক্ষমতার সাথে সাথে নতুন নতুন বক্তৃ আর ভক্ত জুটে যায়, কিন্তু মোতাকের খুব কম বক্তৃ আর ভক্ত ছিল, এমন কি তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরও পরিস্থিতি খুব বদলায়নি। মোতাক ক্ষমতা গ্রহণের এক সঙ্গাহ পর একজন মধ্যবয়স্ক লোক দাউদকান্দি সেতুর কাছে মোতাকের প্রশংসা করার ভুল করে বসেন। সাথে সাথেই কিছু ডরণ তার উপর ঢাকা ও হন। এটা মোতাকের নিজের নির্বাচনী এলাকা ছিল, কিন্তু তার পক্ষে কথা বলার মত লোক সেবানে কেউ ছিল না। মধ্যবয়স্ক ঐ লোকটি কোন মতে ক্ষমা প্রার্থনা করে পাঢ় পেয়ে যান।

যে মেজররা বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়েছিলেন তাদের হাবভাব এমন ছিল যেন তারা পাকিস্তানের সামরিক জাত্তার উত্তরাধিকারী। তারা ক্ষমতার দণ্ডে উন্নত আচরণ করারছিলেন আর সবার কাছেই বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিলেন। তারা তাহের উকীল ঠাকুর এবং আরও কয়েকজন মন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, যাদেরকেই তাদের অপছন্দ হচ্ছিল তাদের প্রেক্ষিতার করছিলেন, কিছু কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বলপ্রয়োগ করে অর্থ আদায় করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে এমন কি রাষ্ট্রপতির আদেশও লঙ্ঘন করছিলেন। তারপরও এই মেজরদের মনে হচ্ছিল তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বন্ধিত করা হচ্ছে। তারা বাকিদের বিকলকে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যকার বিভিন্ন তাদের সেই অনুভূতিকে চাপা দিচ্ছিল। এসব হতাশা থেকে এই মেজরদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়ই লাখি দিয়ে রাষ্ট্রপতি মোতাকের কক্ষে চুক্ত পড়ে তার সামনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। তারা আরও রাজনীতিবিদকে হত্যার হমকি দিচ্ছিলেন। জনরোধের কথা ভেবে মোতাক তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাদের রজ পিপাসা তখন বেড়ে গিয়েছে, ক্ষুক্তভাবে অফিসারদের মধ্যে একজন বলে উঠেছিলেন, “আমরা

যদি মুজিবকে হত্যা করতে পারি, তবে অন্য যে কাউকেই হত্যা করা আমাদের ধারা সম্ভব। তার বক্তব্যের ইঙ্গিতটি স্পষ্ট ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতির হৃষ্ণায়াম না থাকলে এই মেজরদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ঝুঁকি ছিল, অন্যদিকে এই মেজরদের ছাড়া মোস্তাক অসহায় হয়ে পড়তেন। কাজেই ভাল লাগুক বা না লাগুক মোস্তাক আর মেজরদের নিরূপায় হয়ে সংঘবন্ধ হয়ে থাকতেই হয়েছিল।

একদিকে মোস্তাক সেনা অফিসারদের শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সমর্পন আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। রাজনৈতিকবিদদের সাথে আলোচনায় তিনি দাবি করতেন যে তিনি না থাকলে সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবেই ক্ষমতা দখল করে নিত।

অভ্যর্থনার কয়েকদিন পর মোস্তাক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) এর মোজাফফর আহমদকে বলেছিলেন, “যখন আমরা রেডিও স্টেশনে ছিলাম তখন মেজররা আমাকে বারবার বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, ‘বাবা, এতো তাড়াছড়া করা যাবে না। এই এখন এখানে বসেও আমি দেখতে পাই আওয়ামী লীগের সমর্পকদের একটি যিছিল আমাদের দিকে অর্ধাং রেডিও স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে।’”

বাংলাদেশকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হলে দেশে গৃহযুক্ত শুরু হবার আশঙ্কা না থাকলে মোস্তাক হয়তো ঘোষণাটি দিয়েই ফেলতেন। তার কোন জনসমর্পন ছিল না, সেনাবাহিনীর একটা শুরু ছোট অংশ তখন তার সাথে ছিল। তাকে আগে ক্ষমতায় ঠিকমত বসতে হবে, তিনি ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

আওয়ামী লীগের সাংসদদের সাথে আলোচনার সময় মোস্তাক শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ বলে সংযোগ করছিলেন। তিনি বলেন যখন পরিবারের কর্তব্যাক্তির মৃত্যু হয়, তখন পরিবারের সদস্যরা শোকগ্রস্ত থাকেন, কিন্তু তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোও পালন করে যেতে হয়। তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্য শোকাহত ছিলেন, কিন্তু দেশ পরিচালনার শুরু দায়িত্বগুলোও তাকে পালন করে যেতে হচ্ছে বলে মোস্তাক দাবি করছিলেন। মেজররা তাকে সংসদ বিলুপ্ত করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। এতেদিন তিনি তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারলেও, তার দলীয় সতীর্থরা তাকে সহায়তা না করলে তার পক্ষে এটা আর বেশি দিন চলিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল না।

আওয়ামী লীগের অধিকাংশ সাংসদই মোস্তাকের এই সহায়তা প্রত্যাশাকে ঘৃণা র চেথে দেখেছিলেন। যখন তাদের সমর্পন পেতে মোস্তাক ব্যর্জ হলেন তখন তিনি অন্যদের দারত্ত্ব হন যাতে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা যায়।

দৈনিক ইতেফাকের সম্পাদনা পর্বদের সভাপতি মইনুল হোসেন হঠাতে আবিক্ষার করেন যে তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। রাজনৈতিকভাবে মোস্তাকের অনেক

কাছের লোক হওয়ায় এ সময় পর্মার আড়ালে থেকে যোগাকের জন্য সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন।

শাভাবিক কারণেই সবাই জানতো, নতুন সরকার সব গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তাদের পছন্দের লোক বসাবে। শফিউল আয়মকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করতে সেক্ষেত্রে জেনারেল পদ দেয়া হয়, এবং মাহবুবুল আলম চাষীকে রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়। তবারক হোসেনকে নতুন সরকারের পররাষ্ট্র সচিব করা হয়। এই তিনজনই পাকিস্তানপক্ষী ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে নামাভাবে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছিলেন। নতুন সরকারের চরিত্রটা এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকেও নিচয়ই এ উদ্যোগগুলো লক্ষ করা হয়েছিল।

১৯৭১ সালের দুর্ভাগ্যজনক সেই মার্চ মাসে শফিউল আয়ম ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিব। এই পদে তিনিই প্রথম বাঙালী ছিলেন না যেমনটি অনেক সাংবাদিক ধরণে করে থাকেন। এর দশ বছর আগে আইয়ুব খানের সেনা শাসনামলে কাজী আনোয়ারুল হক, যিনি আই পি এস ক্যাডার থেকে এসেছিলেন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। হক একজন ভদ্র ও রুচিশীল ব্যক্তি ছিলেন, যার সঙ্গীত ও সাহিত্যপ্রতীক সবার জানা ছিল। যাই হোক পাকিস্তানি সেনা গোয়েন্দারা বিশ্বাস করে না এমন কোন বাঙালীকেই কখনো পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিব করা হয়নি।

এই কাজী আনোয়ারুল হক ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর আবার দৃশ্যপটে হাজির হন, প্রথমে সেনা সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে এবং পরে একজন মন্ত্রী হিসেবে।

১৯৭১ সালের মার্চের ২ তারিখে যখন মুজিব অসহযোগের ডাক দেন তখন প্রায় সর্বস্তর থেকেই সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। সরকারী কর্মকর্তারা মুজিবকে সমর্থন দিয়েছিলেন, এমন কি ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিক্কা থানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ পাঠ করাতে অবৈক্ষিক জানান। কিন্তু শফিউল আয়ম তার পদ আকড়ে ছিলেন, এমনকি ২৫ ও ২৬ মার্চ গণহত্যার পরও বেশ কিছু সময় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

শামসুন্দীন নামের একজন তরুণ সিএসপি অফিসার ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সিরাজগঞ্জে উপবিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। পাকবাহিনী যখন সিরাজগঞ্জ দখল করে তখন এই তরুণ জাতীয়তাবাদী সিরাজগঞ্জবাসীকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শফিউল আয়ম বৈবাহিক সম্পর্কে এই শামসুন্দীনের আত্মীয় ছিলেন; তিনি শামসুন্দীনকে ঢাকায় আসতে সম্মত করান এবং তাকে সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যান।

শফিউল আয়ম তার বন্ধু জেনারেল রাও ফরমান আলী তাকে শামসুন্দীনের কোন

ক্ষতি না করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু খিটভারী ফরমান আলী জাচ্ছার্যা 'ব্যাঘ' জেনারেল নিয়াজীর চেয়েও ভয়ঙ্কর লোক ছিলেন।

শামসুজ্জিনকে প্রচও অত্যাচার করে হত্যা করা হয়, এবং এমন কি কবর সেয়ার জন্য তার লাশটিও তার পরিবারের কাছে হত্যাত্তর করা হয়নি।

এ ঘটনায় শফিউল আয়ম যদি মর্মাহত হয়েও থাকেন, তা তিনি প্রকাশ করেননি। তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন বলে ডেবেছেন এবং এর ফলে পাকিস্তানি সরকারকে তার সেবা দেয়ার যে ইতিহাস তা থেকে একটি কলঙ্ক মুছে গেল বলে ডেবেছিলেন।

পরে শফিউল আয়মকে পাকিস্তানে বদলী করা হয়। এটা তার জন্য ভালোই হয়েছিল, কারণ ঢাকায় থাকলে তাকে নিরসন মৃত্যুভয়ের মধ্যে নেঁচে পাকতে হত এবং হয়তো পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মোনেম খানের মত তাকেও মৃত্যুবাহিনী হত্যা করত।

১৯৭৩ সালে শফিউল আয়ম বাংলাদেশে ফিরে আসেন। অনেকেই তার পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন, তারা তার একাডেমিক সাফল্য আর প্রশাসনিক কাজে দক্ষতার উপর বিশেষভাবে জোড় দিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব তাকে মনে নিতে পারেননি।

মাহবুবুল আলম চারী একজন বেশ কৃচিশীল এবং মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শফিউল আয়মের সাথে তার পার্থক্য ছিল যে তিনি সহজেই লোকের সাথে মিশতে পারতেন। পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানি দৃতাবাসে কর্মরত থাকা অবস্থায় মার্কিন প্রশাসন ও একাডেমিক বলয়ে যেসব লোকের সাপে তার পরিচয় হয়েছিল তিনি তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

তিনি ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দণ্ডের থেকে অব্যাহতি নেন এবং কুসি কাজে নিয়েজিত হন। তিনি কৃটনীতিক হিসেবে তার প্রতিশ্রুতিশীল ক্যারিয়ার ফেলে ঢাষ্টাবাদে মন দিয়েছিলেন। অনেকে তাকে একজন আদর্শবাদী লোক ভাবতেন, অনেকে তার এ কাজকে পাগলামী মনে করতেন। কিন্তু সত্তা ছিল এটাই যে তাকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দণ্ডের থেকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পর জেনারেল আইন্যুন খান যে নীতি নিয়েছিলেন যেটাকে পাকিস্তানি প্রচারকরা 'একটি নিরপেক্ষ নীতি' বলতে ভালবাসতেন, সেই নীতি বাস্তবায়নের জন্য এই অত্যন্ত মার্কিনপক্ষী কৃটনীতিকে বহাল রাখা সমস্যাকর মনে করছিল তখনকার সরকার। মাহবুবুল আলমের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ থাকলেও সে সময়কার পররাষ্ট্র সচিব আজিজ আহমদ খানের বদান্যতায় সে অভিযোগগুলো তদন্ত হ্যানি (ঘটনাচক্রে ১৯৭৫

সালের আগস্টে যখন অভুতান সংঘটিত হয় তখন আজজ আহমেদ পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন)।

সারাবিশে যখন 'সবুজ বিপ্লব'কে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সকল সমস্যার সহজ সমাধান হিসেবে প্রচারণা চালানো হচ্ছিল সে সময়টাতে মাহবুবুল আলম কৃষিকাজ তরু করেন। আন্তর্জাতিক মহল থেকে তিনি বিভিন্ন সুবিধা পেয়েছিলেন এ কারণে।

'চার্ষী' বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি যিনি তার নিজের অধিবা অন্যের কাছ থেকে বর্গ নেয়া শুরু এক খণ্ড জমিতে কৃষিকাজ করেন। মাহবুবুল আলম ছিলেন একজন অন্দুলোক কৃষক, কিন্তু পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের পার্থক্য এই জায়গায় যে এখানে বিস্তৃশালী হলে সেটা রাজনীতি করার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এখানকার সব রাজনৈতিক নেতারাই হয় মধ্যবিত্ত অথবা কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট ভালো জানতেন বলেই নিজেকে একজন চার্ষী হিসেবে উপস্থাপন করছিলেন। প্রথমদিকে তার বক্তৃতা তাকে কৃষক হিসেবে অবজ্ঞার চোখে দেখলেও, তিনি তার নতুন ভূমিকায় এত ভালভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন যে তামে সবাই তাকে মাহবুবুল আলম চার্ষী নামে ডাকতে শাগল।

১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চে পাক বাহিনী যখন বাঙালীর উপর চড়াও হল তখন মাহবুবুল আলম সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি কয়েকদিনের জন্য কৃষিকাজ বন্ধ রাখবেন। তিনি বুঝেছিলেন এই সময়টাতে তিনি তার কূটনৈতিক দক্ষতা ও যোগাযোগগুলো কাজে লাগাতে পারবেন। শফিউল আব্দম যখন পূর্ব পাকিস্তানে তার পদ আঁকড়ে ধাক্কেলেন, সে সময়টাতে মাহবুবুল আলম সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গেলেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না।

১৯৭১ সালের এপ্রিলে যখন বাংলাদেশের অঙ্গীয়ি সরকার গঠিত হল তখন মোতাক বেশ নির্ণিতভাবেই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন, কারণ তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে তিনি কিছু বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। মাহবুবুল আলম চার্ষী ছিলেন তখন পররাষ্ট্র সচিব। মোতাক ও মাহবুবুল আলম চার্ষীর জুটিটি হয়েছিল চমৎকার।

মোতাক তার সহযোগিদের না জানিয়ে পাকিস্তান সরকারের সাথে ঔভার করতে অধীর ছিলেন, আর মার্কিন সরকারও তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা রূপে দিতে চাইছিল; এই দুয়োর মধ্যে একজন আদর্শ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিলেন মাহবুবুল আলম চার্ষী।

মুক্তিযুদ্ধ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন তাদের চতুর্ভুক্ষ ফাঁস হয়ে যায়। মাহবুবুল আলম চার্ষাকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। যোঙ্কাক তখনও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তাকে ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়েছিল।

ষড়যন্ত্রকারী ও তাদের সহযোগীদের জন্য এটি ছিল একটা বিশাল আঘাত। তারা তখন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

১৯৫৮ এর অক্টোবরে যখন আইয়ুব খান সেনা শাসন জারি করেন তখন পাকিস্তানের আমলারা বেশ বিপদে পড়ে যান, কিন্তু আমলাদের সহযোগিতা আইয়ুব খানের প্রয়োজন ছিল এবং খুব দ্রুতই আমলারা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হয়ে উঠলেন।

বাংলাদেশে যারা অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছিল তাদের কোন ক্ষমতার ভিত্তি ছিল না এবং তাদের কর্তৃত্বকে কেউ সরাসরি চ্যালেঞ্জ না করলেও সেটি প্রশ়্নের সম্মুখীন ছিল; ফলে তাদের আমলাতন্ত্রের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হচ্ছিল।

নতুন সরকার সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতেও নিজেদের পছন্দের লোক বসাইল। অক্টোবরের ২৪ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, এবং মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর জায়গায় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান করা হয়।

আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ওসমানী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং মুজিব সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যখন দেশে শুধু একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে এমন সিদ্ধান্ত সংসদে নেয়া হয় তখন তিনি সংসদ সদস্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কারও পরামর্শে নয়, এটি তিনি করেছিলেন নিজ দায়িত্বেই। তিনি একজন দৃঢ়চেতা এবং সৎ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু রাজনীতির মাধ্যমে তিনি এতটাই অদ্বৃদ্ধর্শী ছিলেন যে তার কারণে তার বন্ধুদের মাঝে মাঝেই লজ্জায় পড়তে হত।

তার ন্যূনতম বিবেচনাবোধ থাকলে তিনি বুঝতে পারতেন যে ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু তার নামটাই ব্যবহার করতে চাইছে এবং তিনি তাদের প্রত্যাবিত পদটি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করে তিনি জনমনে দ্বিখা তৈরি করেছিলেন এবং একটি আপোষ করেছিলেন। কিছু সময় পর তিনি ঐ পদ থেকে পদত্যাগ করলেও ততক্ষণে যে ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে।

জিয়া সেনা প্রধান হতে যাচ্ছেন এটা সবাই জানতেন। জিয়া ও শফিউল্লাহ একই ব্যাচের হলেও ‘অর্ডার অফ মেরিট’ অনুসারে জিয়া নিজের জেন্ট্যান দাবি করতে পারেন।

এরশাদের উধান বেশ কৌতুহলোদ্দিপক হলেও, এটা সবার দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা মুক্তিযুক্তে অংশ নিয়েছিলেন তারা খুব দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে যান এবং কিছু মেজর দুই তিনি বছরের মধ্যেই মেজর জেনারেল হয়ে যান। কিন্তু এরশাদকে পাকিস্তান থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ পরে ১৯৭৩ সালে ফিরিয়ে আনা হয়। এছাড়াও তিনি অফিসার ট্রেনিং স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন, কোন মিলিটারি একাডেমী থেকে নয়। মোট কথা এরশাদ সেনাবাহিনীর এলিটদের মধ্যে ছিলেন না। এরপরও ১৯৭৫ সালে তারতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় তাকে তিন মাসের মধ্যে দুইবার পদোন্নতি দেয়া হয়: জুন মাসে তাকে প্রথমে ব্রিপ্সডিয়ার পদে এবং আগস্ট মাসে তাকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এমনকি বাংলাদেশে যখন চারপাশেই খুব দ্রুত অনেকের পদোন্নতি হচ্ছে তখনও এরশাদের উপরে ওঠার গতি ছিল চমকে দেবার মত।

এয়ার ভাইস মার্শাল তওয়ারকে জার্মানী থেকে ফিরিয়ে এনে অঞ্চলবরের ১৬ তারিখে বিমান বাহিনীর প্রধান করা হয়। তিনি ন্যাটো এয়ারফোর্স স্কুলে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পর তার জার্মান স্ত্রীকে নিয়ে জার্মানীতেই বসবাস করেছিলেন।

১৫ আগস্ট সকালে রেডিওতে বাংলাদেশ এখন সেনা শাসনের অধীনে আছে বলে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তার কোন সত্যতা ছিল না। কেউই সেনা শাসন জারির ঘোষণা দেয়নি।

২০ আগস্ট মোস্তাক নিজেকে সেনা শাসন জারি করার, সেনা আইন বহাল করার এবং বিশেষ আদালত চালু করার ক্ষমতায় ক্ষমতায়িত করে নেন।

দুই দিন পর সরকারের মনে হয় যে কিছু বিষয় পরিকার করা দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, “সংবিধান এখনও বলবৎ আছে, এবং সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রের চারটি প্রধান নীতি- জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র-অপরিবর্তিতই আছে। এমন কি জাতীয় সংসদও বিলুপ্ত করা হয়নি।”

১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকারে মোস্তাকের সহকারী ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং এইচ কামরুজ্জামান; মোস্তাক এদেরকে তার সরকারে যোগ দেয়ার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারা এ ফাঁদে পা দেননি। যখন মিষ্টি কথায় কাজ হয়নি, তখন মোস্তাক তাদের হমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি।

এই চারজনসহ আরও কয়েকজন নেতাকে ১৯৭৫ সালের ২৩ আগস্ট সেনা আইনের আওতায় প্রে�তার করা হয়।

একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক সন্তোমের সাথে উল্লেখ করেন যে মোস্তাক মুজিব নগর সরকারে তার চারজন সহযোগীকে গ্রেফতার করেছেন যারা সবাই ভারতের প্রতি বক্রতাবাপন্ন ছিলেন।

ভারতের নাম উল্লেখ করতে মোস্তাকের ভীষণ অব্যুক্তি ছিল, এমন কি তার ১৫ আগস্টের ভাষণে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের জীবন দেয়ার কথা বলেছিলেন তখনও তিনি ভারতের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ভারতের প্রশংসন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাঝায় করেছিলেন। তিনি ভারতকে ‘খুব ভাল বক্র’, সোভিয়েত ইউনিয়নকে ‘ভাল বক্র’ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ‘বক্র’ বলে আখ্যা দেন, যখন ২০ আগস্ট এ তিনটি দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান।

তিনি একই ধারা বজায় রাখেন ২৫ আগস্টে ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা চিঠিতে। তিনি বলেন, “আমাদের দুই দেশের মধ্যকার বক্রতপূর্ণ সম্পর্কের মূলে রয়েছে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যৌথভাবে যে সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছি সেগুলো। বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণের কাছে দুই দেশের মধ্যে যে বক্রত রয়েছে তা অমূল্য।” দুই দেশের মধ্যে যে সমস্ত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও সমরোতা রয়েছে সেগুলোর প্রতি স্বামান দেখানোর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিজ্ঞা তিনি পুনর্ব্যুক্ত করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, “কোন ধরণের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত ছাড়া আমাদের দুই দেশের সরকারগুলো নিজেদের মধ্যকার বক্রত, ভ্রাতৃত ও শান্তি বজায় রাখতে একে অপরকে সহায়তা করবে বলে আমার যে আত্মবিকাশ রয়েছে তা আপনার কাছে বিনোদভাবে প্রকাশ করছি।”

মোস্তাক দেশের মধ্যেই বিভিন্ন দিক থেকে চাপে ছিলেন। এর মধ্যে সীমান্তে যেকোন ধরণের উত্তেজনা তার অবস্থানকে আরও কঠিন করে তুলত।

ইন্দিরা গান্ধী তার জবাবে জানান তিনিও বিশ্বাস করেন যে ভারত ও বাংলাদেশ ‘এ অঞ্চলের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য একসাথে কাজ করে যাবে’ বলে তিনি বিশ্বাস করেন, তিনি আরও বলেন ‘আমরা আমাদের যৌথ ত্যাগের কথা অবশ্যই মনে রাখবো।’ ইন্দিরা গান্ধীর এই সঠিক কিন্তু নিরস্তাপ প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রচার করা হয় এবং এমনকি একজন রেডিওতে বলে বসেন যে এটি বাংলাদেশে পট পরিবর্তনে ভারতের সম্মতির লক্ষণ।

যদিও চীন ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পথে বাধা হয়ে ছিল, কিন্তু তারা এটা জোড় দিয়েই বলছিল যে মুজিবের বিরুদ্ধে তাদের কোন বিহেব নেই। কিন্তু মুজিব হত্যার মাত্র ১৬ দিনের মাথায় ৩১ আগস্ট চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

চীনের স্বীকৃতি লাভ বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। এই সংবাদপত্রগুলো চীনকে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে দেখত। ঢাকার একটি

সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় সম্পাদকীয়তে লেখা হয় ‘বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব’ এখন নিরাপদ।

আগের জাতীয় পোষাকে এখন আর চলছিল না। এখন দরকার হয়ে পড়ল আরেকটু বেশি ‘ইসলামিক’ কোন কিছুর।

যখন মঙ্গীসভায় নতুন জাতীয় পোষাক কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা চলছিল, তখন মোস্তাক তার মাথার টুপি খুলে টেবিলের উপর রাখেন। এই ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরে একজন মঙ্গী প্রত্নাব করেন গলাবক্ষ একটি শব্দ কোট এবং মাথায় টুপি হওয়া উচিত নতুন জাতীয় পোষাক। এ প্রত্নাবটি সর্ব সম্মতভাবে মঙ্গী সভায় পাশ হয়ে যায়।

এটি ছিল আসলে পাকিস্তানের জাতীয় পোষাক। মোস্তাক শুধু জিম্মাহ টুপিটি বদলিয়ে দেন।

কোণা থেকে তারা অতি অল্প সময়ে এতগুলো ‘মোস্তাক টুপি’ জোগাড় করেছিল? এগুলো ভারত থেকে অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

সকল রাষ্ট্রীয় প্রকাশনায় মোস্তাক টুপি বিশেষভাবে দেখানো হত। মতা নিয়ে এক ধরনের লড়াই তখন চলছিল, কেউ নিশ্চিত ছিলেন না আসলে তখন কে দেশ চালাচ্ছিল। অভ্যাসনকারী মেজররা রাষ্ট্রপতির আদেশ অমান্য করছিলেন, সেন সদর দপ্তর রাষ্ট্রপতি আর এই মেজরদের মতাকে প্রশ্নের মুখোযুক্তি করছিলেন।

সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস এ সেনা সদর দপ্তর থেকে একজন অফিসার ফোন করে নির্দিষ্ট কিছু খবর প্রকাশ করার নির্দেশ কে দিয়েছেন সেটা জানতে চান। জবাব আসে এই খবরগুলো প্রকাশের নির্দেশ এসেছে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিবের কাছ থেকে। খবরগুলো তাংশিকভাবে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন এই অফিসার।

কার নির্দেশ মেনে কাজ করতে হবে?

একজন মুসলিমের জন্য যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া বাধ্যতামূলক, মোস্তাক তার চেয়ে বেশি নামায পড়তে লাগলেন।

পাকিস্তানি সুর

পাকিস্তান আমলে সেনা বাহিনী কর্তৃক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিটি বেসামরিক সরকার উৎখাতের পেছনে অজুহাত হিসেবে দেখানো হত 'গৃহযুদ্ধ'কে।

অজুহাত হিসেবে তার চেয়েও বেশি শোনা গেছে 'ইসলাম হ্যাকির মুখে' এরকম অজুহাত। দেশ বিভাগের পর একদম শুরু থেকেই এই অজুহাত এত বেশি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে যে একবার তুরস্কের রাজা ফারুক বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে পাকিস্তানিরা মনে করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ইসলাম বলতে কিছু ছিল না। ঢাকার একজন সম্পাদক ফারুকের কথাই একটু অন্যভাবে লিখেছিলেন "যোহাম্মদ আলী জিনাহর সহায়তায় ত্রিপিশরা পাকিস্তান তৈরি করার আগে ইসলাম কখনোই এতোটা বিপন্ন ছিল না।"

পাকিস্তান শুরু থেকেই একটি 'বাফার স্টেট' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছিল, এবং আগে বা পরে সেনাবাহিনী সেখানে মতা দখল করতাই; সর্বেপরি পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই 'ইসলাম হ্যাকির মুখে' এই সুরের সাথে তাল মিলিয়ে চলা হয়েছে।

জেনারেল জিয়াউল হক বেশ গর্বের সাথেই বলেছেন, "শান্তিপূর্ণ অভ্যুত্থানের একটি ঐতিহ্য আমরা গড়ে তুলেছি।"

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার উৎখাত করার ঐতিহ্য!

অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষের ছিল দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস এবং যে সমস্ত রাজনীতিবিদ ও সেনানায়ক সাম্প্রদায়িকভাবে লালন করতেন তাদের এদেশের মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করেছিল। তারপরও যেদিন মুজিবকে হত্যা করা হয়েছিল সেদিন এবং তার পরেও এদেশে 'গৃহযুদ্ধ' আর 'হ্যাকির মুখে ধাকা ইসলাম' এমন সব পাকিস্তানি সুর বাজানো হয়েছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই এদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং মুজিবের বিরুদ্ধে যারা যত্যন্ত করেছিলেন তাদের কেউ কেউ এ চক্রান্তে যুক্ত ছিলেন। তারা ভেতরে থেকেই চক্রান্ত করেছিলেন; তারা মুক্তিযুক্তে অংশ নিয়েছেন বলে যে সাধারণ বিশ্বাস ছিল তা তাদের কাজ সহজ করে দিয়েছিল। এদের বদলে যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন তারা অভ্যুত্থান করতেন তাহলে সাথে সাথেই এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠত।

১৫ আগস্টের তিনটি আক্রমণকারী দলের নেতৃত্বে যে মেজররা ছিলেন তারা সবাই ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৈরি এবং অধিকাংশ পাকসেনা অফিসারদের মতই তারাও মনে করতেন তাদের জন্ম হয়েছে শাসন করার জন্য এবং নিজেদের মহৎ মনে করার বিদ্রমে আক্রান্ত ছিলেন তারা মেজর ফারুক ছিলেন এদের মধ্যে সবার আগে।

এই মেজরদের মধ্যে কয়েকজন পাকিস্তানের 'অপারেশান ফনিং'র অংশ ছিলেন।

ইসলামের নামে পাক দখলদার বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে এত বেশি অপকর্ম সংঘটিত করেছিল যে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এমন কি 'ইনশাআল্লাহ' বা 'আসসালামুআলাইকুম' এর মত নিত্যনিনের সম্ভাষণ তনলেও অনেক মুক্তিযোদ্ধা ক্ষেত্রে ফেটে পড়তেন। এসব মুক্তিযোদ্ধাদের ভাইদের পাকিস্তানিরা হত্যা করেছিল এবং বোনদের সন্ত্রমহানী করেছিল; আর এই শব্দগুলো তনলে তাদের সেসব পাকিস্তানিদের কথা মনে পড়ে যেত।

এসব অপকর্ম এস মাসুদুর রহমান নামে একজন শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানি সাংবাদিকের কাছে এতটাই খারাপ লেগেছিল যে তিনি পাকসেনাদের খুনী, লুটেরা ও ধর্ষক বলেছিলেন।

কিন্তু পাকসেনারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অপকর্ম নিয়ে গর্বিত ছিল। পাক সেনাদের মনে এমন ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে তারা বাঙালীর আরও হাজার বছর শাসন করবেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে যখন পাক সেনারা ধরে নিয়েছিল যে বাঙালীর স্বাধীনতার চেতনাকে চিরতরে গুড়িয়ে দিতে সম হয়েছেন, তখন পাক বাহিনীর একজন কর্নেল বলেছিলেন, "এই ভূখণ্টি এখন আর কায়েদ এ আজমের পাকিস্তানের অংশ নয়, বরং এটি আমাদের বিজিত ভূমি। বাঙালীরা এতদিন উপনিবেশিকতার কথা বলেছে, এখন তারা উপনিবেশিকতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবে। তারা আর কখনো এমন কি স্বাধীনতার স্পন্দন দেববে না।"

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে একজন পাকিস্তানি মেজর ডের স্পেইগেল কে বলেন "তাদের মধ্যে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে হবে যেন বাঙালীর তৃতীয় প্রজন্ম এটা মনে রাখে।"

এরপরও চার বছরের মধ্যেই ফারুক এবং রশিদ পাক বাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মানুষের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল তা ভূলে যান।

সানডে টাইমসে ৩০ মে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ফারুক বলেন, "মুজিব তার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলেন। ইসলাম হল এদেশের মানুষের ধর্ম, আর এই একটি জিনিসই সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশঠননা দিতে পারে।"

ফারুক আরও বলেন, "মাত্র সাড়ে চার বছর সময়ের মধ্যেই মুজিব বাংলাদেশকে প্রায় ধ্বন্দ্ব করে ফেলেন" তার মতে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন প্রায় ২০ লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। প্রকৃত সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ, ২০ লক্ষ নয়।

কিন্তু ফারুক তার বক্তব্যে ভুলজ্ঞমে শেখ মুজিবের শাসন আমল এক বছর বেশি বলেছিলেন, যা তার পক্ষে বেশ বেমানান ছিল। কুব সম্ভবত তিনি ১৯৭২ সালের

১০ জানুয়ারি যে দিন মুজিব তার পাকিস্তানে বন্দী দশা শেষ করে ঢাকায় ফেরত আসেন তার পরিবর্তে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ থেকে মুজিবের শাসনামল হিসেবে গণনা করেছিলেন। ঐ তারিখে মুজিব 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এমন কি হতে পারে যে ফারুকও ইয়াহিয়া খানের মতোই মনে করেন মুক্তি সংগ্রামের সময় বাঙালী জাতিকে যে দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তার জন্য মুজিব দায়ী, যদিও এ কথা তার সরাসরি বলার সাহস ছিল না?"

ফারুক সেই সব অতি ব্যবহৃত রাজনৈতিক ফাঁকা বুলি ব্যবহার করেছিলেন যা সাধারণত সুযোগ সক্ষান্তিরা ধর্মকে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত আদায়ে ব্যবহার করে থাকেন। এমন কি পাকিস্তানের সবচেয়ে পথচারী জেনারেলের এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট রাজনীতিকরাও একথা বলতেন যে বাঙালী নেতারা প্রকৃত মুসলিম নন।

কুয়েতের দৈনিক আল রাই আল আমানকে তাহেরউদ্দীন ঠাকুর বলেন, "শেখ মুজিবের মৃত্যুর ফলে দেশ গৃহযুক্ত থেকে রক্ষা পেয়েছে।"

তাদের দয়া দেখাবার জন্যই নিষ্ঠুর হতে হয়েছে, এমন কি নারী ও শিশুদেরকেও তারা হত্যা করেছিলেন দেশ কে বাঁচাবার জন্যই।

গর্বের সাথে ঠাকুর, আরও যোগ করেন, "আমরা অভ্যাসনের স্বীকৃতিও চাইনি, তখন সরকারে পরিবর্তন এনেছি।" আর কিছুই না।

এটা একটি ব্যক্তিগতি অভ্যাসন ছিল; এখানে পরিবর্তনের চেয়ে ধারাবাহিকতার উপর জোড় বেশি দেয়া হয়েছিল। ষড়যষ্টকারীরা সবাইকে এটাই বোঝাতে চেয়েছিল যে তারা যদি কোন ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা না করে তাহলে তাদের কোন তি তো হবেই না বরং এ থেকে তাদের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রশিদ বলেন তার এমন একজন মুখ্যপাত্রের দরকার ছিল যে জনগণকে এটা ভাবতে বাধ্য করবে—"আমাদের দৈর্ঘ্য ধরে দেখা উচিত শেষ পর্যন্ত কি হয়।" জনগণ একটু দ্বিধাবিত থাকলেই অল্প সময়ের মধ্যে তারা এই অভ্যাসনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বলে মেনে নিবে এবং অভ্যাসনকারীরা নিরাপদে সরে যেতে পারবে।

১৫ আগস্ট সকালে যখন মেজররা একটু দ্বিধায় ছিলেন যে শেখ মুজিবের মৃত্যুর খবর প্রচার করা হবে কি না, তখন তাহের উদ্দীন ঠাকুর তাদের খবরটি প্রচারে চাপ দিয়ে বাধ্য করেন। ঠাকুরের মতে শেখ মুজিবের মৃত্যুর খবর প্রচারে কিছু কুকি রয়েছে ঠিকই, কিন্তু যদি জনতা ভাবতে তরুণ করে মুজিব জীবিত তাহলে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশি। মুজিব জীবিত এমন ধারণা জনমনে থাকলে জনগণ সেনা আইন ডঙ্ক করে ১৯৭১ সালের মত রাস্তায় নেমে আসতে পারে।

ঠাকুরের সিন্ধান্তই ঠিক ছিল: মুজিবের হত্যার সংবাদে সবাই হতবাক হয়ে পড়ে, প্রতিবাদ করতে পারে এমন ব্যক্তিরা এতটাই হতাশ হয়ে পড়েন যে দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবাই বাড়িতেই থেকে যান, যদিও তারা জানতেন যে তাদেরও হত্যা করা হতে পারে।

এদের মধ্যেই একজনকে আগস্টের হত্যায়জ্ঞের অনেক পরে যখন গুরুকাঙ্ক্ষীরা তার 'ইস্পাতের মত দৃঢ় স্নায়ু'র জন্য প্রশংসন করেন তখন তিনি বলেন, "সেই সকালে আমি এতটাই বিহবল হয়ে পড়েছিলাম, যেন আমার স্নায়ুগুলো ধূস হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল যেখানে মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে সেখানে আমার জীবনের পরোয়া করে কোন লাভ নেই। সবকিছুকেই তখন নিখুঁত আর অপ্রযুক্তি মাগছিল।"

অভ্যর্থনার কিছু সময় পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইন্ডিফাকের তরঙ্গ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন (মধু) বলেন, "এই অভ্যর্থনান আমাকে একটুও অবাক করেনি। কুটনৈতিক মহলে বেশ কিছুদিন ধরেই এ নিয়ে গুজ্জন ছিল। জুলাই মাসে একজন কৃটনৈতিক আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন আসন্ন অভ্যর্থনাটি কারা করবে, কট্টর ডানপক্ষীরা না কি কট্টর বামপক্ষীরা।

কট্টর ডান বা বাম গোষ্ঠীর মধ্য থেকে ছাড়া আর কারও অভ্যর্থন করার সম্ভাবনা ছিল না।

এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যগুলো এতেটাই অস্পষ্ট যার সাথে তুলনা করা যায় দুটি দেশের যার মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে এমন একটি নদী যা প্রায়শই পথ পরিবর্তন করে।"

একটু ধেমে মধু আরও যোগ করেন, "শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন যে তার পক্ষে পুরো দেশের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, তিনি নিজেও তাই আর বাঁচতে চাননি।"

মুজিব প্রায়ই মৃত্যুর কথা বলতেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পশ্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত যে বিশাল সমাবেশে তিনি ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন সেখানে তিনি বলেছিলেন, "মনে রাখবে আমি কখনোই দেশের স্বার্থ জলাখালি দিবানা, এমন কি এজন্য মৃত্যুর মুখে পড়তে হলেও না।" তার দৃঢ় বিশ্বাসের এটি ছিল এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আবার মুজিব যখন ইয়াহিয়া খানের সাথে ১৭ মার্চ ১৯৭০^o সালে আলোচনা চালাচ্ছিলেন তখন কিছু সাংবাদিক তাকে তার জন্মদিনের তত্ত্বে জানালে তিনি গুরুতর ভাবে জবাব দেন, "আমার জন্মদিন বা মৃত্যুদিনের কি তরুণ আছে? আমি আমার জনগণের সাথে আছি। আমার জনগণের কোন নিরাপত্তা নেই। তারা মারা পড়ছে।"

এসময় কয়েকজন উভাকাঙ্ক্ষী তাকে পরামর্শ দেন যে ইয়াহিয়া খানের সাথে তার আলোচনা বার্ষ হলে তার আত্মগোপন করা উচিত। জবাবে মুজিব বলেছিলেন, “আমাকে খুঁজে না পেলে তারা পুরো ঢাকা তহলক করে ফেলবে।” এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। মুজিবের একজন বিশ্বত রাজনৈতিক বক্তু তাকে বলেছিলেন, “এবার তারা আপনাকে হত্যা করতে পারে।” জবাবে মুজিব বলেছিলেন, “আমি আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য মরতে রাজি আছি।” তিনি তার মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তার বক্তুদের আর কিছুই করার ছিল না।

তার দেশের মানুষের স্বপ্নভঙ্গের চেয়ে মৃত্যু মুজিবের কাছে শ্রেণ্যতর ছিল। কিন্তু তার জীবন এতেও পরিপূর্ণ ছিল যে মৃত্যু নিয়ে হিধা তার মধ্যে ছিল না। তিনি একজন প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন, পরাজয়ের ডয় তার ছিল না। তার মানে যে বৈপ্লানিক স্বপ্ন ছিল তা বাস্তবায়নের পথের ঝুঁকিগুলো তার জানা ছিল। একজন উভাকাঙ্ক্ষী তাকে সতর্ক করে বলেছিলেন তিনি যে সমস্ত বৈপ্লানিক পরিবর্তনের কপা ভাবছিলেন সে কারণে এমনকি তার কিছু সহকর্মীও তার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারেন। “পরিবর্তনের হওয়ার তারা উড়ে যাবে” মুজিবের জবাব ছিল। এই উভাকাঙ্ক্ষীটি তারপরও বলে গেলেন, “কিন্তু তারা এ জন্য আপনাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে।” এর জবাবে মুজিব বলেন, “আমি জানি আমার জীবন হৃষ্টকির মুখে আছে, কিন্তু একটি জাতি হিসেবে টিকতে হলে আমাদের কিছু একটা করতেই হবে।”

“যত যাই হোক” তিনি এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বক্ষপরিকর ছিলেন।

মুজিবের আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা ছিল না বলে তাকে ট্র্যাজেডির নামক নয় নরং একজন হতাশ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। এটা সবচেয়ে নির্দয় কাজগুলোর একটি।

তোফাজ্জল হোসেন মানিক যাকে সবাই চিনত মানিক মিয়া নামে তার দ্বিতীয় পুত্র আনোয়ার হোসেন (মধু)। মধু দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ছাত্রলীগের একজন জঙ্গী সদস্য ছিলেন এবং ১৯৬৮ সালে যখন আইনুল বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তুলে ছিল তখন মাঝে মাঝে শেখ কামালের সাথে সেনানিবাসের ভেতরে চুকে পড়তেন দেয়ালে ঘোগান লেখার বা পোস্টার স্টাটানোর জন্য।

মধু শেখ মুজিবকে চাচা ডাকতেন এবং প্রায়ই তার বাড়িতে যেতেন সেখানে তাকে পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসেবেই দেখা হত।

যাই হোক ১২ আগস্টে কোলকাতা সফর শেষে মধু যখন ঢাকা এলেন তখন মুজিবের রাজনৈতিক সহযোগী তোফাজ্জল আহমেদ তাকে বলেন, “মঙ্গবক্তু তোমার উপর ক্ষেপে আছেন। তোমার দ্রুততাই তার সাথে দেখা করা উচিত।”

পরদিন মধু গগনবনে গেলেন। মুজিব তখন তাহের উন্নীন ঠাকুরকে সাথে নিয়ে লনে পায়চারী করছিলেন। মুজিব তখন তার হাতের লাঠিটি নিয়ে মধুর দিকে

এমনভাবে তেড়ে যান যেন এটি দিয়ে তিনি মৃত্যুকে আঘাত করবেন এবং বলেন, “তোমার বন্ধুদের বলে দিও আমি মোটেও ভয় পাইনি।”

যে বাণ বেঁকে যায় তা ভাঙেনা, মুজিব ভাঙবেন কিন্তু মচকাবেন না।

এটি অভ্যাসের মাঝে দুদিন আগে ১৩ আগস্টের ঘটনা।

১৩ আগস্টে ফারুক ও মুজিবের সাথে গণভবনে দেখা করেন।

পাকিস্তানি সেনাত্মকের ফশ থেকে আগত হিসেবে ফারুককে একজন সন্তুষ্ট এবং বৃদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হত। তার অধীনস্ত ল্যাক্সারো যারা ১৫ আগস্টে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের পরনে ছিল বেরেট, জ্যাক-বুট এবং কালো ওভারঅল, যা তাদেরকে অন্য সেনা ইউনিট থেকে আলাদা করে রেখেছিল।

ফারুক মুজিবকে বলেছিলেন “রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীদের অন্তত ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার হওয়া উচিৎ এবং ব্যতিক্রমী পোষাক পরা উচিৎ, কেবলমাত্র তখনই তাদের সন্তুষ্ট মনে হবে।” মুজিবের কাছ থেকে জবাব আসে “না।” এতে করে অধিকাংশ বাঙালীই বাদ পড়ে যাবেন এবং এতে তাদের অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হবে। এমন কি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে যেখানে দীর্ঘদিন বেশি সংখ্যায় বাঙালীকে জওয়ান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েন তারা বর্বাকৃতি হওয়ায়, সেখানে বাঙালীকে নেয়ার জন্য তার শর্ত নামিয়ে আনা হয়েছিল।

১৩ আগস্ট যখন মোগাক মুজিবের বাড়িতে তার সাথে দেখা করেন সেদিন তিনি রাসেলের প্রতি শার্জাবিকের চেয়ে বেশি স্নেহপ্রবণ ছিলেন।

রাসেলস থেকে ১৩ আগস্ট শেষ হাসিনা তার মাকে ফোন করেন। সেদিন বেগম মুজিব গলেন, “ক্রুত ফিরে এসো। তোমাদের বাবার তোমাদেরকে বুব প্রয়োজন। বিশ্বারিত ফোনে বলা সম্ভব নয়।” হাসিনার চার বছর বয়সী ছিলে এই ফোনালাপ ব্যাহত করে তার মায়ের বিরক্তে অভিযোগ করতে শুরু করে। “ওকে কখনও শান্তি দিবে না” বলে বেগম মুজিব কাঁদতে শুরু করেন।

এই শেষবারের মত শেখ হাসিনা তার মায়ের সাথে কথা বলেছিলেন। হাসিনা প্রায়ই ভাবেন কী কারণে সেই সক্ষয় তার মা কাঁদতে শুরু করেছিলেন।

১৩ আগস্ট মুজিব আদুর রাজ্জাককে বলেছিলেন, “তোমার বাড়িতে পুলিশ প্রহরা থাকা দরকার।” বাকশালের নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে রাজ্জাকের পুলিশ প্রহরা পাবার অধিকার ছিল, কিন্তু একজন রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে পুলিশ প্রহরার বিষয়টি তার কাছে পুরোনো ধ্যান ধারণা মনে হচ্ছিল। মুজিব বলেন, “আমি ইতিমধ্যেই মণিকে তার বাড়িতে পুলিশ প্রহরা ব্যবস্থা করতে বলেছি। তোমাদের দুজনেরই সাবধান হওয়া দরকার। তোমাদের জীবনের হ্যাকি রয়েছে।”

মুজিবের এ কথাগুলো শব্দণ্ড করে রাজ্ঞাক বলেন, “মুজিব বাকি সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে তেমন কোন সতর্কতা অবলম্বন করেননি।” একটু থেমে রাজ্ঞাক বলেন, “হয়তো মুজিবের মনযোগ অন্যদিকে নেয়ার জন্যই গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাকে আমাদের বিপদের কথা জানিয়েছিল।”

এটি একটি মারাত্মকভাবে বিলম্বিত উপলক্ষ্মি।

বিদেশি যোগাযোগ রয়েছে এমন লোকদের দিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পরিপূর্ণ ছিল। ভূট্টো যখন ১৯৭৪-এর জুনে ঢাকা আসেন তখন অনেক আফসারের পাকিস্তানিদের সাথে দহরম মহরম ছিল চোখে পড়ার মত।

এবং ১৯৭৪ সালের হীচেও ফারমক এবং রশিদ শেখ মুজিবকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

দেশ স্বাধীন হবার আগে গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত জেষ্ঠা গোয়েন্দাদের মধ্যে কয়েকজন বাঙালী শেখ মুজিবের কাছে তথ্য দিতেন। যদিও যে সব ছোট খাটো তথ্য তারা পাচার করতেন তা ছিল প্রধানত অগুরুত্পূর্ণ এবং প্রায়ই সেগুলো বিভ্রান্তিকর ছিল, তারপরও এসব কর্মকর্তারা সম্ভবত তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েই এ কাজগুলো করতেন। এটা মনে রাখতে হবে এসব লোককে প্রশিক্ষণ দেয়াই হয়েছিল অর্তর্ঘাতমূলক কাজ করার জন্য। তারা ছিল প্রকৃত অগ্রেই ধোকাবাজ।

১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ নাহিনী ছিল পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর প্রধান ব্যবস্থাগুলোর একটি। পুলিশের একজন সুপারিনিটেন্ডেন্টকে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছিল কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি একজন চরম বাঙালী জাতীয়তাবাদী। পুলিশের কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মুক্তিযুক্ত যোগ দিলেও গোয়েন্দা বিভাগের সবাই একদম শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করেছিলেন। এমন কি যখন বাঙালী কৃটনীতিকরা পাকিস্তানে কর্তৃপক্ষকে বর্জন করা শুরু করেছিলেন, তখনও বাঙালী গোয়েন্দা কর্মকর্তারা পাকিস্তানিদের কাছে বিশ্বাস ছিলেন। হয়তো তারা ষড়যজ্ঞে এতেটাই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে তারা চাইলেও আর এ থেকে নেরিয়ে আসতে পারছিলেন না তাদের প্রাণের ভয়ে বা ধরা পড়ে যাবার ভয়ে।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফজল মুকিম খান তার ‘পাকিস্তান’স ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ’ এছে লিখেছেন, “মুজিবের ক্ষমতায় না আসার সাথে অনেকগুলো গোয়েন্দা সংস্থার নিজেদের স্বার্থ জড়িত ছিল।”

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কয়েকটি গুরুত্পূর্ণ পদে কিছু বাঙালী কর্মকর্তা ছিলেন। তাদের পদ যাই হোক না কেন বাঙালী হিসেবে তারা পাকিস্তানি প্রচুরের চোখে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ছিলেন; মতান্বিত দিক থেকে এবং প্রশিক্ষণের কারণে

তারা মনে প্রাণে পাকিস্তানি ছিলেন এবং তা প্রমাণ করার জন্য তারা উদয়ীর ছিলেন।

এ.বি.এস. সফদার ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময়, যা কিনা পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচন, পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন এবং তিনি অল্প কয়েকজন বাঙালী কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন যাদের পাকিস্তানের সামরিক জাত্তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতো।

সফদার নির্বাচনের আগে মুজিবের অবস্থান মূল্যায়ন করে মতামত দেন যে মুজিবের জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ অবস্থা পেরিয়ে এখন কমতির দিকে। তার মতে ঐ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগে আওয়ামী লোগের জেতার কথা। কিছু বাঙালী অফিসারকে বলেন যে কোন অবস্থাতেই পূর্ব পাকিস্তানের আসনগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৭০ ভাগের বেশি আসনে জিততে পারবে না। কেন্দ্রের কাছে পাঠানো রিপোর্টে তিনি হয়তো আওয়ামী লীগের জেতার সম্ভাবনা আরও কমিয়ে দেখিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ ঐ নির্বাচনে ১৬৭ টি আসনে জয়লাভ করে। এর ফলে পাকিস্তানের ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ নিরুলুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পাকিস্তানের সামরিক জাত্তার সব হিসাব নিকাশ ভুল প্রমাণ করে দেয়। এর ফলে জনগণের রায় কে বাতিল করার চক্রান্ত শুরু হয়।

নির্বাচনের সময় জনমত বুরাতে এক সফদারই ভুল করেননি। কিন্তু তিনি তার ভবিধ্যাধানী সঠিক প্রমাণ করতে এক বা দুটি দলের হয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি ব্যার্থ হলেও সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যৱোর পরিচালক এন. এ. রিজভী যাকে পাকিস্তানের দুই অংশেই স্বাই ডয় পেত, তার আহ্বা হারালনি। অন্তর্ঘাতমূলক কাজের আরও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সফদারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ যখন পাক বাহিনী বাংলাদেশের মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ছিল, ঠিক সে সময় সফদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ একাডেমিতে টেকনিক্যাল ইন্ডেস্ট্রিয়াল কোর্সের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। তাকে পাকিস্তানে ফেরত আসতে বলা হয়েছিল, কিন্তু ইউ. এস. পাবলিক সেফটি প্রোগ্রামের প্রধান জোসেফ কর এর হস্তক্ষেপের কারণে তিনি তার কোর্স সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তার প্রশিক্ষণ পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে কাজে আসবে।

এই কোর্সের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্স রাষ্ট্রগুলো থেকে পুলিশ সদস্যদের বাহাই করা হয়ে থাকে। কোর্সের অর্ধায়ন করে থাকে ইউ.এস. এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউ.এস.এ.আই.ডি) এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করত সি আই এ। এই কোর্স সম্পন্ন করা পুলিশ সদস্যরা শুয়াতেমালাৰ ‘ওজো পৰ ওজো (চোখেৰ বদলে চোখ)’ বা

ডামনিকান রিপাবলিকের ‘লা ব্যান্ড (দল)’-এর মত ‘মুক্ত হত্যাকারীদের দল’ এর সদস্য হিসেবে কাজ করতেন।

১৯৭১ সালের শ্রীলঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ যখন থীরে থীরে গতিপ্রাণ হচ্ছিল তখন সফদার পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত আসেন এবং তার গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু করেন। কেউ ভাবতে পারেন সফদারকে হয়তো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিজের বদনাম ঘোচাতে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল। কিন্তু সত্যি হলো আওয়ামী লীগের মধ্যে এমন অনেক নেতা ছিলেন যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এমন বামপন্থীদের শায়েত্বা করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন, ডয়কর আলবদর আর রাজাকারদের ধরার বিষয়ে তাদের আগ্রহ কম ছিল; আর এমন নেতাদের মধ্যে অনেকেই সফদারের ভালো বন্ধু ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রীর তদন্তকারী দলের সদস্য করা হয় সফদারকে। একজন কর্মকর্তা হতাশা ব্যুক্ত করে বলেন, “একজন বিশ্বাসযাতককে আমাদের বিচার করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।”

তদন্তকারী দলগুলোকে দুর্নীতির বিকলক্ষে ব্যবহৃত নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হলেও তার মূল আগ্রহ ছিল গোয়েন্দা তৎপরতায়। তিনি তার গোয়েন্দা সূত্রগুলো বহাল রাখতে থাকেন।

মুজিব ডেবেছিলেন যেসব পাকিস্তানপন্থী কর্মকর্তাকে স্বাধীন দেশে পুনর্বাসনের ব্যবহৃত করেছিলেন তিনি তাদের মন জিতে নিয়েছিলেন এবং এরা তার প্রতি বিশ্বক্ষণ ধোকাবেন। কিন্তু কলঙ্কিত অতীত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করাটা ছিল সাপের লেজ দিয়ে পিঠ চুলকানোর মত বিপদজনক।

মুজিব হত্যার পরপরই এই সফদারকে মোস্তাক জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেন। ১৯৭৭-এর ২ অক্টোবরের বার্ষ অভ্যাসনের পর তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

আবু তাহের, জিয়া উদ্দীন, মঞ্জুর আহমেদ এবং আরও কিছু বাঙালী কর্মকর্তা যারা ১৯৭১ সালে পঞ্চম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। অভ্যাসনকারী মেজরদের একজন শাহরিয়ার কোয়েটায় বালুচ রেজিমেন্ট থেকে জুলাই মাসে পালিয়ে আসা কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন।

কিন্তু ফারাক যিনি খুব গর্বের সাথে বলে থাকেন যে তিনি মুজিব হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন কেবল অক্টোবরের দিকে যখন আসলে যুক্তের হাওয়া বাংলাদেশের দিকে ঘুরে যেতে শুরু করেছে এবং এই শেষ মুহূর্তে মোস্তাক আর তার সহযোগীরা দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

হাবিলদার মোসলেম উদ্দীন যে নিজের ভাষ্যমতে মুজিবের উপর গুলি চালান, তাকে পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনা হয় ১৯৭৩ সালে। হন্দা মুজিবকে শুন্দা

করতেন আর এ কারণে মুজিবের উপর সরাসরি গুলি চালানোর জন্য ট্রিপারে চাপ দিতে পারেননি। এ সময় মোসলেম উদ্দীন পেছন থেকে মুজিবের উপর গুলি চালান। তার কৃতকর্মের শীকৃতি হিসেবে সাথে সাথেই মোস্তাক সরকার তাকে ক্যাল্টেন পদে পদোন্নতি দেয়। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংঘটিত ২/৩ নভেম্বরের পাঞ্জা অভ্যাসনের পর তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হলেও, পরবর্তীতে একটি বাংলাদেশী দৃতাবাসে তাকে ধার্ড সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর অপরাধের পূরুষাকার হিসেবে এটি যথেষ্ট ছিল না। তার মনে হয়েছিল তার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে এবং তিনি ক্ষুঁচ হয়েছিলেন। তিনি তার উন্নতির জন্য এরপর চেষ্টা করেছিলেন যে একটি মাত্র উপায় তার জান ছিল সে উপায়ে তিনি আরও একটি অভ্যাসনে অংশ নেন। এবার তার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল না।

তার বিরুদ্ধে ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর যে ব্যর্থ অভ্যাসন সংঘটিত হয় তাতে সম্পূর্ণ ধাকার অভিযোগ আনা হয় এবং ঢাকা সেনানিবাসে বিশেষ সেনা ট্রাইব্যুনালে তার বিচার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং তার্ফশীকৃ তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

বিশেষ সেনা ট্রাইব্যুনালের কাছে তার জবানবন্দীতে তিনি বলেন যেজর ডালিম তাকে মুজিব হত্যার চক্রান্তের অংশ করেন এবং ফারুক তাকে মুজিবকে হত্যা করতে প্রয়োচিত করেন। যেহেতু ঐ সময়ে তিনি মাতাল ছিলেন তাই তিনি মুজিব পরিবারের আরো চার সদস্যকে হত্যা করেন।

তিনি এতোটাই মাতাল ছিলেন যে ঐ মুহূর্তে কি করেছিলেন তা তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

মোসলেম উদ্দীন তার জবানবন্দীতে বলেন তার মৃত্যু মুজিব হত্যার শাস্তি হবে, এবং তার দেশবাসী তাকে সবসময়ই একজন শৃণ্য হত্যাকারী হিসেবে মনে রাখবে। কিন্তু এটা কোন অনুত্তাপ থেকে বলা হয়নি। তিনি একজন ভয়ঙ্কর ঝুনী ছিলেন, এবং ১৯৭৭-এর ২ অক্টোবরের অভ্যাসন ব্যর্থ না হলে তিনি অন্য কথা বলতেন।

ফারুক ইসলামের নামে ল্যাক্সারদের প্রয়োচিত করেছিলেন এবং মোসলেম উদ্দীন যখন ইসলামের নামে গুলি চালান তখন তিনি মাতাল ছিলেন।

মুজিবের বাড়িতে হত্যাকারী দলটিকে নেতৃত্ব দান করার পর বেশ কিছুদিন হস্ত বিকারযন্ত হয়ে ছিলেন। তাকে মনোচিকিৎসকের দারিদ্র হতে হয়েছিল এবং এখনো যখন তিনি ঐ দিনটি সম্পর্কে কথা বলেন তখন তাকে বিশেষ মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়। তিনি শপথ করে বলেন শেখ মুজিবকে হত্যার ব্যাপারে তিনি কোন কিছু জানতেন না। তার মতে তাদের পরিকল্পনা ছিল মুজিবকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা। কিন্তু তারপর কি হতো? এ বিষয়ে আজও তার কাছে কোন উত্তর নেই।

যোসলেম উদ্দীনের মত হৃদাও মনে করেন দেশের মানুষ তাকে একজন দৃঢ়া হত্যাকারী হিসেবে মনে রাখবে ! একজন দেশী বক্রুর সাথে অভ্যর্থনের তিন বছর পর আলাপকালে হৃদা শীকার করেন যে মুঞ্জিবের কারণেই দেশের মানুষের মনে জাতীয় গৌরবের অবস্থাটি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এটা তিনি কেন জন সমক্ষে বলতেন না ? হৃদার মতে কোন কিছু করেই তার পাপের প্রায়চিত্ত হবেনা এবং কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না এবং তাকে কথনোই ক্ষমা করা হবে না ।

হৃদার ভাষ্যমতে যখন তিনি মুঞ্জিবকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছিলেন তখন পেছন থেকে গুলির শব্দ তুলতে পান এবং মুঞ্জিব লুটিয়ে পড়েন। তিনি দাবি করেন তার সামরিক প্রশিক্ষণের কারণেই সেদিন তিনি গুলি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ডুলে যান যে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছিলেন। নিচয়ই মুঞ্জিবের ছেলেদের কেউ পেছন থেকে গুলি চালানলি, কারণ তাদের বাবার এতে আঘাতপ্রাণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কারণ মুঞ্জিব হৃদার চেয়ে বেশ অনেকটা লম্বা ছিলেন। তা ঠিক, এটা হৃদাও মানেন; কিন্তু আর প্রশ্নের মুখোযুক্তি না হতে চেয়ে হৃদা বারবার এটাই বলতে থাকেন, “আমি সেদিন মারা যেতে পারতাম, আমি সেদিন মারা যেতে পারতাম ।”

সেদিন মুঞ্জিবের বাড়িতে প্রহরায় থাকা একজন পুলিশ অফিসারের ভাষ্যমতে, হৃদা নিচে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, “আমি পারছি না, আমি পারছি না ।” এ সময় যোসলেম উদ্দীন ট্যারেস থেকে নেমে আসছিলেন এবং মুঞ্জিবের উপর গুলি চালান ।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ একজন পাক সৈনিক মুঞ্জিবের কাঁধে বন্দুকের মাঝল টেকিয়েছিলেন। তখন একজন পাকিস্তানি অফিসার “গুলি চালিওনা” বলে নির্দেশ দেন ।

যে বিষয়টির উপর হৃদা বার বার জোড় দিচ্ছিলেন তা হল তিনি তখনও সেনা বাহিনীর সদস্য ছিলেন। এটি প্রকৃত অর্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না ।

যে হৃদা শাহরিয়ারের সাথে সেরনিয়াবাতের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি সেনা বাহিনীর সদস্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের ভাই ।

নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই যোগাযোগ প্রতিযন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে ব্যাপক দুনীতির অভিযোগে অব্যহতি দেয়া হয়। পরদিন তাকে বাকশাল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় ।

১৫ আগস্টের রক্তাক্ত সকালে মঞ্জুর সশরীরে সেরনিয়াবাতের বাড়িতে উপস্থিত হন কত দক্ষতার সাথে হত্যাকারী দলটি তাদের কাজ করেতে এটা দেখতে। তিনি যখন জানতে পারেন সেরনিয়াবাতের পুত্র হাসনাত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন তখন দলটিকে অভিসম্পাত করেন ।

মোতাকের মঞ্জুর তিনি আবার যোগাযোগ মঞ্জু হিসেবে বহাল হন ।

হত্যাকাণ্ডের পর তান বলেন যে তার পার তাকে আগেই বলোছিলেন যে তার শক্তদের কর্মণ পরিণতি হবে।

দৈনিক ইতেফাকের সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি মইনুল হোসেনের এবং মুজিব সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমানের বাড়িতে বেশ কয়েকবার কয়েকজন ঘড়যন্ত্রকারী বৈঠক করেন।

ওবায়দুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সমাজ সেবা সচিবের পদ থেকে ১৯৭২ সালে আশ সামরী অপব্যবহার এবং অর্থের বিনিয়য়ে বিখ্যাসঘাতকদের আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে সরিয়ে দেয়া হয়। এরপরও ১৯৭৩ সালে প্রতিমন্ত্রীর পদ দেয়া হয়। অনেক আওয়ামী লীগ নেতা মনে করেন তাকে পুনর্বাসন করাটা একটা ভুল ছিল, কিন্তু কেউই এটা বলতে পারেননি কিন্তু তার অভিযোগে দলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার এক বছরের মধ্যে তাকে রাজনীতিতে পুনর্বহাল করা হয়েছিল।

১৯৭৪ সালে ওবায়দুর রহমান তার তত্ত্বাবধানীদের বলেছিলেন যে তাকে খুব শীঘ্ৰই পূর্ণ মন্ত্রী করা হবে। যখন আশা অনুসারে তার পদোন্নতি হয়নি তখন তিনি স্ফুর্ক হয়েছিলেন।

তাহের উদীন ঠাকুরও আশা করেছিলেন তাকে প্রতিমন্ত্রী থেকে পূর্ণ মন্ত্রী করা হবে। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের মনোয়নে নির্বাচনের সুযোগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি দৈনিক ইতেফাকের প্রধান প্রতিবেদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে মুজিব তাকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। যদিও তথ্য মন্ত্রণালয়ে মুজিবের আওতায় ছিল, তারপরও প্রকৃত পক্ষে ঠাকুরই এ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা কমিয়ে আনার উদ্যোগটি তিনিই নির্যাপ্ত করেছিলেন। এমনকি যে সাংবাদিকরা তার তথ্য প্রতিমন্ত্রী হওয়াকে শাগত আনিয়েছিলেন তারাও তার বিপক্ষে চলে যান এ উদ্যোগের কারণে।

সবার ধারণা ছিল ঠাকুর মুজিবের খুব কাছের লোক ছিলেন। যখন মুজিব লাহোরে ইসলামিক সংঘেলনে যোগ দিতে যান তখন সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রী কামাল হোসেন এবং ঠাকুরকে সাথে নিয়ে যান। কিন্তু মুজিব তার বকুলদের বলেছিলেন ঠাকুর তার নিজের সম্পর্কে মিথ্যা উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। যখন ১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করেন তখন তিনি কুরবান আলী নামে একজন পুরোনো আওয়ামী লীগ নেতাকে তথ্য মন্ত্রীর পদে বহাল করেন। পদোন্নতির আশায় থাকা ঠাকুর আবিক্ষার করেন যে তার তরুণত কয়ে গেছে। এবং এতে তিনি স্ফুর্ক হন। তার এক বন্ধু একজোটাই হতাশ হন যে তিনি মন্ত্র্য করেন, “২৫ জানুয়ারি যে বিপ্লব শুরু হয় তা ২৬ জানুয়ারিতেই শেষ হয়ে যায়।”

যাই হোক না কেন, এটা ভাবলে ভুল হবে যে ওবায়দুর রহমান ও তাহের উদীন ঠাকুর তাদের আশা অনুসারে পদোন্নতি পান নি বলেই মুজিবের বিপক্ষে চলে

গিয়েছিলেন। ২৬ আনুয়ারি ১৯৭৫-এ মঙ্গাসভার রদবদলের বেশ কয়েক মাস আগে খেকেই তারা মুজিব হত্যার চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

স্বাধীনতার আগে মোহাম্মদুল্লাহ আওয়ামী লীগের দণ্ডের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব প্রদণ করেন। স্পিকার আবুল হামিদের মৃত্যুর পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। আবু সাইয়েদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিলে ১৯৭৪ সালের ২৪ আনুয়ারি মুজিব মোহাম্মদুল্লাহকে রাষ্ট্রপতি করেন। এটা মোহাম্মদুল্লাহর জন্য অপ্রেরও বেশি ছিল।

যেদিন মোহাম্মদুল্লাহ রাষ্ট্রপতি হন সেদিন তিনি বলেন, “আমি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সত্ত্ব করতে চাই। আমি বাংলাদেশের সব মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাই।”

মোহাম্মদুল্লাহ এক বছর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। যখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে ক্লাপাত্তিরিত হয় তখন তাকে মুজিবের রাষ্ট্রপতি শাসিত মঙ্গাসভার একজন মন্ত্রী করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন এমন একজন ব্যক্তির জন্য এই অবনতি ছিল বড় রকমের।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মোতাক মোহাম্মদুল্লাহকে উপ-রাষ্ট্রপতি করেন। আবু সাইয়েদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি পদে অবস্থি বোধ করছিলেন এবং তিনি পদ ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সে পদেই বহাল ছিলেন। ন্যূনতম জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদন করতে তিনি সময় নিয়েছিলেন, এবং তার নিজের মালিকানায় যে অতিরিক্ত জমি ছিল তা বিক্রি করার পরই তিনি ঐ বিল অনুমোদন করেছিলেন।

বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাকে একজন রাষ্ট্রদৃত করা হয় যা একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির জন্য যান্নানসই। ১৫ আগস্টের মাত্র এক সপ্তাহ আগে তাকে মুজিব সরকারের মঙ্গাসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যখন সরকার সিঙ্কান্ডেনেয় যে, যে সমস্ত সংসদ সদস্য বাকশালে যোগদান করবেন না তারা তাদের সদস্য পদ হারাবেন, তখন জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম. এ. জি. ওসমানী এবং মইনুল হোসেন তাদের সংসদ সদস্য পদ ত্যাগ করেন। একজন চিকিৎসক যিনি নিজে খুব ভড়িঘাড়ি করে পার্টি গঠনে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি বলেন, “যখনই ওসমানী পছন্দ করেন না এমন কোন সিঙ্কান্ডেনেয় হয় তখনই তিনি দলের পদ বা প্রশাসনিক পদ থেকে সরে দাঢ়ান। কিন্তু মইনুল হোসেন তার গণতান্ত্রিক মতাদর্শের জায়গা থেকে সংসদ সদস্য পদ ছাড়েন নি, বরং তিনি তার প্রভুদের নির্দেশেই কাজ করেছেন।”

মোতাকের মঙ্গাসভায় একমাত্র নতুন মন্ত্রী ছিলেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, যার নাম মুজিব হত্যার চক্রান্তের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যদিও এক সময় তাকে মুজিবের কাছের লোক মনে করা হত, তারপরও আওয়ামী লীগের

সংসদীয় দলের চিক হইপ হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোন মন্ত্রীর পদ কখনো দেয়া হয়নি।

মোন্টাক শাহ মোয়াজ্জেমকে তার মন্ত্রীসভায় একজন প্রতিমন্ত্রী করেছিলেন।

ঘটনাক্রমে শাহ মোয়াজ্জেমই প্রথম আওয়ামী লীগ নেতা যিনি মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশ সফর করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১৮ অক্টোবর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত তার সে সফর সফল ছিল।

মোন্টাকের মতোই শাহ মোয়াজ্জেমও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নীতি থেকে ডান পক্ষার দিকে বেশি ঝুকে ছিলেন। যখন মোন্টাক আওয়ামী লীগ নেতাদের মন জয় করার আশা ছেড়ে গণতন্ত্রী লীগ গঠন করেন তখন শাহ মোয়াজ্জেম তার সাথে ছিলেন। এ দলের আরেকজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মইনুল হোসেন। তারা সব সময় একই রাজনৈতিক দলে ছিলেন।

কি কারণে ভারতীয় কৃটনীতিক ভেবেছিলেন যে মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে, এমন কি রেডিওতে মৃত্যু সংবাদটি শোনার আগেই? যখন এই কৃটনীতিককে এই প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি জবাব দেন, “তখন যুব একটা উত্তেজনাকর অবস্থা ছিল, সাধারণ্যে এমন একটা অনুভূতি কাজ করছিল যে ডায়ার কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।” অল্প একটু ধোমে তিনি যোগ করেন, “বাংলা বর্ষপঞ্জি বাংলাদেশের নেতার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।”

হয়তো জোতির শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে এই কৃটনীতিক বিশ্বাস করেছিলেন মুজিব নিঃহত হতে যাচ্ছেন।

হাসিনাও এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানতেন। কে হতে পারে এই নেতা? তিনি মাওলানা ভাসানীর কথা ভেবেছিলেন যার বয়স তখন ছিল আশির কোটায়। মুজিব বলেছিলেন “তোমার বাবাও তো হতে পারে।” যুব দৃঢ়াবিত হয়ে হাসিনা বলেছিলেন “তোমার এমন কথা মুখে আনা উচিত নয়।” মুজিব ভালোবেসে হেসেছিলেন।

হাসিনার দুষ্টিক অমৃতক ছিল না। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেঁশে সেনা আইন চালু হওয়ার পর থেকে অনেকবারই তিনি তার বাবার মুখে শুনেছিলেন যে পাক সেনা বাহিনী তাকে হত্যা করতে পারে। মুজিব হাসিনাকে তার দেহের জন্মচিহ্ন ও অন্যান্য চিহ্ন তলো চিনে রাখতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “ওরা আমাকে খুন করতে পারে। কিন্তু হয়তো ওরা আমার দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে তোমাদের আমার দেহ খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু পচনের কারণে আমার মৃতদেহের অবস্থা এমন হতে পারে যে শুধু দেখে তোমরা আমাকে চিনতে পারবে না। তখন এই চিহ্নগুলো দেখে তোমরা আমার লাশ সন্তুষ্ট করতে পারবে।”

বাকশাল নেতাদের কাছে এমন অনেক বেনামী চিঠি আসছিল যেগুলোতে সামনে সরকার উৎখাতের উদ্যোগের কথা বলে সতর্ক করা হচ্ছিল, কিন্তু তারা এসব চিঠি আমলে নেননি। একজন সংসদ সদস্য মোতাকের বাড়িতে ঘটতে থাকা বিভিন্ন কার্যকলাপে সন্দিগ্ধ হয়ে তা শেখ মণিকে জানান। কিন্তু তাতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

আলেন্দেকে যখন ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর হত্যা করা হয় তখন জিল্লার রহমান, শেখ মণি এবং আলতাফ হসেইনকে নিয়ে গঠিত তিনি সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল হ্যানয় যাওয়ার পথে রেঙ্গুনে অবহান করছিল। তখন শেখ মণির প্রতিক্রিয়া ছিল, “এমন কোন অপচেষ্টা বাংলাদেশেও কেউ করতে পারে, এদিকে আমাদের কাছ থেকে আমাদের অন্তর্গুলো ফেরত নেয়া হয়েছে।”

এই প্রতিনিধি দলটি ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে। আলতাফ হোসেন মুজিবের একজন পুরোনো বন্ধু ছিলেন, তিনি মুজিবকে বলেন, “তুমি যদি সতর্ক না হও তাহলে তোমার পরিণতি ও আলেন্দের মত হতে পারে।” মুজিব এমনভাবে হেসেছিলেন যেন তিনি কোন কৌতুক তন্ত্রে, তিনি জবাব দেন; “বাংলাদেশ চিলি নয়, আমি এদেশের মানুষকে চিনি।

ফিদেল কাস্ট্রো মুজিবকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, “আপনি যদি আপনার শক্তিদের কঠোর হাতে দমন না করেন, তাহলে ওরাই আপনাকে সরিয়ে দিবে।” মুজিব কাস্ট্রো তাকে যা বলেছিলেন তা পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোন কিছুই করেননি।

ইন্দিরা গান্ধী কাস্ট্রোর চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন। তিনি মুজিবকে একাধিকবার সতর্ক করে বলেছিলেন যে তার বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত চলছে।

কিন্তু মুজিব এই সতর্ক বার্তা গুরুত্বের সাথে নেন নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায়ই মুজিব বলতেন যে, “একটি বুলেট আমাকে তাড়া করে ফিরছে।” কিন্তু তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন না। একজন মানুষ যদি মৃত্যুভয়ে ভীত থাকে তাহলে তার আত্মর্থাদা কোথায় থাকে?

মুজিবকে তার দেশের মানুষের সাথে খোলামেলাই মিশতে হত।

“আমার জনগণ আমাকে ভালোবাসে” এ কথাটি মুজিব বহুবার এমনভাবে বলতেন যেন এটি এমন এক মন্ত্র যা তাকে যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

সংসদীয় দলের চিক হইপ হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোন মন্ত্রীর পদ করবলো দেয়া হয়নি।

মোন্তাক শাহ মোয়াজ্জেমকে তার মন্ত্রীসভায় একজন প্রতিষ্ঠানী করেছিলেন।

ঘটনাক্রমে শাহ মোয়াজ্জেমই প্রথম আওয়ামী লীগ নেতা যিনি মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশ সফর করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১৮ অক্টোবর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত তার সে সফর সফল ছিল।

মোন্তাকের মতোই শাহ মোয়াজ্জেমও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নীতি থেকে ডান পন্থার দিকে বেশি ঝুকে ছিলেন। যখন মোন্তাক আওয়ামী লীগ নেতাদের মন জয় করার আশা ছেড়ে গণতন্ত্রী লীগ গঠন করেন তখন শাহ মোয়াজ্জেম তার সাথে ছিলেন। এ দলের আরেকজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মইনুল হোসেন। তারা সব সময় একই রাজনৈতিক দলে ছিলেন।

কি কারণে ভারতীয় কৃটনীতিক ভেবেছিলেন যে মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে, এমন কি রেডিওতে মৃত্যু সংবাদটি শোনার আগেই? যখন এই কৃটনীতিককে এই প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি জবাব দেন, “তখন খুব একটা উত্তেজনাকর অবহৃত ছিল, সাধারণে এমন একটা অনুভূতি কাজ করছিল যে ড্যাক্টর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।” অন্ন একটু ধেরে তিনি যোগ করেন, “বাংলা বর্ষপঞ্জি বাংলাদেশের নেতার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।”

হয়তো জোতিৰ শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে এই কৃটনীতিক বিশ্বাস করেছিলেন মুজিব নিঃহত হতে যাচ্ছেন।

হাসিনাও এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানতেন। কে হতে পারে এই নেতা? তিনি মাওলানা ভাসানীর কথা ভেবেছিলেন যার বয়স তখন ছিল আশির কোটায়। মুজিব বলেছিলেন “তোমার বাবাও তো হতে পারে।” খুব দৃঢ়াবিত হয়ে হাসিনা বলেছিলেন “তোমার এমন কথা মুখে আনা উচিত নয়।” মুজিব ভালোবেসে হেসেছিলেন।

হাসিনার দুষ্টিক অভ্যন্তর ছিল না। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সেনা আইন চালু হওয়ার পর থেকে অনেকবারই তিনি তার বাবার মুখে শনেছিলেন যে পাক সেনা বাহিনী তাকে হত্যা করতে পারে। মুজিব হাসিনাকে তার দেহের জন্মাচ্ছ ও অন্যান্য চিহ্ন তলো চিনে রাখতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “ওরা আমাকে খুন করতে পারে। কিন্তু হয়তো ওরা আমার দেহ খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু পচনের কারণে আমার মৃতদেহের অবহৃত এমন হতে পারে যে শুধু দেখে তোমরা আমাকে চিনতে পারবে না। তখন এই চিহ্নগুলো দেখে তোমরা আমার লাশ সন্তুষ্ট করতে পারবে।”

বাকশাল নেতাদের কাছে এমন অনেক বেনামী চিঠি আসছিল যেগুলোতে সামনে সরকার উৎখাতের উদ্যোগের কথা বলে সতর্ক করা হচ্ছিল, কিন্তু তারা এসব চিঠি আমলে নেননি। একজন সংসদ সদস্য মোন্টাকের বাড়িতে ঘটতে থাকা বিভিন্ন কার্যকলাপে সন্দিগ্ধ হয়ে তা শেখ মণিকে জানান। কিন্তু তাতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

আলেন্দেকে যখন ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর হত্যা করা হয় তখন জিল্লার রহমান, শেখ মণি এবং আলতাফ হসেইনকে নিয়ে গঠিত তিনি সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল হ্যানয় যাওয়ার পথে রেসুনে অবস্থান করছিল। তখন শেখ মণির প্রতিক্রিয়া ছিল, “এমন কোন অপচেষ্টা বাংলাদেশেও কেউ করতে পারে, এদিকে আমাদের কাছ থেকে আমাদের অঙ্গগুলো ফেরত নেয়া হয়েছে।”

এই প্রতিনিধি দলটি চাকায় ফিরে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে। আলতাফ হোসেন মুজিবের একজন পুরোনো বন্ধু ছিলেন, তিনি মুজিবকে বলেন, “তুমি যদি সতর্ক না হও তাহলে তোমার পরিণতিও আলেন্দের মত হতে পারে।” মুজিব এমনভাবে হেসেছিলেন যেন তিনি কোন কৌতুক তনছেন, তিনি জবাব দেন; “বাংলাদেশ চিলি নয়, আমি এদেশের মানুষকে চিনি।

ফিদেল কাস্ত্রো মুজিবকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, “আপনি যদি আপনার শক্তদের কঠোর হাতে দয়ন না করেন, তাহলে ওরাই আপনাকে সরিয়ে দিবে।” মুজিব কাস্ত্রো তাকে যা বলেছিলেন তা পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোন কিছুই করেননি।

ইন্দিরা গান্ধী কাস্ত্রোর চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন। তিনি মুজিবকে একাধিকবার সতর্ক করে বলেছিলেন যে তার বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত চলছে।

কিন্তু মুজিব এই সতর্ক বার্তা গুরুত্বের সাথে নেন নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায়ই মুজিব বলতেন যে, “একটি বুলেট আমাকে তাড়া করে ফিরছে।” কিন্তু তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন না। একজন মানুষ যদি মৃত্যুভয়ে ভীত থাকে তাহলে তার আত্মর্যাদা কোথায় থাকে?

মুজিবকে তার দেশের মানুষের সাথে খোলামেলাই মিশতে হত।

“আমার জনগণ আমাকে ভালোবাসে” এ কথাটি মুজিব বহুবার এমনভাবে বলতেন যেন এটি এমন এক মন্ত্র যা তাকে যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

একটি পারিবারিক বিষয়

ফার্মক হেমলেট হিসেবে জন্ম নেন নি যার কাজ ছিল 'সব কিছু ঠিক করে দেয়া'। তিনি ছিলেন খুব ঠাণ্ডা মাথার আর ভীষণ হিসেবী লোক। তার কিছু কিছু উৎর্ভূতন কর্মকর্তা মনে করেন তার বৃদ্ধিমত্তা ছিল উচ্চ পর্যায়ের। হিটলারের বৃদ্ধিমত্তাও উচ্চ পর্যায়ের ছিল বলে জানা যায়।

ফার্মক দাবি করেন তার কোন বাস্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তিনি রশিদের পরামর্শ মত মোতাককে রাষ্ট্রপতি করতে রাজি হয়েছিলেন। নিচয়ই তিনি অন্য কাউকে মতায় বসাতে মুজিব হত্যার চক্রান্তে অংশ নেন নি। তিনি নিজেই আসলে রাষ্ট্রপতি হতে চেয়েছিলেন।

একজন আত্মীয় আদর করে ছেপেবেলায় তাকে 'ভোমরা' বলেছিলেন। এ নামটি তাকে বেশ মানিয়ে যায় এবং এ নামটি তার সঙ্গে বড় হওয়ার পরও থেকে যায়।

তার বক্তব্যগুলোতে 'আমি' শব্দটি বেশি বেশি শোনা যায়: 'আমি অভ্যাসানের পরিকল্পনাটি সাজিয়ে ছিলাম...' 'আমি মুজিবকে হত্যার হৃত্য দিয়েছিলাম...' 'আমি মুজিবের মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছিলাম...'। রশিদ তুলনামূলকভাবে কম অহকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের কথা বেশি করে বলতে অভ্যন্ত ছিলেন। ফার্মক বা রশিদের কেউই কখনও 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করতেন না, যদিও তারা দুজনে মিলেই চক্রান্ত করেছিলেন। ডালিম বেশ অহকারের সাথেই নিজের নাম ঘোষণা করেছেন যখন তিনি রেডিওতে মুজিব সরকারকে উৎখাত করার ঘোষণা পাঠ করেন। রশিদ হৃদাকে যিনি মুজিবকে গুলি করতে ব্যর্থ হন তাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। হৃদা রশিদের ট্যাকে বসে মুজিব হত্যার নির্দেশ দেয়ার দাবি নিয়ে কৌতুক করতেন। অভ্যাসানের এক সন্তানের মধ্যে তাদের যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল তার ফল স্বরূপ আগে বা পরে সংঘর্ষ দেখা দিতই।

১৯৭৪ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে ফার্মক এবং রশিদ মুজিবকে হত্যার চক্রান্ত শুরু করেন। তারা একে অপরের ভায়রা ভাই ছিলেন এবং ঢাকা সেনানিবাসে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন। একে অপরের সাথে দেখা করার অনেক সুযোগ তারা পেয়েছিলেন এবং এক বছর সময় নিয়ে অনেক যত্নের সাথে তারা মুজিব হত্যার চক্রান্ত সাজিয়েছিলেন।

তাদের এই মারাত্মক ঘড়িয়ে বাস্তবায়নের ব্যাপারে ফার্মক এবং রশিদ দুজনেই বন্ধ পরিকর ছিলেন। তারা প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ ছিলেন যারা মতা দখল করার কথা ভাবতেন, কিন্তু তারা এও জানতেন তাদের কর্তৃত অবশ্যই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। সামনে রাখার জন্য তাদের একজন কাউকে দরকার ছিল। রশিদ মুজিব সরকারের ব্যবসা ও বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী মোতাকের নাম প্রস্তাব করেন। মোতাক যে তার চাচা হন এ বিষয়টি তিনি সামনে আনেননি।

ফারুক তার ভায়রা ভাইয়ের এ প্রস্তাৱ মেনে মোত্তাককে তাদেৱ সামনে রাখাৱ মত
লোক হিসেবে মেনে নেন।

এটা ছিল একটি পারিবারিক বিষয়।

তারুণ্যেৰ দষ্ট নিয়ে রশিদ দাবি কৱে থাকেন তিনি মোত্তাককে মুজিব হত্যার
চক্রাতে যুক্ত কৱেন অভ্যুত্থান সংঘটিত হবাৱ বড় জোড় দুই সঙ্গাহ আগে। কে
কাকে যুক্ত কৱেছিল?

মোত্তাক সব সময়ই মুজিবকে তাৱ পথ ধেকে সৱাতে চাইতেন, কিন্তু নিজে কিছু
কৱাৱ মত সাহস তাৱ কখনোই ছিল না। যাই হোক, তাৱ সাহসেৰ অভাব তিনি
কৌশল দিয়ে পূৰণ কৱতেন। ফারুক এবং রশিদ বৃক্ষিমান হলেও মোত্তাকেৰ
চতুরতাৱ সামনে তাৱা প্ৰায় কিছুই না, মোত্তাক ছিলেন একজন আজন্ম কৌশলী
ধূৰ্ত ব্যক্তি।

ষড়যন্ত্ৰকাৰীদেৱ মধ্যে কেউ কেউ জেষ্ট্য সেনা কৰ্মকৰ্ত্তাদেৱ দিয়ে অভ্যুত্থান ঘটাতে
চাইলেও মোত্তাক এটা বিশ্বাস কৱতেন না যে জেষ্ট্য সেনা কৰ্মকৰ্ত্তাদেৱ কেউ
চালেৱ গুটি হিসেবে কাজ কৱতে গাজি হবেন। যদি অভ্যুত্থান সফল হয় তখন এই
কৰ্মকৰ্ত্তাৱ তাকে সরিয়ে দিতে পাৱেন। তাৱ চেয়ে রশিদ এবং ফারুককে দিয়ে
কাজ কৱানো সহজতৰ হবে। যখন তিনি রশিদেৱ মাথায় সব চক্রাত চুকাছিলেন
পাশাপাশি তিনি তাকে এটা বিশ্বাস কৱাতে সম হয়েছিলেন যে তিনি তাদেৱ
নিজেৰ লোক মনে কৱেন।

যেহেতু ডালিম রেডিওতে অহকাৱেৰ সাথে নিজেৰ নাম ঘোষণা কৱেছিলেন তাই
দেশেৰ বাইৱেৰ অনেকে মনে কৱেছিলেন হয়তো ডালিমই এই অভ্যুত্থান
ঘটিয়েছেন।

কোলকাতাৱ সাংবাদিকদেৱ মধ্যে যাৱা মুক্তিযুক্তেৰ ব্বৰ পৱিবেশন কৱেছিলেন
এবং পৱিবত্তীতে ঢাকা প্ৰতিনিধি হিসেবে কাজ কৱেছেন তাৱা এ ভুল কৱেন নি।
এৱপৰও ১৫ আগস্টেৱ রক্তপাতেৱ ঘটনাৱ এক মাস পৱও কোলকাতাৱ
সাংবাদিকদেৱ কেউ কেউ এমন গল্প চালাতে লাগলেন যাতে অভ্যুত্থানটিকে মান-
সম্মানেৱ সাথে জড়িত বলে মনে হতে পাৱে। হয় তাৱা ভয়াবহ অজ্ঞ, নয়তো
তাৱা বিকৃত রকম অসৎ। কিন্তু যেহেতু তাদেৱ জ্ঞানী মনে কৱা হত তাই তাদেৱ
বলা ভুল গল্পগলো অনেকেই বিশ্বাস কৱতে লাগলো।

যখন মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস কৱা হয় তখন অনেক বড় তি হয়ে যায়। ১৯৭৫
সালে যেসব গল্প অনেক সাংবাদিক ছড়াতে থাকেন তাৱ ফলে মানুষেৱ মনে দিধা
তৈৱি হয় এবং তাদেৱ বিচাৰ-বৃক্ষি ধোয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হয়তো এ উদ্দেশ্যেই
এসব গল্প তৈৱি কৱা হয়েছিল।

কোলকাতার সানডে পত্রিকায় ১৯৭৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম পাতায় একটি ফটোয়াক ছাপা হয় যাতে দেখা যায় ডালিম তার 'অপূর্ব সুন্দরী' স্ত্রী তাসমিনকে নিয়ে বাড়ির লনে পায়চারী করছেন। তার চেহারা এমন ছিল না যা দেখে সহস্র জাহাজ যুদ্ধযাত্রা করবে, লেখক লিখেছেন, কিন্তু ডালিম সবাইকে এটা বিখাস করাতে চেয়েছিলেন যে তার মুখের দিকে চেয়েই ১৫ আগস্ট তোরের অভ্যাসনের সময় ট্যাঙ্কগুলো চলতে শুরু করেছিল। তাসমিনকে তার বিবাহ পরবর্তী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবের 'সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বস্তু' গাজী গোলাম মোস্তফার পুত্রী অপমান করে। বিচারের প্রত্যাশায় ডালিম ও তার স্ত্রী তাদের কিছু বহুদের পাহারায় শেখ মুজিবের বাড়িতে যান। সেখানে গাজী আর তার পুত্রী আশুয়া নিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই তারা গাজীর বাড়িতে ধ্বন্স লীলা চালিয়েছিলেন। মুজিব তাদের এই দুর্বৃত্ত সূলত আচরণের কারণে বিচার করতে রাজি হননি। এবং মেজর ডালিম প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। এই প্রতিজ্ঞাটি দৃঢ়ভাবে পালিত হয়েছিল।

ডালিমের প্রতি লেখকের শুল্ক এখানে স্পষ্টভাবে ফুঁটে উঠেছে।

নিচয়ই ডালিম ও তার নবপরিণিতা স্ত্রী তাদের বিয়ের বাতেই মুজিবের বাড়িতে যান নি।

ডালিম আর তাসমিনের বিয়ে হয় ১৯৭১ সালে। মুক্তি বাহিনীর সাথে যুক্তে অংশ নেয়ার সময় ডালিম আহত হন। এতে করে তিনি যুক্তের বাইরে থাকলেও তার সময়ে কোলকাতায় কর্মরত বাঙালী কূটনীতিকের কন্যা তাসমিনকে মুক্ত করে তার হন্দয় জিতে নেওয়ার সময় পেয়েছিলেন।

সানডে পত্রিকায় যে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা ঘটেছিল ডালিমের বোনের বিয়েতে। গাজী গোলাম মোস্তফার একজন পুরু খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। বোনকে অপমান করার অপরাধে ডালিম সেই পুত্রকে পাশ্বড় দেন।

গাজী ডালিমকে মুজিবের বাড়িতে নিয়ে পিয়েছিলেন। তাসমীন তার স্বামীর সঙ্গে ছিলেন মাত্র।

মুজিব সব সময়ই শান্তিকামী ছিলেন, তিনি গাজী এবং ডালিমকে একে অপরের সাথে হাত মেলাতে বলেন এবং তাদের মধ্যকার দুর্দশ সমাধান হওয়ায় সবার মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন। ততক্ষণে মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে।

কিন্তু এখানেই ঘটনা শেষ হয়নি।

কিছু সেনা কর্মকর্তা নয়া পল্টনে গাজীর বাড়িতে হামলা করে ভাঙ্চুর চালান এবং হমকি দেন যে ডালিমের কিছু হলে শহরে সংঘর্ষ বেঁধে যাবে। অনেকে বলেন ডালিম নিজে ট্রাকে করে ভাঙ্চুর চালানের জন্য সৈনিকদের নিয়ে আসেন। কিন্তু তার বহুদের কৃতকর্মের কোন দায়িত্ব নিতে ডালিম নারাজ ছিলেন। তিনি বলেন,

“আমাকে তো গাজী ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কিভাবে এসব ভাঙ্গুর করবো।”

সেনা সদর দপ্তর গাজী বাড়িতে এই ভাঙ্গুরের ঘটনা তদন্ত করে এবং এ ঘটনার সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করার নির্দেশ দেয়। তখন সেনা বাহিনীতে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। যে সেনা কর্মকর্তারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাদের কোন শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ ছিল না।

কিছু ভাকাঞ্জী মুজিবকে সেনা কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু সেবারের মত মুজিব তার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি বলেন “এটা সেনা সদরের সিদ্ধান্ত”।

ডালিম, তার স্ত্রী তাসমিন এবং তার শ্বাতুড়ি হেনা ডালিম পদচ্যুত হওয়ার পরও মুজিবের বাড়িতে নিয়মিত বেড়াতে যেতেন।

তাসমিনের মা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার পড়ালেখা শুরু করেছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন করছিলেন। ছাত্র শিক্ষক সবাই তাকে হেনা ভাবি ডাকতেন। তিনি বেগম মুজিব এবং হাসিনা দুজনেরই বকু ছিলেন, তিনি শেষ মুজিবের বাড়িতে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন।

ডালিম তার মায়ের খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি স্কুলে থাকতেই তার মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে পড়েন এবং তার বাবা আরেকজন কম বয়স্ক নারীকে নিজের হিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে তিনি তার বাবার কাছ থেকেও কিছু সহয়ের জন্য দূরে সরে যান।

ডালিম বেগম মুজিবকে বলতেন, “আমি ছেলেবেলায় আমার মাকে হারিয়েছি। এখন আপনি আমার মা।” বাঙালী সংস্কৃতি অনুসারে বিশেষ উৎসবের সময় তিনি বেগম মুজিবের পা হুঁয়ে তার প্রতি তার ভালোবাসা জ্ঞাপন করতেন।

তিনি তার ব্যক্তিগত সমস্যাও বেগম মুজিবের কাছে জানাতেন। তার একটি প্রধান দুষ্ক্ষিণ্য ছিল যে তার কোন সন্তান ছিল না। বেগম মুজিব তাকে আশ্চর্ষ করে বলতেন, “তোমার মাত্র দু'তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে। নিচ্যাই তোমার সন্তান হবে।” এরপরও যখন ডালিম আশ্চর্ষ হচ্ছিলেন না তখন বেগম মুজিব একজন চিকিৎসকের নাম তাকে বলেন যার সাথে ডালিম ও তার স্ত্রী আলাপ করতে পারেন।

আপাতদৃষ্টিতে ডালিম বেগম মুজিবের অক্ষ ভক্ত ছিলেন।

সেনাবাহিনী থেকে পদচ্যুত হওয়ার পর যখন ডালিম ব্যবসা শুরু করেন তখন মুজিব তাকে সাহায্য করেছিলেন। মুজিব এবং ডালিম প্রায়ই ভাগভাগি করে খিচুড়ি খেতেন যা তাদের দুজনেরই খুব পছন্দের খাবার ছিলো। কিন্তু পুরোটা সময়ই ডালিমের মনের মধ্যে এই ক্ষেত্রে ছিল যে তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে।

একদিন রেহানা যে খুব স্পষ্টভাবী ছিলেন, ডালিমকে বলেন, “আপনি যখন আমার বাবা সম্পর্কে অনেক বাজে কথা বলে বেড়ান, তখন আপনি আমাদের বাড়িতে কেন আসেন?” হেনাও তার মেয়ের জামাইকে তি঱ক্ষার করে বলেন, “তোমার যত্ন তত্ত্ব কাওজ্ঞানহীনের মত কথা বলা উচিত নয়।”

ডালিম জবাবে রেহানাকে বলেছিলেন, “সময় এলেই দেখতে পাবে কে তোমাদের প্রকৃত বন্ধু।”

কিছুদিন ডালিম মুজিবের বাড়ি থেকে দূরে দূরে ছিলেন।

ডালিম যখন বিবাহ পরবর্তী সংবর্ধনার রাতেই প্রতিশোধের শপথ নিয়েছিলেন তখন তিনি কেন গাজী গোলাম মোস্তফাকে ছেড়ে দিলেন? “তাকে হত্যা করে আবি আমার হাত নোংরা করতে চাইনি” ডালিম তার বন্ধুদের বলেছিলেন।

গাজী গোলাম মোস্তফা একজন অজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং ঐ সময়ে ডালিমের কোন ক্ষতি করার চেয়ে তিনি বরং নিজের প্রাণ বাঁচানো নিয়েই বেশ ব্যক্ত ছিলেন। ডালিমের হাতে তখন অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল।

ডালিমকে খুব ভালোভাবে চেনেন এমন একজন বলেন ডালিম শেখ মুজিবের মধ্যে নিজের বাবাকে খুজে পেয়েছিলেন যাকে এক সময় তিনি হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ডালিমের মধ্যে একটি ধর্মসাম্রাজ্য প্রবণতা আছে এবং মাঝে মাঝে তিনি এমন আচরণ করেন যে মনে হয় তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। একবার একটি মেয়ে ডালিমের একজন বন্ধুকে কষ্ট দেয়ায় ডালিম ঐ মেয়েটির হোস্টেলে গিয়ে শুধু মেয়েটিকেই নয় সাথে সাথে তার বন্ধুদেরকেও হত্যার হ্যাকি দেন।

সত্য কথা হল মুজিব হত্যা একটি আন্তর্জাতিক চৰকৃত যা খুব সাবধানে সাজানো হয়েছে এবং এটি কোন মান সম্মানজনিত লড়াইয়ের ফল নয় বা কোন মনন্ত্বাত্মিক নাটকও নয়।

মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার কয়েকদিন পর্যন্ত তাসমিন পাগলের মত আচরণ করতে থাকেন। সবাই মেজরদের সামনে সতর্ক থাকতেন কারণ তারা হত্যা করার মন মানসিকতায় ছিলেন। কিন্তু তাসমিনের মনে কোন ডয় ছিল না। তিনি মেজরদের দেখলেই তাদের মুখে ধূতু মারতেন।

তখন ব্যাপক হারে চোরাচালানী চলছিল এবং অনেক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এর সাথে জড়িত ছিলেন। চোরাচালান বক্ষে সরকারী উদ্যোগগুলো ফলপ্রসূ ছিল না। ১৯৭৪ সালে যৌথ চোরাচালানরোধী অভিযানে অংশ নেয়ার জন্য সেনা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দুর্যোগ। সরকার এমন একটা ধারণা জন্ম দিল যে বেসামরিক প্রশাসন যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে সামরিক কর্তৃপক্ষ সফল হতে পারে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছর পর ১৯৭৩ সালের শেষ দিক থেকেই সেনা কর্মকর্তারা তাদের বল প্রয়োগ শুরু করেন।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনে সারাদেশে আওয়ামী লীগ শতকরা ৭২ ভাগ ভোট পায়। ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় ভোটের তিনি ছিল এর প্রায় বিপরীত।

১৯৫৭ সালে ‘অপারেশন ক্লোজড ডের’ নামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায় তা ছিল ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সেনা শাসন কায়েমের পূর্ব প্রস্তুতি।

১৯৭৪ সালে সেনাবাহিনীকে চোরাচালান বিরোধী অভিযানে অংশ করে মুজিব সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি আরও গ্রহণযোগ্য করেছিলেন এবং সেনা কর্মকর্তাদের মতাবুদ্ধি পেতে দিয়েছিলেন। পুরো বিশ বছর সেনা শাসনের বিরক্তে যুক্ত করে আসা শেখ মুজিব এই ভূলটি কিভাবে করলেন।

দুই একজন সম্মানিত ব্যক্তিকূমী ব্যক্তিত্ব ছাড়া অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তা আর জাওয়ানই সৎ ছিলেন না বলে বদনাম ছিল। কিছু সেনা কর্মকর্তা এবং সৈনিক দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রপরই দ্রুত আত্মসাত, গাড়ি ছিনতাই এবং এমনকি নারী অপহরণের মত অপরাধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মেজরদের মধ্যে একজন এক তরুণ মুক্তিযোক্তা গাড়ি জোড় করে নিয়ে নেন। ঐ তরুণ প্রতিবাদ করলে মেজর প্রেরণের সাথে বলেন, “আমার এই গাড়িটি পছন্দ হয়েছে। পুরুষ মানুষের মতো আচরণ কর। আরেকটি গাড়ি কিনে নাও।”

সেনাবাহিনী সদস্যরা চোরাচালান বিরোধী অভিযানে অংশ নিয়ে জনমনে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি করে, বিশেষ করে কুমিল্লা জেলায়। তারা কিছু বিখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতার নামে অভিযোগ আনে। মোতাক নিজে কুমিল্লার লোক ছিলেন এবং তিনি ঢিত্তায় পড়ে যান। আওয়ামী লীগে যারা সেনা বাহিনীকে যৌথ অভিযানে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে একজন, কিন্তু এখন তিনি ঢাক্ষিণেশ্বরে যেন সেনা বাহিনীকে সরিয়ে নেয়া হয়। তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সহায়তা চাইলেন। তারা দুজনে মিলে শেখ মুজিবকে এটা বিখ্যাস করাতে সক্ষম হলেন যে সেনাবাহিনী আসলে আওয়ামী লীগের বিরক্তেই অভিযান চালাচ্ছে।

ফারুক ছিলেন ২ নং ফিল্ড আর্টিলারির কমান্ডার এবং বশিদ বেঙ্গল ল্যাক্সারের ভারপ্রাণ কমান্ডার। ঢাকা বিমানবন্দরের কাছে নিয়মিত বিরতিতে রাতের বেলা আর্টিলারি আর ল্যাক্সারের যৌথ মহড়া করার জন্য ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে তারা সেনা সদরের অনুমতি চান। কোন সমস্যা নেই বলে বেশ দ্রুতই তাদের অনুমতি দেয়া হয়—ভাবলে মনে হবে যেন একটু বেশ দ্রুতই তাদের অনুমতিটি চলে আসে।

ট্যাক্স কোন গোলা ছিল না। রশিদের মতে ল্যাপ্টপের বাদে আর অল্প কিছু কর্মকর্তাই শুধু এটা জানতেন। কুবই হাস্যকর কথা। যখন ৭০০ জন ল্যাপ্টপের এ কথা জানতো তার মানে এটি আর কোন গোপন কথা ছিল না। অন্তত ঢাকায় না। অন্তত সেনা গোয়েন্দারা আর রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তারা এটা জানতেন। মুজিবের কিছু রাজনৈতিক সহযোগী দাবি করেন তারা মুজিবকে ট্যাক্সগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি কি তাদের বলেননি যে এই ট্যাক্সগুলোতে কোন গোলা ছিল না, যেখানে তিনি আনন্দের সামাজিক কাছ থেকে উপহার পাওয়া এই ট্যাক্সগুলো নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না।

মাঠ পর্যায়ের গোয়েন্দা ইউনিটের মাত্র ২০০ মিটারের মধ্যেই চক্রান্তগুলোর একটা বড় অংশ করা হয়েছে, অথচ এই ইউনিটের দিন রাত ২৪ ঘণ্টাই কাজ করার কথা।

ছুটিতে গিয়ে ত্রিগেডিয়ার রউফ এই ইউনিটের দায়িত্ব ত্রিগেডিয়ার জামিলের কাছে হস্তান্তরের প্রতিক্রিয়াটি এক মাস পিছিয়ে দেন। ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে এই ইউনিটের কিছু কর্মকর্তা বই ও চলচ্চিত্র সংগ্রহের ছলে দৃতাবাসগুলোতে যান, তারা আসলে জানতে গিয়েছিলেন মুজিব সরকার সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর মতামত কী। একজন কূটনীতিক আমাকে বলেন, “সেনা গোয়েন্দা বিভাগের একজন মেজর আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন কিছু চলচ্চিত্র নিয়ে আলাপের জন্য তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। দেখা হওয়ার পর তিনি আমার সাথে মূলত দেশের দূরবস্থার কথাই বেশি আলাপ করেন। আলাপের একদম শেষদিকে যে চলচ্চিত্রটি নিয়ে আলাপের জন্য তিনি এসেছিলেন সেটির কথা তার মনে পড়ে। তিনি বলেন যে পরে তিনি চলচ্চিত্রগুলোর জন্য আবার আসবেন। তিনি পরে আর আসেননি।”

অনেকেই মনে করেন ১৩ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যে প্রেনেড বিশ্বেরণ হয় তার সাথে সেনা গোয়েন্দা সংস্থার যোগাযোগ রয়েছে। তাদের ধারণা ঠিক হওয়ার সময় সঞ্চাবনা রয়েছে। উর্ধ্বতন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা হয় ডয়ক্স রকম অদৃশ ছিলেন নয়তো তারা এই চক্রান্তের অংশ ছিলেন। এমন অনেক কারণ রয়েছে যার ফলে মুজিব হত্যায় তাদের হাত রয়েছে বলে মনে হতে পারে।

১৫ আগস্ট যেদিন মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন সেদিন তাকে এক সেট রবীন্দ্র সমগ্র উপহার দিবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মতিন চৌধুরী। সেনা গোয়েন্দারা কোলকাতা থেকে রবীন্দ্র সমগ্র’র সেটটি ঢাকায় আসার সাথে সাথেই এটি বাজেয়াও করেন। ড. চৌধুরী কুব রাগাধিত হয়েছিলেন। সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাকে জানান, “শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফরের সাথে সম্পৃক্ত সব কিছুই আমাদের অনুমোদিত হতে হবে।”

ব্রিগেডিয়ার রাউফ অভ্যাসনের দুদিন আগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বসে মুজিবের বিরুদ্ধে উচ্চস্তরে কথা বলছিলেন। যখন তার মদ্য পানের সাথীরা তাকে নিরঙ্গ করতে যান তখন তিনি বলেন, “তোমাদের বঙ্গবন্ধুর কর্মণ পরিষ্ঠি হবে।” ফারুক বলেন যে তার হিসেব ছিল কেউই এটা ভাবতে পারবেন না যে তিনি অল্প কয়েকটি ট্যাঙ্ক নিয়ে যেগুলোর কোন গোলা নেই তা নিয়ে সেনা সদরের এবং রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে যেতে পারেন। সব বিবেচনায়ই ফারুক একজন সাহসী সেনা কর্মকর্তা, কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবেই মাথামোটা বা গৌয়ার ছিলেন না। তার অধীনে মাত্র ৭০০ লোক ছিল এবং যদি ঢাকা ব্রিগেড আর যী বাহিনী তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতো তাহলে তার জেতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যারা তার ট্যাঙ্কগুলোতে গোলা না থাকার কথা জানতেন তার কেউ স্টো ধরিয়ে দেবেন না। নিশ্চয়ই কোনভাবে এটা ফারুক নিশ্চিত করেছিলেন।

আনসার বাহিনী একটি সহযোগী বাহিনী, এর পরিচালক জহুরুল হক আনসার সদস্যদের ১৫ আগস্ট কোন কিছুতে না জড়ানোর পরামর্শ দেন। তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক ছিলেন, স্বল্পমেয়াদে জেল খাটার পর তাকে পুনর্বাসিত করা হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এমন অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর মধ্যে জড়াতে চাননি। হ্যাতো তারা ডেবেছিলেন যে কিছু জধীনস্ত কর্মকর্তা এই অভ্যাস ঘটিয়ে তাদের জেষ্ট্যাতা লড়ান্দন করলেও শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের লাভই হবে। কারণ নতুন সরকার তাদের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হবে। যদিও এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে কিছু কিছু উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাকে শাস্ত করা হয়েছিল বা অর্থের বিনিময়ে কিনে নেয়া হয়েছিল।

শাস্ত করার কথা হ্যাই বলতেন। তিনি দাবি করেন তার প্রধান কাজ ছিল ১৫ আগস্ট সকালে মুজিবের বাড়িতে প্রহরার দায়িত্ব ধাকা সৈনিকদের ‘শাস্ত’ করা। তাদের তিনি শাস্ত করেছিলেন ঠিকই তবে ১৫ আগস্ট সকাল বেলা নয়। তিনি বারবার বলেন “সৈনিকেরা আমাকে ভালোবাসত।” কিন্তু নিশ্চয়ই ভালোবাসার কারণে ও প্রহরীরা তাকে বিনা প্রতিবাদের মুজিবের বাড়িতে ঢুকতে দেন নি?

সশস্ত্র বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর অনেক কর্মকর্তা ল্যাপ্টারদের চ্যালেন্জ করতে চেয়েছিলেন। বিমান বাহিনীর কিছু কর্মকর্তা ট্যাঙ্কগুলোতে বোমা ফেলতে চেয়েছিলেন। ঢাকা ব্রিগেডের কর্ণেল শাফাত জামিলের ইচ্ছা ছিল প্রতিরোধ করার এবং তার অধীনস্ত সৈনিকেরাও তার সাথে ছিলো। কিন্তু তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ ছিল: “অপেক্ষা কর”, ঠিক যেমনটি ধড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল।

কেউ কেউ তাদের তৎপর না হওয়ার অভ্যাস হিসেবে বলেছিলেন, “আমরা জানতাম না যে ট্যাঙ্কগুলোতে কোন গোলা ছিল না।” ট্যাঙ্ক গোলা থাকলেও ল্যাপ্টারদের প্রতিরোধ করা যেত। আসলে যে জিনিসের অভাব ছিল তা হল লড়াই করার ইচ্ছা।

মাত্র ৭০০ ল্যাপ্টার ছিল আক্রমণকারী দলটিতে এবং ঢাকা শহরে অল্প কয়েকটি প্রশস্ত রাঙ্গা ছিল ফলে এ শহর ট্যাঙ্ক যুদ্ধের উপযোগী ছিল না মোটেই। এ ট্যাঙ্কগুলোর পক্ষে এক গলি থেকে আরেক গলিতে গিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না।

পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক দেখে মুক্তিযোদ্ধারা কথনে ডয় পায়নি, এবং রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ছিল মুক্তিযোদ্ধা। তাদের মধ্যে অনেক মতবিবোধ ছিল, সার্বিকভাবে তারা সবাই বঙ্গবন্ধুর অনুগত ছিলেন। তাদের যা দরকার ছিল তা হল দিক নির্দেশনা। রক্ষীবাহিনীর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান ঐ সময় লভনে ছিলেন এবং তার দু'জন সহকারী তখন ছুটিতে ছিলেন। বাহিনীর চার জন শীর্ষ ব্যক্তির মধ্যে তিনজনই কেন সে সময় দায়িত্বে ছিলেন না তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

তোফায়েল আহমেদ সে সময় রক্ষীবাহিনীকে পাটা যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধার্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, “তাদের যদি সত্যিই লড়াই করার ইচ্ছা থাকত এবং আমি তাদের বাধা দিয়ে থাকি তাহলে তাদের উচিত ছিল আমাকে হত্যা করা।” তার মতে, তিনি নিজেই সে সময় শের-এ-বাংলা নগরে রক্ষীবাহিনীর দণ্ডে গিয়েছিলেন এবং এমন কিছু সামরিক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন যাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল। তাদের মধ্যে একজন তাকে সে সময় হ্যাকি দিয়েছিলেন যে তিনি যদি রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প ত্যাগ না করেন তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের চার বছর পর বিদেশী সাংবাদিক লরেন্স লিফগুলজ মত দেন ‘সেনা কর্মকর্তারা কোন রাজনৈতিক ইঙ্গন ছাড়াই নিজেরা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন’ বলে যে ধারণা চালু ছিল তা শুধুই একটি মিথ্যাচার যা পরে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের বিদেশি সংবাদদাতারা এ অপপ্রাচার চালাতে সাহায্য করেছেন।

মুজিব প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় গণভবনে ওঠেননি এবং রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরও তা করেননি। কিন্তু তারপরও অনেক বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি যারা ঐ অভ্যুত্থানের আগে একাধিকবার ঢাকা সফর করেছেন তারা ১৫ আগস্টের ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন তিনি গণভবনে থাকতেন। এই ভুলটি এবং এমন আরও কিছু ভুল খুব মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করা যায়। কিন্তু কিছু সংবাদপত্র ও সাংবাদিক এই অভ্যুত্থানকারীদের আদর্শবাদী বীর হিসেবে উপস্থাপন করেছিল।

লক্ষনভিত্তিক দি সানডে টাইমস ফার্মকের প্রবক্ষের ভূমিকায় লিখে মেজররা এমন একটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ‘যা দেশে পরিবর্তন আনতে এতেটাই বক্ষ পরিকর ছিল যে প্রয়োজনবোধে দেশের প্রতিষ্ঠাতা নেতাকে হত্যা করতেও পিছপা হয়নি।’ এটি কোন আন্দোলন ছিল না, এটি একটি চক্রান্ত ছিল এবং চক্রান্তকারী হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি।

এইট ডেইস নামের আরেকটি লভনভিত্তিক জার্নালও ফারুক ও রশিদকে আদর্শবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে। সেখানে লেখা হয় “ইসলামিক বাংলাদেশ এক রাতেই উঁধাও হয়ে যায়, ৭০ মিলিয়ন মুসলমান অসাম্প্রদায়িকতার পথে ফিরে আসে।” তাদের এক বারের জন্যও মনে হয়নি এই তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের কোন ব্যক্তিগত উচ্চাকৃত্ব থাকতে পারে অর্থ বা ক্ষমতার জন্য।

এটা লিফ্টলজের কৃতিত্ব যে তিনি তার ‘দ্যা আনফিলিশড রেভলুশন’ এছে তার তুল শুধরে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। সেখানে তিনি দাবি করেছেন ‘যারা সরাসরি ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল তারা ছাড়া আর কেউই আসল ঘটনা জানেন না।

প্রাথমিকভাবে যতটা মনে হয়েছিল চক্রান্তের ব্যাপ্তি তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল, কিন্তু ঢাকায় কেউই এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করেননি যে সেনাবাহিনীর কনিষ্ঠ কর্মকর্তারা একাই এমন নৃশংসতা করেছেন। মোতাকের ইকনেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে সাধারণের বিশ্বাস ছিল। আগস্টের শেষ সপ্তাহে বিদেশি সাংবাদিকরা ঢাকায় আসলে তারা সব সময় তাদের হোটেল কক্ষেই আবক্ষ ছিলেন এবং তাদের কাছে আসা সরকারের অনুগত সাংবাদিকদের দেয়া তথ্যই তারা সত্য বলে মনে নিয়েছিলেন; এগুলোকে সরকারের অপপ্রচার না ভেবে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করাটা ছিল বোকামী।

এসব বিদেশি সাংবাদিকদের অনেকেই স্বাধীনতার পর থেকেই দেশটি ব্যাপক রাজনৈতিক দুর্বোগে অঠিবেই পড়তে যাচ্ছে এমন রিপোর্ট লিখছিলেন, এবং মিথ্যা গুজবকে গুরুত্বের সাথে নেয়া বা যে সব ঘটনা তাদের পছন্দনীয় নয় সেগুলো ধার্ম চাপা দিতেও তাদের খুব বিধা ছিল না।

মার্কিন দৃতাবাসের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা লিফ্টলজের কাছে শীকার করেন যে মুজিবকে উৎখাত করতে চান এমন ব্যক্তিয়া ১৯৭৪ সালে প্রথম মার্কিন দৃতাবাসের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে তাদের বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছিল। বাংলাদেশে অভ্যাসনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হলে মার্কিন সরকারের প্রতিক্রিয়া কি হবে সেটাই এসব বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের নেতাদের হত্যার ঘটনার সাথে সিআইএ’র সম্পৃক্ততা নিয়ে সে সময় মার্কিন সিনেটের লোক দেখানো সংসদীয় কমিটির কর্মকাণ্ডে মার্কিন কূটনীতিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বেশ সর্তর্ক ছিলেন। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে তারা সিদ্ধান্ত নেন তারা এসব চক্রান্তকারীদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না এবং এই গোলমাল থেকে দূরে থাকবেন।

এ গল্পটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। একই রকম গল্প মোতাক করেছিলেন যখন তার বিজ্ঞকে ১৯৭১ সালে মার্কিনীদের সাথে যোগাযোগের অভিযোগ আসে। ১৯৭৬ সালে রিচার্ড নিক্সন মার্কিন সিনেটের গোয়েন্দা বিষয়ক কমিটির কাছে শীকার করেন যে তিনি সালভাদর আলেন্দের নির্বাচন বানচাল করতে সিআইএকে নির্দেশ

দিয়েছিলেন, সাথে এও দাবি করেন যে আলেন্দে নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি ঐ অঞ্চলে সিআইএকে কোন ধরণের গোপন তৎপরাতা না চালাতে নির্দেশ দেন। একই বছর ২২ জানুয়ারি তারিখে সিআইএর সাবেক পরিচালক রিচার্ড হেলস মার্কিন সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির কাছে শীকারোক্তি দেন যে, ১৯৭৩ সালে আলেন্দের শাসনামল চলছিল চিলির রাজনীতিতে সিআইএ কোন ধরণের হস্তক্ষেপ করেনি বলে কমিটিকে তুল পথে চালিত করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ৫ ডিসেম্বর, মার্কিন সিনেটের গোয়েন্দা বিষয়ক কমিটির সভাপতি সিনেটের ফ্র্যাঙ্ক চার্চ বলেন, ‘হোয়াইট হাউসের যে একনায়কতন্ত্রী প্রবণতা রয়েছে রিচার্ড নিঙ্গেনের আমলে তা শীর্ষে পৌছায়।’ চিলির ক্ষমতা থেকে আলেন্দেকে উৎখাতের ঘটনা সম্পর্কে চার্চ বলেন হোয়াইট হাউসের অবস্থাটা এমন যে-‘ডিয়েনামের ঘটনার কারণে আমি যদি আর কোন দেশে সেনা পাঠাতে না পারি তাহলে ঐসব স্থানে আমি সিআইএকে পাঠাবো।’

চার্চের এসব কড়া কথায় হোয়াইট হাউসের ‘একনায়কতন্ত্রী’ মন মানসিকতায় তেমন উপ্লেব্যযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। নিঙ্গেন কমিটির উদ্যোগকে সিআইএকে দুর্বল করার চেষ্টা বলে অভিযোগ করেন। যদিও সে সময় তিনি ক্ষমতায় ছিলেন না, তারপরও জোড় দিয়ে বলেন, কমিটির কার্যক্রম ‘ভয়ঙ্কর রকম অপরিগামদশী’ এবং ‘এর ফলে পৃথিবীর সব মুক্ত দেশের অস্তিত্ব হ্যাকির মুখে পড়বে।’

এটা যদি মেলেও নেয়া হয় যে মার্কিন দৃতাবাস অভ্যানের সাথে নিজেদের যুক্ত রাখতে চায়নি, তারপরও সরাসরি না হলেও বিডিন্স মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে অভ্যানকারীদের সাথে দৃতাবাসটির কিছু কর্মকর্তার যোগাযোগ ছিল। যাই হোক তখন আসলে মার্কিন কর্মকর্তাদের চক্রান্ত থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার সময় পেরিয়ে গেছে এবং তারা বেশ অঙ্গাসিভাবে চক্রান্তের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল।

যখনই কোন সেনা অভ্যানের কথা মাথায় এসেছে, তখনই বৈঠকগুলোর কিছু হত ঢাকায় আর কিছু কুমিল্লা জেলায়।

কুমিল্লা ঢাকা থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে হওয়ায় ওখানে বৈঠক করা চক্রান্তকারীদের অন্য সুবিধাজনক ছিল।

ডালিম প্রথমে ছাত্র এবং পরে সেনা কর্মকর্তা হিসেবে কুমিল্লায় কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। হ্যান্ড অভ্যানের সময় কুমিল্লা সেনানিবাসে দায়িত্বে ছিলেন এবং ১৫ আগস্টের ভয়ঙ্কর সকালে শেখ মুজিবের বাড়ি পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনা জওয়ানরাও সবাই এসেছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে।

অভ্যানকারী মেজররা কুমিল্লায় বেশ কয়েকবার বৈঠক করেছিলেন এবং যাবেই এসব বৈঠকে উন্নত বাক্য বিনিময় হত। যোত্তাক ও তাহের উচ্চীন ঠাকুর দুজনই কুমিল্লার লোক এবং মাহবুবুল আলম চার্ষী কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ

একাডেমি অফ ইন্টিগ্রেটেড কুর্সাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)’র উপ-পরিচালক ছিলেন।

‘৬০ এর শুরুর দিকে যখন পাকিস্তানে প্রথমবারের মত সামরিক শাসন এসেছিল, তখন মার্কিন আর্থিক সহায়তায় কুমিল্লায় এই একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. আখতার হামিদ খান ছিলেন প্রথম পরিচালক। তিনি একজন পাঠান হলেও খাদি কাপড় পড়তেন, দ্রুত ও শক্ত ভাষায় বাংলা বলতে পারতেন এবং তিনি একাডেমির আশে পাশের গ্রামাঞ্চলে অনেক ঘোরাঘুরি করতেন। তিনি কুমিল্লা সমবায় সমিতি চালু করেন, যা পরবর্তীতে সমষ্টি ‘উন্নয়ন’ এর মডেল হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হয়েছিল। এই সমবায় সমিতিগুলো সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় এবং পাকিস্তান ও পাকিস্তানের বাইরে অন্য দেশেও ড. হামিদের কাজ প্রশংসিত ছিল। কিন্তু ‘কুমিল্লা গবেষণা’ পরিচালনা করার জন্য প্রচুর অর্থ দরকার ছিল যা তখন ছিল না এবং এমন কি কুমিল্লা সমবায় সমিতিগুলোও খুব সামান্যই সফলতা পেয়েছিল, এগুলোর পিছনে প্রচুর অর্থ বায় করার পরও। ভূমিহীন কৃষকরা এসব সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং সমবায় সমিতি পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এ কৃষকদের দাবী দাওয়া তেমন গুরুত্ব পেতনা।

প্রখ্যাত ফরাসী অধ্যনীতিবিদ ড্যানিয়েল ধৰ্মার কুমিল্লা প্রকল্পের ডিসেম্বর ১৯৭০ থেকে জানুয়ারি ১৯৭০ পর্যন্ত সময়ের রিপোর্টটি সম্পর্কে ঢাকায় ১৯৭৩ সালে আয়োজিত ইন্ট’রন্যাশনাল ইকলোমিক এসোসিয়েশানের কনফারেন্সে বলেছিলেন এটি পড়ে মনে হচ্ছে যেন ‘জনতার আদালতে চীনা স্টাইলে গণ আদালতের সামনে কর্তৃপক্ষের শীকারোক্তি’।

কিন্তু আখতার হামিদ খান মোটেও কোন সমাজবাদী ব্যক্তি ছিলেন না, যেমন মাহবুবুল আলম কোন ‘চার্ষী’ ছিলেন না। তারা দুজনই উত্তরভৌগী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করছিলেন, এসব কৃষকদের অনেকেই আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার কঠোর সমর্থক ছিলেন।

আইয়ুব খানের আমলে কুমিল্লা একাডেমিটি একটি শো-পিস হিসেবেই ছিল, আর ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে এটি মোতাবক, তাহের উদ্দীন ঠাকুর এবং মাহবুবুল আলম চার্ষীদের জন্য নিয়মিত বৈঠকের হালে পরিণত হয়। এই তিন ব্যক্তি, মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের ভূমিকা প্রশংসিত ছিল, তাদেন নিয়মিত বৈঠক নিশ্চয়ই সন্দেহের উত্ত্বেক করে থাকবে। কিন্তু ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি প্রজন্মের সেবা দিয়েছিলেন এমন লোকেরা তখনও গোয়েন্দা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

১৫ আগস্টে মাহবুবুল আলম চার্ষীর সহকর্মীরা বৃন্ততে পেরেছিলেন আসলে একাডেমিতে সক্ষ্যাবেলার স্বনির্ভর বৈঠকগুলোতে কি আলোচনা হত।

শ্বনিউর শব্দটির অর্থ হল যে নিজের উপর নির্ভর করে এমন ব্যক্তি। ১৯৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি এই শ্বনিউর আন্দোলন শুরু হয়, যখন সোনালী শতক নামে একটি কর্মসূচি আরম্ভ করা হয়। ১৯৭৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে একটি ভয়ঙ্কর বন্যায় বাংলাদেশের সতেরোটি জেলার মধ্যে তেরোটি আক্রান্ত হয়। বন্যা দুর্গতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড) একটি পুনর্বাসন প্রকল্প হাতে নেয়।

এই প্রকল্পটির নাম ছিল 'সবুজ'। এর নাম হওয়া উচিৎ ছিল 'কালো', কারণ ঠিক এই সময়টাতেই শেখ মুজিবকে হত্যা করার মাধ্যমে জাতিকে দুর্ঘাগে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়। ১৯৭৪ সালের ২৭ জুন যেদিন ভূট্টো ঢাকায় এসেছিলেন সেদিন মোতাকের বহু এক প্রকৌশলি প্রেসক্লাবে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের জানান যে মোতাক বাংলাদেশে পাকিস্তানি ধর্মসংঘের ফটো প্রকাশ করার কারণে তাহের উদীন ঠাকুরের উপর ক্ষণে ছিলেন। ঐ প্রকৌশলি বলেন, "হঠাৎ কেন তাহের উদীন পাকিস্তানের বিপক্ষে চলে গেলেন? ঢাকায় ভূট্টো যে আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছেন তা থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে দেশের মানুষ পাকিস্তানের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক রাখতে চায়। আমি আশা করব এই ভিড় দেশে তাহের উদীনের বোধাদয় ঘটবে। এখন মুজিবের সান্নিধ্য পাছেন বলে তাহের উদীন যদি মোতাকের কাছে তার যে ঝণ আছে তা ভুলে যান তাহলে তাকে এ কারণে পতাতে হবে। এই প্রকৌশলি কানে কম ঘনত্বে বলে বেশ জোড়ে কথা বলতেন। ঐ সময় কেউ তার কথা শুনতের সাথে নেন নি।

পরে অনেকেই সম্মেহ করেছিলেন যে তাহের উদীন এবং মোতাকের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল তা ছিল লোক দেখানো। তাদের মধ্যে কোন মত পার্দক্য থাকলেও তা খুব শিয়াই মিটে গিয়েছিল।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ আমাদের সবার মনেই গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছিল। তাহের উদীন ঠাকুর একদিন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনার কি মনে হয় আমরা এ দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারবো?" জবাবে আমি বলেছিলাম, "কেন নয়?" অবস্থা খুব খারাপ হলেও তখনও হতাশ হবার মত কিছু ঘটেনি। কিন্তু হতে পারে ঠাকুরের মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরছিল। আজ তাহেরের সেই প্রশ্নের অর্থ আমার কাছে অন্য রকম মনে হচ্ছে।

১৯৭৪ সালের জুনে যখন ভূট্টো ঢাকা সফর করেন তখন মুজিব তাকে প্রত্যাখ্যান করার পরপরই পাকিস্তান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর পায়তারা শুরু করে। এই ভয়ঙ্কর তৎপরতা আরো জোড়ার হয় যখন বাংলাদেশ একটি দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে। ভূট্টো নিজেই ১০ নভেম্বর ১৯৭৪ বাহাওয়ালপুরে ভাষণে শ্রেষ্ঠের সাথে বলেন, হাজার হাজার বাঙালী এখন, 'শাধীনতার সুফল ভোগ করছে'।

মোস্তাক আর তাহের উকীল ঠাকুরও নিচয়ই সেদিন যারা তাদেরকে বাদ পড়াদের দলে ফেলছিলেন তাদের নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন। তারা দুজনই কৃষি কাজে আগ্রহী ছিলেন এবং প্রায়ই খনিভর আন্দোলন সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে এক সাথে চলাফেরা করতেন। ১৯৭৫ সালের শুরু থেকে তারা এ আন্দোলন নিয়ে এতেটাই ব্যক্ত হয়ে পড়েন যে তাদের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রণালয়গুলোর কাজ দেখার সময় তাদের ছিল না।

যে বীজ তারা গোপন করেছিলেন তারা সেগুলোর যত্ন নিছিলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারা তাদের কুকর্মের ফসল ঘরে তুলতে পেরেছিলেন।

চাকায় জাতীয় খনিভর আন্দোলনের কার্যক্রম শুরু হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ এ, মুজিব হত্যার ৪০ দিন পর। এর প্রধান লক্ষ ছিল 'খনিয়াত্ত্বিত প্রতিরক্ষা কর্মকৌশলের মাধ্যমে' একটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা'।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তা দিয়েছেন এমন অনেককেই এই 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা'য় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মোতাকের সরকারের জন্য তারা সহজাত মিঝ ছিলেন।

মুজিবকে হত্যার চক্র শুরু হয় ১৯৭৪-এর গ্রীষ্মে। সময়টির সাথে ভূট্টোর ঢাকা সফরের সময় মিলে যায়। অনেকেই ঐ সময় ভূট্টোর ঢাকা সফরকে বাংলাদেশের ইতিহাসের মোড় ঘূরিয়ে দেয়া ঘটনা মনে করেন। নিচয়ই ঐ সফরের মধ্যে দিয়ে অনেক দিন ধরে লুকিয়ে থাকা শক্ত মাথা ঢাঢ়া দিয়ে উঠেছিল। যদিও এ সফরটি লাহোরে ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিক্রিয়া সফরই ছিল শুধু।

১৯৭২ সালে জেন্দায় মুসলিম সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ইসলাম বিরোধী চক্রের ঘড়্যাত্ত্বের ফল বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯৭৩ সালে কায়রোতে ইলসামী দেশগুলোর সম্মেলনে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু ১৯৭৪ সালে হঠাত করেই ইসলামী রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশকে তাদের দলভূক্ত করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তারা পাকিস্তান যেন বাংলাদেশকে শীর্কৃতি দেয় সে দাবী জানায়। পাকিস্তানও এ দাবী সানস্দে মেনে নেয়।

আনোয়ার সাদাত বলেন ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনের সবচেয়ে বড় অর্জন হল মুসলিম দেশগুলোর বাংলাদেশকে স্বাগত জানানো এবং 'ভাই মুজিব' কে গ্রহণ করা।

কিন্তু বাংলাদেশ নিউজ লেটার (লন্ডন, মার্চ/এপ্রিল ১৯৭৪)-এর একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকার লিখেন, "এই ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন ভবিষ্যতে হয় অনেক অপকর্ম শুরুর স্থান হিসেবে মানুষের মনে থাকবে অথবা ইতিহাসের একটি অতুরঙ্গ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা আশা করবো একেব্রে দ্বিতীয়টাই ঘটবে, কারণ সেটিই হবে এই সম্মেলনের জন্য উপযুক্ত।"

একটি গোপন দরজা দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবার ধর্ম প্রবেশ করেছিল।

মুজিব সব সময়ই জনতাকে ভালোবাসতেন, এবং লাহোরে বিশাল স্বর্বর্ণনা পেয়ে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু লাহোরের ঐ ইসলামিক সম্মেলনের পুরোটাই মুজিবের জন্য আনন্দদায়ক ছিল না এবং তিনি হয়তো পরে এটি নিয়ে অনুভূত হয়েছিলেন।

লাহোর থেকে ফিরে যখন মুজিব অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন বেগম মুজিবের কাছে একটি চিঠি আসে যার ঠিকানা ছিল পাকিস্তানের, কিন্তু চিঠিটি এসেছিল লক্ষ্মন থেকে। চিঠির লেখক নিজেকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর একজন চিকিৎসক বলে দাবী করেন এবং জানান যে অনেক ঝুঁকি নিয়ে তিনি চিঠিটি লিখছেন কারণ বেগম মুজিবকে সতর্ক করাকে তিনি তার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। তিনি জানান যে ভূট্টো তাকে এমন একটি ভাইরাস দিতে বলেন যা তিনি (ভূট্টো) মুজিবের সাথে প্রতিষ্ঠিত অনুসারে আলিঙ্গনের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাবার সময় মুজিবের শরীরে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। ঐ চিকিৎসক নিজে কাজটি করতে অসীম জানালেও তার ভয় ছিল অন্য কেউ কাজটি করতেও পারে। মুজিবের স্থান্ধ্যের জন্য প্রার্থনা করে তিনি তার চিঠিটি শেয় করেন।

শেখ মণি এই চিঠির একটি কপি পান।

পাকিস্তান সেনা বাহিনীতে ঐ নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের নামে এই চিঠি পাঠানোর পাগলামী করবেন না সেটাই স্বাভাবিক। এই চিঠিটি নিশ্চিতভাবেই চৰ্কান্ত করে পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু বেগম মুজিব ততু থেকেই শেখ মুজিবের লাহোরে যাওয়ার বিপক্ষে ছিলেন এবং এই চিঠিটি পেয়ে তিনি ভীষণ মুষড়ে পড়েন। মুজিবের ঘাড়ে নতুন একটা ব্যাথা যা কোন ক্রমেই সেড়ে উঠছিল না, তার ফলে বেগম মুজিবের দুচিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

মুজিবের মৃত্যুর এক বছর পর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে আনন্দায় সাদাত বাংলাদেশের তখনকার রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের কাছে প্রশ্ন রাখেন, “আপনারা শেখ মুজিবকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে পারতেন, তা না করে মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার কি দরকার ছিল?” রাষ্ট্রপতি সায়েম সব দায় অঙ্গীকার করে বলেন, “এই কাজ করা হয়েছে পূর্বের সরকারের আমলে, আমাদের সাথে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।” কিন্তু সায়েমের কথা তন্তে পান নি এমন ভঙ্গিতে সাদাত বলেন, “বাংলাদেশকে বিনা কারণে ঐ রাশিয়ান ট্যাক্ষণ্লো দেয়ায় আমি নিজেই খুব অনুভূত, আপনারা ঐ গুলো দিয়ে আমার বক্তু মুজিবকে হত্যা করেছেন।”

মুজিবের একজন আত্মীয় যখন আনন্দায় সাদাতের এই প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে পারেন তখন তিনি বলেন, “আনন্দায় সাদাত এখন অনুভূত বোধ করছেন। কিন্তু তিনি ঐ পুরোনো ট্যাক্ষণ্লো কোথাও ফেলে দিয়ে ভারমুক্ত হতে উদ্যোব ছিলেন

বলেই বাংলাদেশকে উভলো দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো তিনি কার ইশারায় এ কাজ করেছিলেন?"

মুজিব কিছু জানার আগেই ট্যাঙ্কগুলো বাংলাদেশের উদ্দেশে পাঠানো হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার সময় তিনি তখন একটি কথাই বলেছিলেন, "এমন ঘেন আর না হয়।" কিন্তু এমন ঘটনা একবার ঘটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একজন বিগেড়িয়ার আক্ষেপের সাথে বলেন, "ঐ ট্যাঙ্কগুলো সত্যিকারের যুদ্ধে হয়তো কোন কাজে আসতো না, কিন্তু ঐগুলো দিয়ে অভ্যর্থনকারী মেজরদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।"

"চাচাই (বেগম মুজিব) বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। তিনি কোন অবস্থাতেই গণভবনে যেতে রাজি ছিলেন না।" মুজিবের একজন তরুণ আত্মীয় এ কথা বলেন। মুজিবকে এই আত্মীয় প্রচণ্ড ভালোবাসতেন আর তাই তিনি নিজের মত করে এই দুর্যোগের কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন তা আবেগের বশবর্তী হয়ে বলেছিলেন এবং পরে এ জন্য অনুত্তম হয়েছিলেন।

বিদেশীরা সহ অনেকেই মন্তব্য করেন যে, মুজিব দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাতেন গণভবনে যা ছিল সুরক্ষিত দুর্গের মত, অথচ রাতে ঘুমাতে যেতেন ধানমণ্ডিত নিজের বাসায় যার চারিদিক উন্মুক্ত এবং খুবই ঝুকিপূর্ণ।

কোন একজন উন্মাদের পক্ষেও মুজিবের বাড়ির আনালাতলোর কোনটি দিয়ে তলি চালানো বা পাশের কোন বাড়ি থেকে বোমা ছুড়ে মারা সম্ভব ছিল।

১৯৭২ সালে মুজিবের সাথে দেখা করতে আসা বিদেশীরা গণভবনে বা মুজিবের নিজস্ব বাসভবনে নিরাপত্তা কড়াকড়ি না দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন। কাঁধে কোন একটি ব্যাগ নিয়েও যে কোন অতিথি মুজিবের সামনে যেতে পারতেন। এমনকি এর পরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা হতাশাজনকভাবে কম ছিল।

১৯৭৫ সালের ৩০ মার্চে যখন মুজিবের বাবা মৃত্যু বরণ করেন তখন তার বাড়িতে মানুষ গিজ গিজ করছিল, এমন কি তার শোবার ঘরেও।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে মুজিব কখনোই খুব উৎকণ্ঠিত ছিলেন না।

অনেকেই মনে করেন মুজিব গণভবনে বসবাস করলে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এর অভ্যর্থন ব্যর্থ হত। তাদের যুক্তি হল, যে সেনাদলটি হামলা চালায় গণভবনে চুক্তে তাদের আরো বেশি সময় লাগতো এবং এর মধ্যে সাহায্য চলে আসতে পারতো। তারা ইঙ্গিত করেন যে রক্ষি বাহিনীর ক্যাম্পটি গণভবনের কাছাকাছি ছিল।

কিন্তু যখন আগে থেকেই নিরাপদ্মা রক্ষাদের নিক্ষিয় করে রাখা হয়েছিল তখন গণভবনে থাকলেও কি আলো কোন পার্শ্বক্য হত?

বেগম মুজিব, শেখ মুজিবকে বলতেন, “তুমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আলোই এই বাড়িতে আমরা থাকতাম। একবার আমাদের সন্তানদের গণভবনের মত জাহাঙ্গীয় থাকার অভ্যাস হয়ে গেলে পরে তাদের অন্য পরিবেশে মানিয়ে নিতে কষ্ট হবে।”

বেগম মুজিবের গণভবন যেতে না চাওয়ার পেছনে আরও গভীর কারণ থাকতে পারে। গণভবনে তিনি হয়তো পূর্ণ স্বাচ্ছন্দের সাথে থাকতে পারতেন না। তিনি ছিলেন একজন ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে থাকা নারী, যার কাছে নিজের বাসগৃহ জীবনের কেন্দ্র। তিনি কখনোই মুজিবের সাথে বিদেশ সফরে যেতেন না।

এ বিষয়েও সন্দেহ আছে যে মুজিব নিজে গণভবনে বা বঙ্গভবনে থাকতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন কি না। একজন বাংলা সাহিত্যিক বেশ প্রশংসা করে লিখেছিলেন, “আর দশটা বাঙালী মধ্যবিত্ত মানুষের মত মুজিবও নিজের বাড়ি পছন্দ করতেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তার জীবন যাপনে পরিবর্তন আসেনি। তার বাড়িতে কোন কাপেট বা নতুন আসবাব আসেনি। তার মাছ, খিচুড়ি, দই আর গুড় পছন্দ ছিল। বাড়িতে তিনি লুঙ্গি আর গেঞ্জি পড়ে আরাম করতেন। তিনি একজন মধ্যবিত্ত বাঙালীই ছিলেন।

যখন ১৯৭০ সালে একদল ছাত্র মুজিবকে শ্রদ্ধা ভরে মালা পরিয়ে দেয় তখন মুজিব ভালোবেসে সে মালা বেগম মুজিবকে পরিয়ে দিয়ে বলেন “মালাটি তারই প্রাপ্য।” এই সম্মান বেগম মুজিবের প্রাপ্য ছিল। তিনি মুজিবের উত্তাল রাজনৈতিক জীবনে সব সময় পাশে থাকার সাথে সাথে বিভিন্ন সময় মুজিব যখন কারাবন্দী ছিলেন তখন রাজনৈতিক কর্মীদের সহযোগিতা করেছেন এবং কোন কোন সময় যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৬৮ সালে লাহোরে আইয়ুব খান যে গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছিলেন তাতে যেন মুজিব অংশ নেন সে বিষয়ে অনেক আওয়ামী লীগ নেতাই আগ্রহী ছিলেন, এমন কি জামিন নিয়ে হলেও মুজিব যেন সেখানে যান তারা সেটা চাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন বেগম মুজিব এ কথা জানতে পারেন তখন তিনি দ্রুত ঢাকা সেনানিবাসে যেখানে মুজিবসহ অন্যান্য নেতারা আগরতলা ঘড়যন্ত্র মামলায় আটক ছিলেন সেখানে হাজির হন। তিনি বলেন, “সব অভিযুক্তদের মুক্তি দিলেই কেবল তুমি এই বৈঠকে যেতে পার।” তিনি নিশ্চিত ছিলেন সরকারকে সকল বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। অনেক আওয়ামী লীগ নেতা বেগম মুজিবের উপর কিন্তু হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে অনেক দুর্বলচিত্ত রাজনৈতিক নেতা যারা আইয়ুব খানের সাথে যে কোন মূল্যে সমরোতায় আগ্রহী ছিলেন তাদের চেয়ে তার প্রজ্ঞা ও সাহস বেশি ছিল। মুজিব যদি ঐসব নেতার কথায় কান দিতেন তাহলে তা হত রাজনৈতিক আজ্ঞাহত্যার শামিল।

ଆଗରତଳା ସ୍ଵଭାବିକ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରା ହେଲାଛିଲ । ଏଟି ପାକିନ୍ଦାରେ ରାଜନୀତର ମୋଡ୍ ଘୁରିଯେ ଦେଯ ।

ଅନେକେଇ ବେଗମ ମୁଜିବେର ଏହି ସାହସୀ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ୟାଗେର କୃତିତ୍ଥ ଦାବି କରେନ । ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଛାତ ନେତା ତାକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଯେଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ତାକେ କୋନ ରକମ ଝୋଡ଼ କରାତେ ହ୍ୟାନି । ମୁଜିବେର ଲାହୋରେ ବୈଠକେ ଯାଓୟା ଉଚିତ ହେବନା ଏହି ସିନ୍ଧାନ୍ତି ତିନି ନିଜେଇ ନିଯେଛିଲେନ । ତାର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଛିଲ ଯଷେଟ ।

କିନ୍ତୁ ବହୁ ବହୁ ଧରେ ଦୁଃଖିତାଯ ଥାକା ବିଶେଷତ ମୂଳ୍ୟମୂଳ୍ୟକାଲୀନ ସମୟେ ଯଥନ ତାର ଶାରୀକେ ପାକିନ୍ଦାରେ ନିଯେ ଆଟକେ ରାଖା ହେଲାଛିଲ ମେ ସମୟେର ଦୂର୍ଭାଗେର କାରଣେ ବେଗମ ମୁଜିବ ଆଗେ ତୁଳନାୟ ଅନେକଟାଇ ଦୂର୍ବଲ ହ୍ୟେ ପଡ଼େଛିଲେନ । ଦେଶ ଶାରୀନ ହ୍ୟାନାର ପର ତିନି ଏକଟ ସ୍ଵତ୍ତି ଚେଯେଛିଲେନ, ଏବଂ ତାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହଲେ ତିନି ଶେଷ ମୁଜିବକେ କୋନ ଧରନେର ରାତ୍ରୀଯ ଦାୟିତ୍ବ ନେଯା ଥେକେ ବିରାତ ରାଖିଲେନ । ତିନି ପ୍ରାୟଇ ମୁଜିବକେ ବଲତେନ, “ଦେଶର ଜନ୍ୟ ଭୂମି ଯା ଚେଯେଛ ତା ହେବେ । ଏଥନ ଅନ୍ୟଦେର ଏ ଦେଶେର ଭାଲ ମନ୍ଦ ଦେବତେ ଦାଓ ।” ମୁଜିବ ଜବାବେ ବଲତେନ ତାର ପକ୍ଷେ ଦାୟିତ୍ବ ଏଡ଼ାନୋ ସମ୍ଭବ ନନ୍ଦ । ହାସିନା ସବ ସମୟ ତାର ବାବାକେ ସମର୍ଥନ ଦିତେନ । ବେଗମ ମୁଜିବ ତଥନ ହାସିନାର ଦିକେ ଫିରେ ବଲତେନ, “କେନ ଭୂମି ତାର ପକ୍ଷ ନିଛି?”

୧୯୭୧ ସାଲେର ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ମୁଜିବ ଗ୍ରେଫତାର ହ୍ୟାନାର ପର, ବେଶ କିନ୍ତୁଦିନ ତାର ପରିବାରେର ସଦସ୍ୟରା ଲୁକିଯେ ଛିଲେନ ।

ଏକଜନ ଶୁଭାକାଙ୍କ୍ଷୀ ତାଦେର ପରାମର୍ଶ ଦିଯେଛିଲେନ ତାରା ଯେନ ସୀମାନ୍ତ ପେରିଯେ ଭାବରେ ଚଲେ ଯାନ । ଏ ଜନ୍ୟ ତାଦେର ବେଶ କରେକଦିନ ଧରେ ଇଁଟିତେ ହବେ । ହାସିନାର ଗର୍ଭ ତଥନ ତାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଥାକାଯ ତିନି ଦୂର୍ବଲ ଛିଲେନ ବଲେ ତାର ପକ୍ଷେ ଏ ଦୀର୍ଘ ଯାଆ କରା ସମ୍ଭବ ହିଲ ନୀ । ବେଗମ ମୁଜିବ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଯେଛିଲେନ, ଯାଇ ହୋକ ନା କେନ ତାରା ସବାଇ ଏକସାଥେ ଥାକବେନ । ତିନି ତାର କୋନ ସନ୍ତାନକେଇ ପିଛନେ ଫେଲେ ଯେତେ ରାଜି ଛିଲେନ ନା ।

ମାତ୍ର ଦୁଇ ସଙ୍ଗାହ ସମୟେର ମଧ୍ୟେଇ ତାଦେର ବେଶ କରେକବାର ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାତେ ହେଲାଛିଲ, କାରଣ କେଉଁଇ ଏହି ପରିବାରଟିକେ ବେଶ ଦିନ ଆଶ୍ରୟ ଦେଓୟା ନିରାପଦ ମନେ କରଛିଲ ନା । ଢାକାର ଏକଟ ଦୈନିକରେ ସମ୍ପାଦକ ତାଦେର ବସବାସେର ଠିକାନା ଜାନାର ଦିନଇ ସାମରିକ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ତାଦେର ଥୁଜେ ପାଯ । ଏଟି ହ୍ୟାତେ ଓଧୁଇ କାକତାଲୀୟ ଘଟନା ।

ପରେର ନନ୍ଦ ମାସ ଛିଲ ଦୁଃଖପ୍ରେମର ମତ । ଯେ ସେନା ସଦସ୍ୟରା ପାହାରାର ଦାୟିତ୍ବେ ଛିଲ ତାରା ସାରା ରାତ ବାଡ଼ିର ଟେରେସେ କୁଚକାଓୟାଜ କରାତେ, ତାଦେର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବାସାର ବାତି ଜ୍ଞାଲାତୋ ବା ନିଭାତୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେ କୋନ କଙ୍କେ ପ୍ରବେଶ କରାତେ, ବେଗମ ମୁଜିବକେ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରାତେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେନା ସଦସ୍ୟ ତାର କନ୍ୟାଦେର ପ୍ରଶ୍ନ କରାତେ, “ଆପନାଦେର ମା କି ହିନ୍ଦୁ ନନ୍ଦ?” ସେନାର ବଲତେ ତାଦେର ମାଓ ତାଦେର

বাবার মতোই টুঙ্গিপাড়ার শেখ। তারা বলতো “আমরা জানি তিনি আসলে কোলকাতা থেকে আগত একজন হিন্দু।” শেষ পর্যন্ত অনেক সেনা সদস্য বিশ্বাস করতো বেগম মুজিব একজন হিন্দু, যদিও তারা তাকে নামায আদায় করতে এবং রময়ান মাসে রোয়া পালন করতে দেখেছিল।

এই লোকগুলো এতেও নির্বোধ ছিল যে তারা বিনা প্রশ্নে সবচেয়ে অন্তর্ভুক্ত মিথ্যাগুলোও বিশ্বাস করতো।

এ কারণেই এটা অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে বেগম মুজিব সেনা সদস্যদের অপহন্দ করতেন এবং তাদেরকে মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বেগম মুজিবের সেনা সদস্যদের প্রতি বিদ্যমান থেকে গিয়েছিল।

প্রায়ই তিনি প্রহরীর দায়িত্বে থাকা সেনা সদস্যদের দেখিয়ে শেখ মুজিবকে বলতেন, “এই লোকেরাই একদিন তাদের অন্তর্ভুক্ত তোমার দিকে তাক করবে।”

এমন লোকেরা বিপদজনক

যখনই মোস্তাক মুজিবের বাড়িতে খাবার খেতেন তখন মুজিব কৌতুক করে তার স্ত্রীকে বলতেন, “মোস্তাকের চেহারায় একটা দুর্বল আৰ ক্ষুধার্ত ভাব আছে। তার দিকে বিশেষ সৃষ্টি মাথারে, সে যেম কখমোই ক্ষুধার্ত মা থাকে। সে দিমে মাত্র একবার খাবার খায়।”

মুজিব ছিলেন একজন উচ্চল মানসিকতার ব্যক্তি, যার রসিকতায় তরা হাসি সবার হৃদয়কে উষ্ণ করতো। মোস্তাক ছিলেন একজন রেখে ঢেকে কথা বলা মানুষ, যার ধূর্ত হাসি যে কাউকে অব্যক্তিতে ফেলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যাসনের পর পর জয়প্রকাশ নারায়ণ মোস্তাকের কথা স্মরণ করে বলেন, ‘একজন গড় উচ্চতার হালকা পাতলা লোক যার মাথায় সব সময় একটি অবাঙালীসুলভ টুপি থাকতো।’ মোস্তাকের টুপি তার ব্যক্তিত্বের অংশ ছিল। ঢাকার একজন ব্যাংকার মোস্তাককে তার টুপির কারণে ‘টুপিওয়ালা’ বলে সমোধন করতেন। অনেকেই সে সময় টুপি পড়তেন, কিন্তু মোস্তাকের টুপি ঐ ব্যাংকারকে পাকিস্তান আমলের কথা মনে করিয়ে দিত, যা তিনি সব সময় ভুলে থাকতে চাইতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছু সময় পরই ঐ ব্যাংকার তার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষাকে বলেন যে, “মোস্তাক এখনও একজন মুসলিম লীগের রয়ে গেছেন, একজন প্রাচীনপন্থী।”

মূল মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে ১৯৪৯ সালে যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় মোস্তাক ছিলেন তার একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নতুন দলটির সদস্যরা সবাই আগের মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার লোক ছিলেন এবং বামপন্থীরাও ছিলেন। স্বাই এ দলটিকে আওয়ামী লীগ বলতেন, আওয়ামী মুসলিম লীগ নয়। এটি একটি আঘাতিক রাজনৈতিক দল ছিল যা ক্রম বর্ধমান বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করত ‘এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এই দল গঠনে ইকন যুগিয়েছিল।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালী প্রথম তাদের মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছিল। দুই বছর পর জনতা প্রদেশ থেকে মুসলিম লীগ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করে নির্বাচনের মাধ্যমে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনের মোড় ঘূরাবার মত ঘটনা ছিল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা এই অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবুও যেহেতু স্বাধীনতার জন্য বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে বুঝতে গেলে এই নির্বাচনগুলো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন তাই এখনে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

মুসলিম লীগ নিজেদেরকে পাকিস্তানের একমাত্র রাজনৈতিক কর্তৃত মনে করতো এবং নির্বাচনে জোড় প্রচারণা চালানোর জন্য তারা পঞ্চম পাকিস্তান থেকে নেতাদের নিয়ে আসে এবং হানীয় মোস্তাদের হাত করে নেয়। তাদের নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান অঙ্গ ছিল 'ভারত বিদ্রহ'। আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং আরও দুটি দলের সমন্বয়ে গঠিত মুজফ্ফরের ২১ দফা বিশিষ্ট একটি মেনিফেস্টো ছিল। এটি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির (ভাষা শহীদ দিবসের) চেতনা থেকে উৎসরিত ছিল এবং উদীয়মান বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এ মেনিফেস্টোর মূল প্রতিশ্রূতি ছিল প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ব্যবস্থা এবং পরবর্তী সংস্কার বিষয় ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে প্রদেশের সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত্ব শাসন।

মুসলিম লীগ সরকার নির্বাচনের আগে আগে বিরোধী মতের শত শত ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীকে আটক করে। এরপরও শ্রেবাংলা একে ফজলুল হক, মাওলানা খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বাধীন যুক্তফুন্ট পূর্ব পাকিস্তানের ২৩৭ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২০৮ টিতে জয়লাভ করে মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে (সে সময় সংসদে ৩০৫ টি আসনের মধ্যে ৭২ টি সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ ছিল)। মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে জয়লাভ করেছিল। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব বাংলার কিংবদন্তী নেতা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন, কিন্তু ততদিনে তার সরকারের বিরুদ্ধে ঢকান্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল। *

১৯৫৪ সালের ২৮ মে করাচীতে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে ফজলুল হক প্রদেশের সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত্ব শাসন দাবি করেন। পরের দিনই কেন্দ্রীয় সরকার তার বিরুদ্ধে প্রদেশের স্বাধীনতার দাবি জানানোর অভিযোগ আনে।

ফজলুল হক বলেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের একটি স্বায়ত্ত্ব শাসিত অংশ হওয়া উচিত। এটা আমাদের আদর্শ এবং আমরা এর জন্য লড়াই করব। আমি কখনোই স্বাধীনতা আমাদের আদর্শ এমন কথা বলিনি।"

ফজলুল হক দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তারপরও তিনি আর তার মন্ত্রীসভার সভীরারা পঞ্চম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার দাবি করেননি বলে ঘোষণা করেন। এরপরও তারা রক্ষা পাননি। নিউ ইয়র্ক টাইমসের পাকিস্তানের প্রতিনিধি ফজলুল হক তার সাথে আলাপকালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা বলেছেন বলে যে বক্তব্য দেন তার ডিপ্টিতে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগড়ার মোহাম্মদ আলী, ফজলুল হকের মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করেন; খাজা নাজিমুন্দীনের পরিবর্তে মোহাম্মদ আলীকে ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে থাকা অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। লম্পট হিসেবে মোহাম্মদ আলীর কুখ্যাতি ছিল। অন্য দিকে ফজলুল হককে বাংলার বাঘ (শের-এ-বাংলা) বলা হত। লম্পট কর্তৃক বাঘকে পদচারণ করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম বারের মত জনগণের ভোটে নির্বাচিত মঙ্গীসভার হায়ীত্ত ছিল মাত্র ৫৭ দিন। কেন্দ্রীয় সরকার ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা বাতিল করে পূর্ববঙ্গে গর্ভনরের শাসন জারি করে।

নতুন গর্ভনর হিসেবে মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা দায়িত্ব নেন। তখনও তিনি প্রতিরক্ষা সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

গর্ভনর হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার একদিন আগে সংবাদ সংযোগে ইসকান্দার মির্জা বলেন যে ভারতীয় চর এবং কম্যুনিস্টরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং যুক্তফুন্ট নেতারা পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের সাথে যুক্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি তৃষ্ণিকি দিয়ে বলেছিলেন, “প্রয়োজন বোধে জাতীয় সংহতি রক্ষার্থে সেনাবাহিনী দশ হাজার মানুষকে হত্যা করতেও বিধার্থিত হবে না।”

১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের ৩০ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করে।

ফজলুল হকের মঙ্গীসভা বরখাত্ত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ ঘটে। মুসলিম লীগ সরকার এবং কেন্দ্র এখানকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার যে সামান্য দাবি আগে করতে পারতো সে সুযোগও তারা হারিয়ে বসে, তারপরও তারা ক্ষমতা আৰুকড়ে থাকতে চায়। ১৯৫৫ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়েছিল তা মানা হয়নি।

১৯৫৪ সালের শেষ নাগাদ আওয়ামী মুসলিম লীগের সিংহভাগ সদস্য মনে করলেন দলের নামে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাধা সৃষ্টি করছিল এবং এটি বাদ দেয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু মোত্তাকের মতে দলটি মূলত ‘মুসলিম’ যার সাথে পরে আওয়ামী শব্দটি যোগ করা হয়েছে মাত্র। যখন ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল চলাকালীন ৮০০ জনেরও বেশি কাউন্সিলর ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেয়ার পক্ষে রায় দেন, তখন মোত্তাক এবং আন্দুস সালাম খান সভা ত্যাগ করেন।

অনেক লেখক দাবি করেন মোত্তাক এ সময় ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেন। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ঐ দলে মোত্তাকের স্থান হয়নি। তিনি প্রথমে আন্দুস সালাম খানের নেতৃত্বাধীন ২২ জনের একটি উপদলে যা তখনো নিজেদের আওয়ামী মুসলিম লীগ বলে দাবি করছিল তাতে যোগ দেয়ার কথা ভাবলেও পরবর্তীতে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে তা আর করেন নি। এই বিচিত্র উপদলটি খুব শিক্ষাই আরও বিড়ক হয়ে যায় এবং ১৯৫৮ সালের পরে তাদের কথা আর খুব একটা শোনাও যায়নি।

মোত্তাক মনে মনে একজন মুসলিম লীগারই খেকে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান চারটি স্তরের মধ্যে একটি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। ১৯৭১ সালে

পাকিস্তানের মৌলবাদী শক্তির সাথে লড়াইয়ের চেতনা থেকেই এটি হয়েছিল। কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতা শব্দটি শুনলেই মোতাক ক্ষিণ হয়ে উঠতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই মাসেরও কম সময় পরে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিকের সাথে আলাপ কালে মোতাক বেশ কুকু হয়েই বলেন, “আমরা সংবিধানে সমাজতন্ত্রের কথা বলেই প্রমাণ করেছি যে আমরা অসাম্প্রদায়িক। ফলে এখন অসাম্প্রদায়িকতা শব্দটি নিয়ে এত উত্তেজনার কি দরকার?”

মোতাক নিজে অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না এবং সমাজবাদ তার কাছে কথার কথা ছিল।

ঢাকার একজন নারী চিকিৎসক ঠিকই লক্ষ করে ছিলেন যে মুজিব নগর সরকারের গ্রন্থ ফটোগ্লোতে মোতাককে মোটেও এই সরকারের একজন মনে হচ্ছিল না, বরং একজন বহিরাগতের মত লাগছিল।” তার কথাই ঠিক। মোতাক যখন সামনের সারিতে থাকতেন তখনও মনে হত তিনি যেন পেছনে আছেন, ঠিক যেন উনি মুজিব নগর সরকারে তার সভীর্দের সাথে একসাথে চিহ্নিত হতে চাইছিলেন না এবং এ কারণে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছিলেন। ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান তার পাকিস্তান দিবসের (২৩ মার্চ) বাণীতে উল্লেখ করেন- “পূর্ব এবং পশ্চিমের প্রতিনিধিদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন এবং একের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যেন একই জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে যেতে পারেন সেজন্য মঞ্চ এখন প্রস্তুত।”

এই বার্তার ড্যাবহতা আলাজ করাটাও কঠিন। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে ছিল না, মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে ছিল আঘাসনের। ‘অপারেশান ট্রিভ্যুন’ যাকে যথোর্থভাবে ‘অপারেশান জেনেসাইড’ বলা হয়ে থাকে, সেই অভিযানের জন্য তখন চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছিল। ড্যাক্টর হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান সব পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঢাকা ছাড়তে বলেন। ‘আতশবাজি’ দেখার জন্য তখন ভূট্টোই ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন।

শওকত হায়াৎ খান ঢাকা এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে আগামসি লেনে মোতাকের বাড়িতে যান। তিনি খুবই উত্তেজিত ছিলেন, তার কাছে খবর ছিল ঢাকায় বড় ধরণের সামরিক অভিযান চালানো হবে এবং এটি খুব বড় ধরণের অভিযান হতে যাচ্ছে। তিনি মুজিবের কাছে এই বার্তা পৌছে দেয়ার জন্য এবং তার সালাম জানানোর জন্য মোতাককে বলেছিলেন, মুজিবের সাথে নিজে দেখা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

শওকত হায়াতের বার্তা ‘তড়িঘড়ি’ করে মুজিবের কাছে পৌছে দেয়ার পথে মোতাক সিটি নার্সিং হোমে থেমে তার বন্ধু ড. টি. হোসেইনকে খবরটি জানিয়ে যান।

যত আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে মুজিবের ২৫ মার্চ ১৯৭১ এ সেখা হয়েছিল তাদের সবাইকে মুজিব তাদের ঢাকা ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। নেতারা ঢাকা ত্যাগের আগেই সেনা বাহিনীর অভিযান শুরু হয়ে যায়, তবে তারা সবাই নিজ গৃহে না থাকার সতর্কতা অবলম্বন করতে পেরেছিলেন।

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ সকালে যারা নিজেদের রেডিও বা ট্রান্সমিটার সেট ঢালু করেন তারা সেনাবাহিনীর এই মেসেজটি শনতে পান: “বড় পাখিকে ঝীচায় ডরা হয়েছে। অন্য পাখিরা তাদের বাসায় নেই।” সেনাবাহিনীর অন্য একটি মেসেজে বলা হয়, “টি উড়ে গেছে।” মুজিব ছিলেন বড় পাখি, আর টি বলতে তাজ উদ্ধীনকে বোঝানো হয়েছে।

২৭ মার্চ সকালে যখন অল্প সময়ের জন্য কারফিউ শিথিল করা হয় তখন তাজ উদ্ধীন ভারতে চলে যান। সকল আওয়ামী লীগ নেতাই প্রথম সুযোগে ঢাকা ছাড়েন।

কিন্তু সব আওয়ামী লীগ নেতা ঢাকা ছাড়ার একদিন পর ২৮ মার্চ মোস্তাককে ‘উদ্ধার’ করতে হয় এবং তার বকু ড. টি. হোসেইন এর সিটি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। জাতীয় সংসদে যে আওয়ামী লীগের নিরঙুশ সংগ্রাগরিষ্ঠতা ছিল, সেই দলটি মোস্তাককে তাদের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে মনোনয়ন দেয়। সেনাবাহিনী যখন এমনকি বুঞ্জিজীবীদেরকেও খুজছিল তখন কি তারা মোস্তাককে তার বাড়িতে খুজতে যায়নি?

মোস্তাক সিটি নার্সিং হোমে দশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন, এমনকি ড. রব নামে একজন অবাঙালী চিকিৎসক তাকে দেখে ফেলার পরও।

যাই হোক, ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল কোলকাতার সর্ব ভারতীয় বেতার থেকে এক সম্প্রচারে জানানো হয় কিছু কিছু ভারতীয় নেতা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানাচ্ছেন। মোস্তাক এবং তার বকু হোসেইন এ থেকে ধরে নিয়েছিলেন যে ভারত যে কোন সময় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে, এমন কোন ঘটনা ঘটলে তারা এর সুবিধা থেকে বক্ষিত হতে চান নি। হোসেইন তখন মোস্তাককে বলেন, “দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য নার্সিং হোমে আসবেন না, বরং কাউকে তাদের কাছে পিয়ে দাবি জানাতে হবে।” বিকেলে মোস্তাক হোসেইনকে বলেন, “তুমি কি সত্তিই মনে করছ আমার দেশের বাইরে যাওয়া উচিত?” জবাবে হোসেইন বলেন, “আমি নই তুমই রাজনীতিবিদ। কিন্তু আমি দেশভ্যাগের বিষয়ে মনস্তির করে ফেলেছি এবং আমি তোমাকে পুরোটা পথ যেতে সাহায্য করতে পারবো।”

ঢাকায় মোত্তাকের অবস্থান করাটা কোনওভাবেই গোপন থাকার কথা নয়। সিটি নার্সিং হোমে অন্তত ৫০ জন ব্যক্তি ছিলেন যাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী লীগ বিদ্বেষী ছিলেন। যুক্ত ঢাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের উপদেষ্টা ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী। চৌধুরী যখন জানতে পারেন মোত্তাক ঢাকাতেই আছেন তিনি মোত্তাকের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন, কিন্তু ততদিনে মোত্তাক ভারত চলে গিয়েছিলেন।

হামিদুল হক নিচ্যই অন্য কোন আওয়ামী লীগ নেতা, যেমন ধরা যাক তাজ উচ্চীনের সাথে যোগাযোগ করার সাহস দেখাতেন না।

হামিদুল হক মোত্তাকের চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন, আপাত দৃষ্টিতে তাদের দুজনকে দুই বিরোধী শিবিরের লোক মনে হলেও তাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল।”

ভারতে পৌছেই তাজউদ্দীন চিংকার করে বলছিলেন, “আমরা লড়াই করতে চাই, আমরা লড়াই করতে চাই।” তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল “কিভাবে?” এ প্রশ্নের জবাব তার কাছে না থাকলেও তিনি দৃঢ়তার সাথে বলে ছিলেন, “আমরা লড়াই করব।” অনেকেই তাজউদ্দীনের কথা শুনে সে সময় হেসেছিলেন, কিন্তু অনেক প্রতিরোধ যুক্তই “আমরা লড়াই করব” এমন অবুরু আর্তনাদ দিয়ে শুরু হয়েছে।

মোত্তাকের চিন্তা ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। তিনি ভারতে গিয়েছিলেন ‘বঙ্গ আর সতীর্থদের সহায়তায় সীমান্তের ওপারে একটি সরকার গঠন করার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে।’ হঠাৎ তার মাথায় এটা খেলে গিয়েছিল যে যদি জাতীয় সংসদ অধিবেশন চালু হয় তাহলে তিনি স্পিকার হবেন। হোসেইন আগরতলায় গিয়েছিলেন তার বঙ্গ মোত্তাকের অস্থায়ী সরকার গঠনের দাবি নিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে, এই সরকার হবে বাংলাদেশের সরকার, তার মতে যে দেশটির স্থীরতা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই সর্ব ভারতীয় বেতারের সম্প্রচারের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এটা অবাক করার মত বিষয় হতে পারে যে মোত্তাক আর তার বঙ্গ হোসেইন একটি সংবাদ সম্প্রচারকে ভারত সরকারের অবস্থান মনে করে ভুল করবেন। কিন্তু তারা যদি বাংলাদেশকে স্থীরতা দেয়া সংক্রান্ত সম্প্রচারটি ভুল না বুঝতেন তাহলে ৭ এপ্রিল সেনাবাহিনীর ধর্মসংবলের ১২ দিন পর তারা কি ঢাকা ত্যাগ করতেন?

বেশ অনিছার সাথেই মোত্তাক অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ঠিকই তার পদাধিকারের সুযোগ নিয়েছিলেন। মার্কিন কূটনীতিক এবং আরও যেসব কর্মকর্তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে ফাটল ধরাতে চাইছিলেন তারা মোত্তাকের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

পরে মোত্তাক দাবি করেছিলেন মার্কিন কূটনীতিকদের সাথে যোগাযোগ করে তিনি আসলে জানতে চাইছিলেন বাংলাদেশ বিষয়ে ওয়াশিংটনের চিন্তা ভাবনা কী ছিল। এটি একটি ভিত্তিহীন তথ্য, বিশেষত যখন দিল্লীতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং এবং ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল এ দাবির কারণে অপমানিত বোধ করেন। মোত্তাকের এ ব্যাখ্যা আরো হাস্যকর হয়ে ওঠে যখন তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি কিসিঞ্চার জানান যে, ভারত যুক্ত যুক্ত হওয়ার সময় তারা “পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে সমরোতার ব্যাপারে কোলকাতাভিত্তিক বাংলাদেশের নেতৃত্বকে প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলেন।”

কিসিঞ্চার ‘কোলকাতাভিত্তিক বাংলাদেশী নেতৃত্ব’ বলে ইঙ্গিত করেছিলেন মোত্তাকের দিকে, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অপর চার সদস্য—ভারপ্রাণ রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, এম. মনসুর আলী বা এ. এইচ. কিট. আশিকুজ্জামানের বিষয়ে কিছু বলেন নি।

ডেইলি টেলিগ্রাফ অফিচার ধাপে, “এখন সমাধানে পৌছার একমাত্র উপায় হল মুজিবের গোপন বিচার প্রক্রিয়া, এবং তার জন্য সময়ও এখন ফুরিয়ে আসছে।” বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার এবং পাকিস্তানি সরকারের মধ্যে যে কোন আলোচনা শুরু হওয়ার আগে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিতে হবে। ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগ জানায় আগ্রহতলা ঘড়্যন্ত মামলায় কারাবন্দী থাকা মুজিবই কেবল মাত্র রাষ্ট্রপতি আইন্সুব খানের ডাকা গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত থাকা জোসেফ ফারল্যান্ড, জেনারেল ইয়াহিয়ার বন্ধু ছিলেন। তিনি ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন যে মার্কিন কর্তৃপক্ষ মনে করেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি হলেন শেখ মুজিব। এরপরও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে কারাবন্দী থাকা শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে মোত্তাকের সাথে সমরোতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৭১-এর ৪ সেপ্টেম্বর, ফারল্যান্ড ইয়াহিয়াকে জানান যে, মার্কিনিয়া তাদের ‘চমৎকার অফিসগুলোর সহায়তায় পাকিস্তান সরকারের সাথে প্রবাসী বাঙালী সরকারের গোপন বৈঠক আয়োজন করছে।’ তিনি ইয়াহিয়ার কাছে যে নামটি জানিয়েছিলেন তা হল মোত্তাক।

সাবেক এফ বি আই এজেন্ট ফারল্যান্ড আসলে ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন যেন মার্কিন ‘চমৎকার অফিস’গুলোর সহায়তায় মোত্তাকের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে অন্তর্ধাতমূলক তৎপরতা চালাতে।

ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তা পরে কানেক্জি গবেষকদের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, “বাঙালীর মধ্যে এমন কিছু বাক্তিত্ব ছিলেন যারা বিশেষ বিশেষ পদে অবস্থান করেছিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছেও তাদের

এহশয়োগ্যতা ছিল; এই সব ব্যক্তিরাই আমাদের (মাকিনিদের) মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিলেন।”

এই বাঙালী ব্যক্তিরা হলেন মোস্তাক এবং তার লোকেরা।

এসব ঘটনা থেকেই ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের খৎস্যজ্ঞের ১৩ দিন পরও মোস্তাক কেন ঢাকায় ছিলেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি পাকিস্তানি সরকারের কাছে এহশয়োগ্য ছিলেন।

ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ঐ কর্মকর্তা কানেজি গবেষকদের কাছে এটা জানাতে অধীক্ষিত জানান যে ঠিক কোন সময়ে বিশেষ পদাধিকারী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ডেতরের লোকদের সাথে মার্কিন কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ হয়। এটা জানালে আসলে অনেক বেশি কিছু বলা হয়ে যেত।

তাদের সাথে প্রথম যোগাযোগ করা হয়েছিল এমন কি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ারও আগে।

ওয়াশিংটন পোস্ট ১৯৭১-এর ১১ ডিসেম্বরে কিসিঞ্চারের বক্তব্য হিসেবে ছাপে, ‘বোৰা যাচ্ছিল একবার সমর্থোত্তার জন্য সংলাপ শুরু হলে অবধারিতভাবেই কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে মুজিবের মুক্তির বিষয়টি সামনে চলে আসবে এবং এ কারণেই আমরা যে কোন কিছু শুরুর আগে সংলাপ অসম্ভব করার বিষয়ে ভীষণ রকম অস্থায়ী হিলাম।’ কিসিঞ্চারের বক্তব্যের অসারতা এমনকি ‘কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর’ বলার পরও চেকে রাখা যায়না। কারণ এই ‘কিছু সময়ে’র মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে, এমনকি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের গতিধারাও বদলে যেতে পারে।

জাতিসংঘের সহকারী মহাপরিচালক পল মার্ক হেবরি, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় ঢাকায় থাকা জাতিসংঘ মিশনের প্রধান ছিলেন। তিনি যথার্থই তখনকার অবস্থা ব্যাখ্যা করেছিলেন। জ্যোৎ এতারসনকে তিনি বলেন, “আমরা স্টালিনয়াদের সম পর্যায়ের একটা ট্র্যাজেডি ঘটিবে বলে আশঙ্কা করেছিলাম।”

এটি একটি ব্যাপক ক্ষতিকর যুদ্ধ হতে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে ‘পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে’ হস্তপে না করতে ভারত বাধ্য হত। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিনি ও চীনের সাথে একটি ‘ত্রিমুখী লড়াই শুরু করতে বাধ্য হত’।

মূল লক্ষ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকিয়ে দেয়া।

যখন বোৰা যাচ্ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ এখন ওধু সময়ের ব্যাপার মাত্র, তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে থাকা বিদেশী শক্তিগুলো স্বাধীনতা ঠেকাতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। যে সমস্ত রাষ্ট্র ‘বাঙালীদের নির্বিচারে হত্যার বিষয়ে কথা বলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করতে’ চাইছিল না, তারা সবাই হঠাৎ করেই

মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। 'ভারতীয় কৌশল' সম্পর্কে মন্দনের গার্ডিয়ান পত্রিকার একটি উচ্চমানের কিষ্ট উদ্দেশ্য প্রশংসিত সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, "এসব কৌশল বড় ধরণের মানসিক দুর্বোগ সৃষ্টি করবে, কারণ ইয়াহিয়া কোন অবস্থায় ব্যাপক ব্যক্তিগত অপমান সহ্য করে মুজিবকে মুক্ত করবেন না, আর অন্যদিকে মুজিবকে ছাড়া বাংলাদেশ ভেঙে পড়বে।" এটি ছিল একটি সরাসরি হমকি। গার্ডিয়ান মুজিব বা বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত ছিল না। পত্রিকাটির একমাত্র চিন্তা ছিল এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি। পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলার আগেই ভারতকে থামাতে হতো। পত্রিকাটি চাইছিল পরাশক্তিগুলো যেন ভারতের সামনে 'বাত্তব রাজনীতি' নিয়ে আসে, যাতে করে এসব ঘটনা ঘটা বন্ধ করা যায়। পত্রিকাটি প্রশংসন রাখে, "এশিয়ার নিরাপত্তার কি হবে, যদি পাকিস্তান খণ্টিত হয়ে যায়?"

এমনকি ১৯৭১-এর নড়েছরের শেষ সপ্তাহেও অনেক পত্রিকার প্রতিনিধিত্বা 'পূর্ব পাকিস্তান সংকটে'র শাস্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ইয়াহিয়াকে আরও সময় দেওয়ার দাবি জানাচ্ছিলেন। তাদের এ দাবি, কিসিঞ্চারের সংকট সমাধানে আরও সময় চাওয়ার দাবির মতোই হাস্যকর ছিল, কিষ্ট তারা এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করছিলেন যে, ইয়াহিয়া এমন ব্যক্তি ছিলেন না যাকে বল প্রয়োগ করে কোন কাজ করতে রাজি করানো যাবে। নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া এমন লোক ছিলেন না। কিষ্ট বাঙালীর ভাগ্যে কি ঘটতো?

মার্কিনিয়া ইয়াহিয়ার প্রতি খুবই সম্মতী ছিল, তারা লাখো বাঙালীর দুর্দশা নিয়ে নয়, বরং 'একজন পুরোনো মিঠা'র দুচিন্তা নিয়ে বেশি সচেতন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পালনকারী টি. এন. কাউলের মতে মার্কিনিদের পরিকল্পনা ছিল বছর দুয়েক সময়ের মধ্যে সমস্যার শাস্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান করা। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তান সম্ভবত আরো কয়েক লক্ষ বাঙালী হত্যার মাধ্যমে তার বাঙালী 'নির্ধন' অভিযান শেষ করে আনতে পারতো।

কিসিঞ্চার ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেও মুজিবের মুক্তির বিষয়ে তার অবস্থান অস্পষ্ট রেখেছিলেন, কিষ্ট নিজের আত্মীয়বন্নী হোয়াইট হাউস ইয়ারস-এ তিনি খুব দক্ষতার সাথে তার এই অবস্থান চেপে গিয়েছিলেন। তার দাবি মতে, "মার্কিন কর্তৃপক্ষ যে সময়সীমা মেনে নিতে ইয়াহিয়াকে রাজি করাতে সমর্থ হয়েছিল, সেটি অনুসারে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পাকিস্তানে সেনা শাসন অবসান হয়ে বেসামুরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করতো এবং এর ফলে অবধারিতভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন এবং শাধীনতা সম্ভব হতো। তার আত্মীয়বন্নীতে তিনি আরও লিখেছেন, "আমি মার্চ মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন আর তার অল্প সময় পরে শাধীনতা আসবে বলে মনে করছিলাম আগে থেকেই।"

তার প্রতারণা করার ক্ষমতা অবাক করার মত।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সংসদে ৩০০ আসনের ১৬৭ টিতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতে জয়লাভ করেছিল। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের ৭৮টি এবং প্রাদেশিক সংসদেও ৮৮টি আসন শূন্য ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে এসব আসনে উপনির্বাচন হওয়ার কথা।

ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)’র করাচীর সচিব মেরিয়াজ মোহাম্মদ খান ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ‘আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে’র জন্য যে পিপিপি প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসে তাতে প্রথমে থাকলেও পরে তিনি সরে দাঢ়ান। তার মতে কার্যত ক্ষমতা ‘যখন গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যারা ইতিমধ্যেই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাদের কাছে চলে গিয়েছে’ তখন এই সফর করা অর্থহীন।

এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের কটুর ডানপাণ্ডী দল জামায়াত-এ ইসলামী’র নেতা অধ্যাপক গোলাম আয়মও বলেছিলেন, “এখন পরিস্থিতি এমনই যে আগামী ছয়মাস বা তারও বেশি সময়ের মধ্যে নির্বাচন বা অন্য কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করা অসম্ভব।” কিন্তু তখন আসলে নির্বাচন করার কেনা প্রয়োজন ছিল না। সেনাবাহিনী খুব সতর্কতার সাথে প্রার্থী নির্বাচন করেছিল, কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৫৮ জন প্রার্থী, আর প্রাদেশিক সংসদের জন্য আরও ৫০ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন প্রার্থী দাবি করেন তিনি তার নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের খবর সংবাদপত্রে রিপোর্ট পড়ে জানতে পারেন।

সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর পিআরও হিসেবে দায়িত্বে থাকা মেজর সিদ্দিক সালিক বলেন, “আসলে সংসদীয় আসনগুলো জেনারেল ফরমান আলী ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়েছেন।”

বাংলাদেশ উপর ১৯৭১-এর মার্চ হত্যাকাণ্ড চালানোর পর যে সমস্ত ডানপাণ্ডী দলগুলো পাক বাহিনীর প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখিয়েছিল, জেনারেল ফরমান তাদেরকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

এই দলগুলো ১৯৭০-এর নির্বাচনে মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করেছিল।

নিউ ইয়র্ক টাইমস ২০ অক্টোবর ১৯৭১ এ ছাপে, “বাংলাদেশ নেতা শেখ মুজিবকে কারাবন্দী করা এবং তার গোপন বিচার, ১৯৭০ এর নির্বাচনে যে আওয়ামী লীগ ব্যাপক বিজয় পেয়েছিল, সেই দলটির নেতা কর্মীদের উপর অত্যাচার ইত্যাদির কারণে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের ডাকা নির্বাচন কার্যত একটি কৌতূহল ঘ৾র্ম।”

সালিক এই নির্বাচনকে ‘প্রতারণা’ বলেছিলেন; এই সালিক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পিআরও হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জেনারেল টিক্কা খানের পরিবর্তে ওয়াশিংটনের পরামর্শে ড. এ. এম. মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে সামরিক সরকার নিয়োগ দিয়েছিল। উপনির্বাচন সম্পর্কে ড. মালিকের বক্তব্য ছিল, “এই উপনির্বাচনের অনেক ভুলচূটি ছিল, কিন্তু একদম কোন কিছু না হওয়ার চেয়ে এটি ভালো ছিল।”

১৯৭১-এর অঞ্চলের গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখে, “অধস্তন সহযোগী নির্বাচনে ইয়াহিয়া খান বৃক্ষির পরিচয় দিতে পারেন নি।” ড. মালিক, যিনি মনে করেন কোন কিছু না হওয়ার চেয়ে কিছু একটা হওয়া ভালো, তার চেয়ে ভালো আর কে ইয়াহিয়ার সহযোগী হতে পারতেন? তিনি জিন্নাহ'র আনুকূল্য লাভ করেন, কারণ যখন ১৯৪৮ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করছিল তখন তিনি তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে জিন্নাহ'র কাছে অভিযোগ করেন। এই বিশাসংঘাতকার পূরক্ষার হিসেবে ড. মালিককে রাষ্ট্রদূত সমর্থনাদার পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। সেই সময় থেকে যখনই কোন কদর্য কাজ করার দরকার পড়েছে তখনই পঞ্চিম পাকিস্তানি উন্নিসিক শাসকরা এই ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেছেন।

পাকিস্তানি বাহিনী আঙ্গসমর্পণের সময়ও মালিক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে দেশের প্রশাসন চালাচ্ছিলেন তার সেনা সচিব মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি।

একবার মালিকের আঙ্গীয়াকে পাকবাহিনীর কয়েকজন জওয়ান ধর্ষণ করলে, তার আঙ্গীয়ার এ বিষয়ে তাকে কোন একটা ব্যবস্থা নিতে বললে, তিনি রাও ফরমান আলীর সাথে যোগাযোগ করেন। তখন রাও ফরমান তাকে বলেন, “সেনা সদস্যরা সেনা সদস্যের মতোই আচরণ করছে। তাদেরকে সবকিছু ঠিক করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা যদি আমার কোন আঙ্গীয়াকে ধর্ষণ করতো তাহলেও আমি কিছু ঝুঁতে পারতাম না।”

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর যখন ফরমান আলী পূর্বের ফ্রন্টে যুদ্ধবিপত্তির প্রস্তাৱ দেন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ঘোষণা দেন তখন আসলে তিনি কালক্ষেপণ করতে চাইছিলেন, যেমনটি তার নয় মাস আগে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খান করেছিলেন। ফরমান আলি সালিকের কাছে শীকার করেন যে তিনি আসলে যুদ্ধবিপত্তি চাইছিলেন যাতে করে সময় পাওয়া যায় যে সময়ে পাক সেনারা ‘নিজেদের পুনঃপ্রস্তুত করে নতুন উদ্যোগে হামলা করতে পারে’। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি বলতে তিনি ঐসব ‘পাকিস্তানপক্ষী বাঙালী এমএনএ এবং এমপিএন্ডের’কে বুঝিয়েছিলেন যারা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে বা ১৯৭১ সালের উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন।

এছন্কি মঙ্গী পর্যায়ের নিয়োগ দিয়েও পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের পক্ষে দুই একজন বাদে বাকি আওয়ামী সীগের সাংসদদের (কেন্দ্রীয় বা আতীয় পরিষদের)

মন জয় করা সম্ভব হয়নি। যেসব বিশ্বাসঘাতক সাংসদ পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়েছিলেন তাদের জনগণ বর্জন করেছিল এবং তাদেরকে সবসময় কড়া সেনা প্রহরায় থাকতে হত।

ফরমান আলী'র মতে 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি'র সবাই ছিলেন তার নিজের পছন্দ মত বাছাই করা লোক।

বাঙালীরা গভর্নর মালিক আর তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই জানতেন। এই বিশ্বাসঘাতকরা ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর যখন স্বাধীনতা দারণাতে তখন আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার দিনে তারতীয় সেনাবাহিনীর কারণেই তারা জনরোষ থেকে বৈচত্তে পেরেছিলেন।

এটাই সেই বেসামরিক প্রশাসন যার কথা কিসিঞ্চার তার আত্মজীবনীতে বার বার উল্লেখ করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে যে সময় উপনির্বাচনের প্রস্তুতি ঘটেছিল, ঠিক সে সময়ে মার্কিনীরা কোলকাতায় বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের অবশিষ্ট চারজন সদস্যকে বাদ দিয়ে তখন মোতাকের সাথে আপোষ নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাহত করার জন্য একটি দ্বি-মূর্খ চক্রান্ত সে সময় চলছিল।

হেনরি ব্র্যান্ডন, যিনি কিসিঞ্চার এবং নিক্রন দুজনকেই শুব ভালোভাবে চিনতেন, তিনি তার দ্য রিট্রিট অফ আয়েরিকান পাওয়ার এছে উল্লেখ করেন, 'কিসিঞ্চার কোলকাতায় আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মার্কিনীরা বাংলাদেশের ছায়া সরকারের সাথে যে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল সেটিকে যতটা ফলপ্রসূ ভেবেছিল তেমনটি ছিল না।' তাদের কোন 'কর্তৃত বা রাজনৈতিক শক্তি' ছিল না এবং তাদের মধ্যে 'মুজিব এবং অন্যান্যরা পরবর্তিতে তাদের দূরে ঠিলে দিবেন' এমন ভয় কাজ করছিল।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মোতাকের চক্রান্ত উদ্ঘাটিত হয়েছিল ঠিক সময়েই। এ বিষয়টি আনাজানি হয়ে গেলে তা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ক্ষতিকর হবে বলে সে সময় এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করা হয়নি। মাহবুবুল আলম চারীকে পরবর্তী সচিবের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং ১৯৭১ এর নভেম্বর মাসে যে প্রতিনিধি দল তদবীর করার জন্য জাতিসংঘে অনানুষ্ঠানিক সফরে যায় সেটি থেকে মোতাকেকে বাদ দেয়া হয়। মোতাক যদি জাতিসংঘে পৌছাতে পারতেন এবং পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতেন তাহলে হয়তো এমন কোন ঘোষণা দিয়ে বসতেন যার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের অপূরণীয় ক্ষতি হতো এবং তার মার্কিন মিত্ররা এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতেন যে ঐ ঘোষণা ব্যাপক আকারে প্রচারিত হয়।

মোন্তাক আর তার লোকেরা মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ‘তাজউদ্দীন- শেখ মুজিবকে ফিরিয়ে আনতে চান না’ এমন বক্তব্য সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করে বেশ দ্বিধা দ্বন্দ্ব তৈরি করতে সক্ষম হন। কাদের সিদ্ধিকী বলেন, “এটি একটি জগন্য যিথ্যাচার হলেও কিছু সময়ের জন্য এটা কিছু মানুষের মনে সন্দেহ তৈরি করেছিল।”

সে সময় যে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল তা শেষ হয়ে যায়নি, এর ফলে অপ্ররোচিত ক্ষতি হয়েছিল।

যেদিন ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেই ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ তাজ উদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, “আমি সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, আমাদের মহৎ প্রতিবেশিন সহায়তায় শক্তকে পরাজিত করার মধ্য দিয়েই এই সংকট শেষ হয়ে যাবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মাঝে নেই, আর চার লাখ বাঙালী এখনো পঞ্চমে বস্তী। তাদের মুক্ত করার আগে পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।”

মোন্তাকের বক্তব্যে কোথাও মুজিবের উল্লেখ ছিল না। তিনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এতেটাই ভাবিত ছিলেন যে অন্য কিছু নিয়ে ভাবার অবকাশ তার ছিল না। তিনি বলেন, “আমরা আশা রাখি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার মৈত্রীর সম্পর্ক চিরস্থায়ী হবে।” তিনি কোন লজ্জা ছাড়াই ঘোষণা দেন, “গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সমাজবাদের দানবীয় শক্তকে সম্পূর্ণ নিপিছু করার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়ন এবং ভারতের ৫৫০ মিলিয়ন মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্ত করে যাবে।” তিনি এরপরও আরও ঘোষ করেন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের ‘ড্যাক্টর ধ্বংসাত্মক’ ভূমিকার সমালোচনা করার পাশাপাশি, সোভিয়েত ইউনিয়নের ‘জন-বাক্স’ ভূমিকার প্রশংসা করেন।

কিন্তু তার এসব কথা তাকে বাঁচাতে পারেনি, তার সহকর্মীরা কেউই আর তাকে বিশ্বাস করেনি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পনেরো দিন পর ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ যখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব পুনর্বিন্দ করেন তখন মোন্তাকের পরিবর্তে তিনি আনন্দ সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী করেন। এই রাদবদল কাউকেই অবাক করেনি। মোন্তাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকা অবস্থায় যথেষ্ট অপকর্ম করেছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়োসোসিয়েটেড প্রেস লিখে, প্রধানমন্ত্রী তার ‘কমিউনিস্ট বিশেষ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হালে এমন একজনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করেছেন যিনি সোভিয়েত প্রক্রে সাথে সম্পর্ক মজবুত করবেন।’

এই রাদবদলের ফলে, মোন্তাকের দায়িত্বে আসে আইন ও সংসদীয় বিষয়, ভূমি কর ও জরিপ।

এটি একটি অবনতি ছিল। মোস্তাক যর্মাহত হয়েছিলেন, তিনি পদত্যাগ করতে চাইলেও, আসলে এতোটাই ধূর্ত ছিলেন যে তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করার জন্য তিনি খুব বেশি জোড়াজুড়ি করেন নি। মর্ভিসভায় তার সহকর্মীরা সবাই তার বিস্ফুজ্জে ছিলেন এবং মুক্তি বাহিনী তখন একটি যুক্তিশৈলীভাবে ছিল। সরকার থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি বড় বিপদের মুখে পড়তেন। তার অপর্কর্মের কারণে তার প্রতি বাকিদের যে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল, তিনি চাইছিলেন সময়ের সাথে সবাই যেন সেটা ভুলে যায়।

তিনি কালক্ষেপন করছিলেন মাত্র।

যখন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, মুজিব দেশে ফিরে আসেন তখন মোস্তাক তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্ব খেয়ে স্বাগত জানান। তার খুশি হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। ঐ সময়ের আগে পর্যন্ত তার অবস্থা বিপদজনক ছিল। মুজিবের নিরাপত্তায় তিনি আবার শান্তিতে থাকতে পারবেন।

মোস্তাক সব সময় মুজিবের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি প্রায়ই মুজিবের বাড়িতে যেতেন এবং মুজিবের সন্তানরা তাকে চাচা বলে সমোধন করতেন এবং বাইরে থেকে দেখে মনে হত তিনি তাদের খুবই পছন্দ করতেন, বিশেষত মুজিবের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান রাসেলের প্রতি তার স্নেহ উল্লেখযোগ্য ছিল। তার মধ্যে লোক দেখানো ভাব কম হলেও মুজিব পরিবারের সাথে তার ‘স্বর্ধ’ রয়েছে এটা তিনি নানাভাবে দেখাতেন।

১৯৭৪ এর ৩১ মে মুজিবের মা সায়রা খানম মৃত্যু বরণ করেন। ঐদিন এতো ঝড় হচ্ছিল যে হেলিকপ্টারে মুজিবের টুঙ্গিপাড়া যাবার কথা সেটি কয়েক ঘণ্টা আকাশেই উঠতে পারেনি। কিন্তু মোস্তাক বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে মুজিব ও তার পরিবারের টুঙ্গিপাড়া সফরে সঙ্গ দেন। তারা যতক্ষণে টুঙ্গিপাড়া পৌছান ততক্ষণে অনেক বেলা হয়ে যায়। মুজিব তার মায়ের মৃতদেহ ছুঁতে ঢেয়েছিলেন, কিন্তু তার বড় বোন ফাতেমা তাকে অনুমতি দেন নি। মোস্তাক ইতিমধ্যেই স্বার অলক্ষে মুজিবের কাছে চলে গিয়েছিলেন এবং তিনি মুজিবের মায়ের মৃতদেহ ছুঁয়ে ফেলেন। ফাতেমা তার উপর ক্ষুক হয়ে ওঠেন এবং বলেন, “আপনি কি জানেন না এমনটি করা যায় না, আপনি কি মুসলমান না?” তিনি এই তিরকার মাথা নত করে সহ্য করেন। তিনি একজন পীরের সন্তান ছিলেন, এবং তিনি ধর্মের মূল দর্শন না হোক কঠিনভাবে অন্তত ধর্মের রীতি নীতি পালন করতেন, কিন্তু মুজিবের মায়ের মৃত্যুতে তিনি এতোটাই আবেগাত্মক হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি একটি ধর্মীয় অনুশাসন লজ্জন করে ফেলেছিলেন।

মুজিব যখন মক্কাতে চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন হংকং সান্তাহিকে ‘মুজিবের পরে কে?’ শীর্ষক একটি রিপোর্ট লেখার কারণে তাহের উদ্দীন ঠাকুর ঢাকার একজন সাংবাদিকের উপর খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। যদিও কোন অসং উদ্দেশ্যে রিপোর্টটি

করা হয়নি, তারপরও কেউ এমন একটা বিষয় উপাপন করতে পারে এটা ভেবেই তাহের উদ্দীন ঠাকুর শিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বেশ অবাক হয়ে বলেছিলেন, “বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া কেউ বাংলাদেশের কথা ভাবে কিভাবে?”

মোস্তাকও মুজিবের বিষয়ে একই রকম আবেগ দেখাতেন, অন্তত মুজিবের আত্মীয় সজনের সাথে কথা বলার সময়।

তাজউদ্দীন বেশ কিছু সময় ধরেই অসম্ভৃষ্ট ছিলেন এবং মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের কথা ভাবছিলেন। তার কিছু তড়াকাতকী তাকে পরিস্থিতি জটিল করে না তোলার উপরে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঠিক তাই করেছিলেন। ১৯৭৪ এর অক্টোবরে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ দেশের বাইরে থাকার পর তিনি ঢাকায় এসে এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের একটি সাক্ষাৎকার দেন যেখানে তিনি সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি নিশ্চয়ই তখন সরকার থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু মোস্তাক সরকার থেকে তাজউদ্দীনের বেরিয়ে যাওয়াটা নিশ্চিত করতে চাইছিলেন। তিনি মুজিবের একজন আত্মীয়কে বলেন, “এই ঘটনার পর তাজউদ্দীনকে আর মন্ত্রীসভায় রাখা ঠিক হবে না। এটা এখন বঙ্গবন্ধুর মান সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ তাজউদ্দীন নয়তো বঙ্গবন্ধু এখন থাকতে পারেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাংলাদেশের কথা কে ভাবতে পারে?”

একজন বন্ধু মুজিবকে তাহের উদ্দীন ঠাকুর সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মুজিব তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন “সে কার প্রতি অনুগত?” “সে মোস্তাকের অনুগত” বন্ধুটি জবাব দিয়েছিলেন। মুজিবের জবাব ছিল “আর মোস্তাক আমার অনুগত।” এ বিষয়ে কথা এখানেই শেষ হয়েছিল।

এ কথা অনেকেই জানতো যে মোস্তাক মুজিবকে পছন্দ করতেন না। অনেকেই ধারণা করতেন মোস্তাকের পক্ষে সম্ভব হলে তিনি মুজিবকে সরিয়ে দিতেন। তখন মুজিব আর তার আত্মীয় সজনরাই এ কথা জানতেন না।

মুজিবের এক ভাঙ্গী প্রশ্ন রেখেছিলেন, “মোস্তাক কি ইচ্ছে করেই আমাদের প্রতি বেশি বেশি স্বত্যজ্ঞ দেখাতেন, কারণ পুরোটা সময়ই তার মনের মধ্যে কুপরিকল্পনা ছিল?”

জয় বাংলা!

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মধ্যে এমন বিশ্বাস ছিল যে তারা বাঙালীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে শেষ করে নিতে পেরেছে। কিন্তু সত্য হল পাকিস্তানিরাই লড়াই করার মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। ভারত আকস্মিকভাবে বিমান হামলা আরম্ভ করার মাধ্যমে যুক্ত তরু হওয়ার মাঝে চারদিন পর ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ পাকিস্তানিরা যশোর থেকে পিছু হটে, যশোর তাদের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল, এবং তখন থেকে তারা পূর্বের রণাঙ্গনে ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। কিন্তু তারা কোথায় পালাতো? সারাদেশ তাদের জন্য প্রতিকূল ছিল এবং সব জায়গায় তারা মুক্তি বাহিনীর আক্রমণের স্বীকার হচ্ছিল। প্রতিটি খোপ আর নদীর বাঁকে তাদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছিল। তাদের পক্ষে আর লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ঢাকায় জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেলরি'র কাছে একটি নোট হস্তান্তর করেন যাতে তিনি যত দ্রুত সম্ভব একটি যুক্তবি঱্ঠি ঘোষণা করে 'পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের' কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাৱ করেন।

এই নোটে বলা হয়, "যতক্ষণ পর্যন্ত এই যুক্তবি঱্ঠির প্রস্তাৱ কার্যকৰ কৰা না হবে, ততক্ষণ সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রশ্ন আসে না এবং সেনাবাহিনী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে।"

কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ পাকসেনাদের অবস্থা দাঢ়িয়েছিল হয় আত্মসমর্পণ নয়তো মৃত্যু। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তি বাহিনী চারিদিক থেকে ঢাকাকে ধিরে ফেলেছিল।

"তোমরা যদি আত্মসমর্পণ করে পালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ না নাও, তাহলে আমি নিশ্চিত করছি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অবধারিত মৃত্যু।"

ভারতীয় সেনা প্রধানের এই সতর্কবাণী সারা ঢাকায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

ভারত ঢাকায় বোৰা হামলা চালানো স্থগিত রাখে ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা ৩০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ৯ টা ৩০ পর্যন্ত এই ১৬ ঘণ্টার মধ্যে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা। কিন্তু সকাল ৯ টার পরও পাকিস্তানি সেনা বাহিনী কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বলে মনে হচ্ছিল। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছিল। বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়ে আসছিল, কিন্তু পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে কোন বার্তা আসছিল না। কোথাও কি কোন ভুল হয়ে গিয়েছিল?

উল্লাস করে ছোড়া গুলির শব্দে সবার আশঙ্কা দূর হয়েছিল। ঢাকা আনন্দে উদ্বেলিত হল। জয় বাংলা! যে স্নোগানটি দেশের মানুষকে নয় মাস মুক্তের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল সেই স্নোগানে ঢাকা প্রকল্পিত হল। জয় বাংলা! জয় বাংলা!

মানুষ যেন খুশিতে পাগল হয়ে গিয়েছিল, তারা খুশিতে নাচছিল। কেউ কেউ ঘোগান দিচ্ছিল, “বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।”

শীতের রোদের মধ্যে বাংলাদেশের পতাকা গর্বের সাথে ওড়ানো হল, এবং হঠাৎ আবার মুজিবের প্রতিকৃতি দেখা যেতে লাগলো।

যে ভারতীয় সেনারা ঢাকায় প্রবেশ করল তাদের জয়খনি দিয়ে সাগত জানানো হল। বাংলাদেশের পতাকা বহন করছিলেন এমন একজন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা তার জীপের চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষের উদ্দেশে বলেন, “জয় বাংলা! জয় হিন্দ।” জবাবে সমবেত জনতাও বলে ওঠে, “জয় বাংলা! জয় হিন্দ!” এটিই ছিল সাধীনতার মূলমন্ত্র। বাঙালীরা ভারতীয় সেনাদের ঘরে ধরেছিল, তাদের উপর রাশি রাশি ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছিল এবং তাদের এমনভাবে আলিঙ্গন করছিল যেন তারা তাদের বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া ভাইদের খুঁজে পেয়েছে। নারীরাও এসব দলে যোগ দিয়েছিলেন।

চোখে পানি নিয়ে একজন বৃক্ষ জড়ানো কঠে তাদের উদ্দেশে বলেন, “ইশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।”

ছোট ছোট বাচ্চারা ভারতীয় সেনাদের দেখে হাত নাড়ছিল আর তার মধ্য দিয়েই তারা এগিয়ে যাচ্ছিল।

পক্ষাশের কাছাকাছি বয়স এমন একজন বৃক্ষের সাথে একটি ছোট ছেলে, যে সম্ভবত তার নাতি, তাকে এমন ভাবে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন যেন এই চমৎকার সকালটি উদযাপন করার জন্য কারও ব্যবসই খুব কর নয়।

মুক্তি বাহিনীকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল তারা খুব ঝুঁতি, কিন্তু তারা একই সঙ্গে গর্বিত এবং লক্ষে অবিচল ছিল। এই মুক্তি বাহিনীই তাদের অসম সাহসিকতার জোড়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে দেশের সবচেয়ে দুর্যোগের সময় মানুষের মনে আশা জাগিয়ে রেখেছিলেন। জনগণ এই তরুণ যোকাদের জড়িয়ে ধরে তাদের আবেগ প্রকাশ করছিল।

কয়েক ঘণ্টা সময় পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় ভারতীয় সেনাদের চেয়ে পাক সেনার সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তারা খুবই মনোবলহীন অবস্থায় ছিল, কিন্তু তারপরও যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিরস্ত্র করা না হচ্ছিল ততক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা ছিল। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে একজন পাক সৈনিক ভারতীয় বাহিনীর উপর গুলি চালায়। গুলি বিনিময়ের ফলে একজন পাকিস্তানি সৈনিক এবং একজন ভারতীয় মেজর নিহত হন। একজন ভারতীয় ক্যান্টেন আর্টিলিরিয়ান চিক্কার করে বলেন, “হায় ইশ্বর! এই সংঘাত কি কখনো শেষ হবে না?”

ধানমন্ডির ১৮ নাম্বার সড়কের যে বাড়িতে বেগম মুজিব এবং তার সন্তানেরা আটক ছিলেন, সে “বাড়ির” পাহারার দায়িত্বে থাকা একজন পাকিস্তানি সৈনিক বাড়ির

সামনে নিয়ে যেতে থাকা একটি গাড়ির দিকে লক্ষ্য করে মেশিন গান চালালে একজন নারী চিকিৎসক নিহত হন।

শত শত বাঙালী হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে ঘিরে ধরছিলেন, গভর্নর মালিক এবং তার মহীসভার সদস্যরা এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এই হোটেলটিকে আন্তর্জাতিক এলাকা ঘোষণা করেছিল। তারা চিকিৎসক করে, “বিশ্বাসঘাতকদের ধরো” এই দাবী জানাছিলেন। তাদের এই দাবী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

একজন ভারতীয় কর্মেল তার বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত না হলে হয়তো বিশ্বুজ্ঞ জনতা ঐ হোটেলে হামলা চালাতো।

অধিকাংশ বিহারীই প্রচণ্ড রকম ভারত বিদ্যুতি ছিল, এবং যে নয় মাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল সে সময়ে তারা বাঙালীর উপর পাক বাহিনীর দমন পীড়নে সহায়তাও করেছিল। এ সময়ে তারা ভয় পাচ্ছিল যে এবার তাদের উপর বাঙালীরা ধর্মসংজ্ঞ চালাবে এবং তারা প্রার্থনা করছিল যেন ভারতীয় বাহিনী দ্রুত এসে পৌছায়।

এমন অনেক বাঙালী ছিলেন যারা বিহারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উৎস্থি ছিলেন এবং বিহারীদের উপর কোন প্রতিশোধমূলক হামলার বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু কেউ তাদের কথা শুনছিল না। ভারতীয় বাহিনী দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার কারণেই প্রতিশোধের নেশায় উন্নাস্ত বাঙালীর হাত পেকে যোহাম্বদপুর আর মিরপুরের বিহারী কলোনীগুলো রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দায়িত্বে থাকা মেজর-জেনারেল জে. এফ. আর. জ্যাকব একটি হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় পৌছান। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আট নয় জন বাঙালী এয়ারপোর্টের গেট দিয়ে প্রবেশ করেন। তারা তার সাথে করমদন করেন। তখন সেখানে উপস্থিত একজন বিদেশি সাংবাদিকের দিকে ফিরে তারা প্রশ্ন করেন, “আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন?” তখন ঐ সাংবাদিক বাঙালীদের বলেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছেন। করমদনের জন্য বাঙালীরা তার দিকে বাড়িয়ে দেয়া হাত তখন ফিরিয়ে দেন। মার্কিন সাংবাদিকরা তরু থেকেই বাঙালীর দুর্দশার বিষয়ে সম্বাধি ছিলেন, কিন্তু ঐ দিন বাংলাদেশের তরুণরা কোন মার্কিন সাথেই করমদন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের একজন বলেন, “আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর খুশি নই।”

ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর জিওসি-ইন-সি লেফ্ট্যানেন্ট জেনারেল জগজিং সিং আরো এবং আরো কিছু উর্বরতন সামরিক কর্তা ব্যক্তি নিয়ে দশটি হেলিকপ্টারের একটি সারি ঢাকায় পৌছে।

কিন্তু বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান এম.এ.জি. ওসমানী সে সময় কোথায় ছিলেন? বিজয়ের এই দিনটিতে তার তো ঢাকাতে থাকার কথা।

আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা সারা হয় রেসকোর্স ময়দানে বিকেল ৫ টায়, ৭ মার্চ ১৯৭১-এ এখানেই মুজিব তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দায়িত্বে থাকা লেফটেনেন্ট-জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি। তিনি তার সামরিক পদক খুলে রাখেন, তার পিণ্ডলের গুলি আনলোড করেন এবং লেফটেনেন্ট জেনারেল অরোরা’র কপালে তার নিজের কপাল ঠেকিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি প্রায় কেবল দেশেছিলেন, কিন্তু অনেক কট্টে সেদিন অঞ্চল সংবরণ করেছিলেন, এর আগে এক সময় বাধ হিসেবে পরিচিত এই নিয়াজিরও সুদিন ছিল।

“ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী” ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়ার সময় এ কথাগুলো বলেন। তিনি বাংলাদেশের মানুষকে তাদের এই বিজয়ের মুহূর্তে সাধুবাদ জানান এবং মুক্তি বাহিনীর যুবক এবং বালক যোকাদের অকৃত্ত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, “এ বিজয় শুধু তাদের নয়, পৃথিবীর সকল জাতি যারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে তারা এই বিজয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে মনে রাখবে।” তিনি ভারতীয় বাহিনীরও প্রশংসা করেন এবং জানান যে প্রয়োজনের চেয়ে একদিনও বেশি ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে থাকবে না। “আমাদের লক্ষ” তিনি বলেন, “বুবই সুনির্দিষ্ট- বাংলাদেশের জনগণ এবং মুক্তি বাহিনীকে তাদের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করা এবং আমাদের নিজেদের দেশে পাকিস্তানি আত্মসন ঠেকানো।”

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগে আগে, মুরোশধারী আলবদর এর সদস্যরা দুশোরও বেশি চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং অন্যান্য বৃক্ষজীবী ব্যক্তিত্বকে তুলে নিয়ে যায় এবং তাদের হত্যা করে, তারা এ কাজ করে পাক সেনা বাহিনীর প্রহরায় এবং যে সময় কারফিউ জারি করা ছিল সে সময়ে। যোহাম্মদ পুরে রায়ের বাজার এলাকায় একটি বিহারী কলোনীর কাছ থেকে এসব ব্যক্তিদের লাশ উঞ্চার করা হয়। কিছু কিছু মৃতদেহ এতোটাই ক্ষতিবিক্ষত ছিল যে সেগুলোকে সন্তুষ্ট করা যায়নি।

এসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের একটি তাৎক্ষণিক ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া ছিল। একজন চিকিৎসক বলেন, “আরো বেশি সময় পেলে এই সব খুনীরা আর কতোটা ভয়ঙ্কর হতে পারতো? আমরা সব ভুলতে পারি এই হত্যাকাণ্ড কোনদিন ভুলবো না।”

প্রতিশোধের শপথ নিয়ে তিনি বলেন, “এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের শাস্তি না দেয়াটা হবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ফাঁসি বা ফায়ারিং ক্ষেত্রাদের মাধ্যমে মৃত্যু এদের জন্য কম শাস্তি হবে, এদেরকে সেভাবেই হত্যা করতে হবে যে নৃশংস প্রক্রিয়ায় তারা বাংলাদেশের বৃক্ষজীবীদের হত্যা করেছে, ধীরে ধীরে তাদের দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করে।”

রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের কাছে ‘যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ বিরতি’র আবেদন জানানোর পর পর বাঙালী বৃক্ষজীবীদের নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। এ আবেদনটি আসলে ছিল কাল ক্ষেপণের অন্ত পায়তারা মাত্র। ফরমান আলী হত্যা করার জন্য ১৫০০ বৃক্ষজীবীর একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। বুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ হয়েছিল বলেই তাদের বেশির ভাগ বেঁচে গিয়েছিলেন।

ফরমান আলীকে দেখে নৃশংস ঝুনীর চেয়ে বরং ফরমানের অধ্যাপক মনে হত, কিন্তু তিনি হাসতে হাসতে মানুষ ঝুন করতে পারতেন। ফরমান আলী গর্ভনর মালিক কে ঢাকার শীর্ষ ছানীয় বাজিদের ১৩ ডিসেম্বর সরকারী ভবনে আমন্ত্রণ জানাতে রাজি করিয়েছিলেন, কিন্তু যারা ঐ দিন হাজির হবেন তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে- এমন খবর জানতে পেরে মালিক ঐ নিমন্ত্রণ একেবারে শেষ মুহূর্তে বাতিল করেছিলেন।

সেই ১৩ ডিসেম্বরেই আল-বদর বাহিনী বৃক্ষজীবীদের হত্যা করার জন্য তুলে নিয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কারাকাস থেকে প্রকাশিত লা ভারদাদ পত্রিকা ৩০ জুন ১৯৭১ এ ছাপে, “পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের একটি অভিযান চালাচ্ছে, হিটলারের পর এমন কোন হত্যাযজ্ঞের ঘটনা বিশ্ব দেখেনি। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ছাত্র আর বৃক্ষজীবীরা...।”

তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যও বৃক্ষজীবীরাই ছিলেন।

দেশ স্বাধীন হবার একদিন পর একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য বলেন, “বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া দেশের স্বাধীনতাই অপূর্ণ থেকে যায়। যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। আমরা বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনতে আমাদের জীবন দিয়ে দিব।”

নভেম্বর ১৯৭১-এ যখন মুক্তির সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত তখন এক পাকিস্তানি ব্যাংকার বলেছিলেন, “পূর্ব পাকিস্তান হয়তো বাংলাদেশ হয়ে যাবে, কিন্তু তা দেখার জন্য মুজিব বেঁচে থাকবেন না। বাঙালীদেরকে মুজিবের স্মরণে ভাস্কর্য নির্মাণ করতে হবে।” এই ব্যাংকার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে আটকে পড়া হাজার হাজার পাকিস্তানিদের মতই নিচয়ই মুজিবের জীবনের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মুজিব ঢাকায় না ফিরে আসছেন ততক্ষণ একজনও পাকিস্তানি নাগরিকের দেশে ফেরার পরিস্থিতি সে

সময় ছিল না, কিন্তু ইসলামাবাদে ক্ষমতায় থাকা উন্নাদ ব্যক্তিরা হয়তো বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের জীবনের পরোয়া নাও করতে পারতো। পাক সেনারা তাদের আত্মসমর্পণের ঠিক আগেও যখন বাংলাদেশের বৃক্ষজীবীদের হত্যা করতে পেরেছিল, তা থেকে ধারণা করা যায় এদের দ্বারা যে কোন অপকর্মই করা সম্ভব।

দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই দিন পর কিছু বাংলাদেশী সরকারী কর্মকর্তা ঢাকায় এসে পৌছান। কিন্তু কি কারণে তখনো বাংলাদেশ সরকারের সদস্যরা ভারতে আটকে ছিলেন তা কারও জানা ছিল না। এটা ছিল অবিশ্বাস্য।

এই সরকার তার আগের সরকারের উত্তরসূরি হিসেবে ক্ষমতায় আসেনি, এই সরকার ক্ষমতায় এসেছিল একটি মুক্তিযুক্তের মধ্য দিয়ে। নিঃসন্দেহে এই সময় প্রশাসনিক সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু এই সময় সবচেয়ে দরকারী ছিল রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা। পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় ঢাকায় বাংলাদেশের সেনা প্রধান কর্নেল ওসমানীর অনুপস্থিতিই যথেষ্ট বাজে ঘটেন ছিল। এরপরও বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা কেন ভারতে বিলম্ব করছিলেন? তাদের কি কোন তাড়া ছিল না, তাদের কি কোন রাজনৈতিক দায়িত্ববোধও ছিল না? তারা কি তাদের নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন? তাদের যথার্থ স্থান ছিল সদ্য স্বাধীন দেশের জনতার মাঝে। তাদের উচিং ছিল বিজয়ের দিনেই ঢাকায় পৌছানো, দরকার বোধে তাবুতে বসবাস করা এবং যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ বিক্রিয় দেশ পুনর্গঠনের কাজে হাত দেয়া। তথ্যাত্ম নায়কেচিত এবং লক্ষ্য অবিচল নেতৃত্বে পারতো এই সময়ে দেশের মানুষকে উত্তুক করতে। স্বাধীনতা দেশের যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সেটিকে ভালোভাবে অনুধাবন করে সাহসী রাজনৈতিক সিঙ্কান্ত নেয়া এবং কার্যক্রম শুরু করার এটিই ছিল সেরা সময়। এই সময়ে সরকারের মধ্যে যে কোন দুর্বলতার লক্ষণ দেখা গেলে তা দীর্ঘ যোগাদে দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারতো।

স্বাধীনতার ছয় দিন পর, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভৰ্তীকালীন সরকারের সদস্যরা ঢাকায় এসে পৌছান। তারা দেরী করায় সবার মনে যে সন্দেহ বা দ্বিধা তৈরি হয়েছিল তা খুব দ্রুত দূরীভূত হওয়ার ফত ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ঢাকায় পৌছার পরদিন পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে একটি বৈঠক করেন। তার বক্তব্যের ভূমিকায় তিনি বলেন, “আমরা যারা এখানে বসে আছি মেশিন গানের এক ঝীক ওলি আমাদের সবাইকে হত্যা করতে পারে।” ঠিক যেভাবে অং সাং আর তার মন্ত্রীসভাকে ১৯৪৭ সালে রেঙ্গুনে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু তাজউদ্দীন ডয় পাওয়ার লোক ছিলেন না, বা তিনি কেন নাটকীয়তার আশ্রয়ও নেন নি সেদিন। আসলে নয় মাস সময় ধরে পাকিস্তানি

বাহিনীর পক্ষ থেকে নিরসন মৃত্যুর হৃষকির মধ্যে ধাকার পর তিনি আমরা যেন
সহজে বুঝতে পারি এমন সহায় কথা বলছিলেন।

তাজউদ্দীন একভাবে বলেন, যে সমস্ত সাংবাদিক পাকিস্তানিদের হামলা শুরু করার
পরও ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন তাদের সবাইকে পাক বাহিনীর দোসর বলতে
পারতেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি তা মনে করেন না। তিনি জানতেন
সাংবাদিকদের কেউ কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তির সংগ্রামে নানা ভাবে সহায়তা
করেছেন।

তারপরও তাজউদ্দীনের এই বক্তব্য কেউ কেউ ভুল বুঝতে পারতেন। মুক্তিযুদ্ধ
চলাকালীন পাক বাহিনীকে সহায়তা করেছেন এমন কোন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে
ব্যবস্থা নেয়ার ইচ্ছা না থাকলে তার এমন বক্তব্য দেয়া উচিত হয়নি। দুই একজন
সাংবাদিককে ভুলক্রমে কারাবণ্ডী করলেও এমন কিছু হত না। এতে বোঝা যোত
সরকার পাক বাহিনীকে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বন্ধ পরিকর।

দুয়েকজন সাংবাদিক তাদের ঢাকুর হারান। কিন্তু একজন সাংবাদিককেও পাক
বাহিনীকে সহায়তা করার অপরাধে আটক করা হয়নি।

পাক বাহিনীকে সহায়তা করেছেন এমন একজন সাংবাদিক বলতে থাকেন যে
তাজউদ্দীন ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন এমন সব সাংবাদিককেই পাক বাহিনীর
সহায়তাকারি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এমন কিছু লোক সব সময়ই থাকে যারা তাদের নিজ শার্টের জন্য এমন কি
শয়তানের সাথেও হাত মিলায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ফ্রান্স সহ বিভিন্ন ইউরোপিয়
দেশে প্রতিরোধকারি বাহিনীর সদস্যদের গঞ্জ পড়তে রোমাঞ্চ লাগে এ কথা সত্য,
কিন্তু এ কথাও সত্য যে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ঐ সব দেশে হাজার
হাজার লোক জার্মান দখলদার বাহিনীর সহায়তাকারির কাজ করেছে।

ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মোট ১,২৪,৭৫০ জনকে জার্মান দখলদারদের
সহায়তা করার অপরাধে বিচারের মুখোযুক্তি করা হয়। এদের মধ্যে ৭৪৭ জনকে
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং আরও ৩৫,০০০ ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে
দণ্ডিত করা হয়। প্রশাসন থেকে হাজার হাজার ব্যক্তিকে চাকুরিচূড়াত করা হয় বা
পদাবোনতি দেয়া হয়। এরপরও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপিয় দেশের তুলনায় ফ্রান্স
দখলদার বাহিনীর সহায়তাকারিদের বিষয়ে কম কঠোর ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পর যে সব লোকের বিরুদ্ধে হানাদার বাহিনীকে
সহায়তা করার অভিযোগ ওঠে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০,০০০; এই সংখ্যাটি
৭৫ মিলিয়ন মানুষের দেশের জন্য বেশ ছোট। কিন্তু এদের মধ্যে শত শত
ব্যক্তিকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। তাদেরকে খুঁজে বের করার কোন উদ্যোগও নেয়া
হয়নি; কারাগারগুলো তখন হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারিদের ঘারা এতোটাই
ভর্তি হয়েছিল যে এসব লোককে নিখোঝ বলে দেয়াটাই সুবিধাজনক ছিল।

এসব সহায়তাকরিদের পাশাপাশি এমন অনেক লোক তখনো ছিলেন যারা সবকিছুর পরও পাকিস্তানিদের প্রতি সমব্যবী ছিলেন। যত যাই হোক, যে ৬৫ মিলিয়ন লোক মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে থেকে গিয়েছিলেন তাদের সবাইকে পাক বাহিনীর সহায়তাকারি বলাটা একটা জাতীয় অপমান। তার চেয়েও উচ্চতপূর্ণ হল যে যুক্ত হয়েছিল সেটিকে মুক্তিযুদ্ধ দাবি করলে তার সাথে দেশে থেকে যাওয়া মানুষকে হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারী বলে মন্তব্য করাটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।

যদি দেশের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন না দিত তাহলে মাত্র নয় মাসে দেশ স্থাপিন হতো না। মুক্তিবাহিনী স্বয়ং ঢাকা শহরে খুব সহজেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পেরেছিল কারণ শহরের মানুষ তাদের ব্যাপক সহায়তা করেছিল। যখনই পাক বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তখনই মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা নির্বিধায় যে কোন বাড়ি, অফিস বা ব্যাংকে চুক্ত যেতে পারতো। দেশের মানুষের সর্বাত্মক সমর্থন না করলে মুক্তি বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী যত দ্রুত ঢাকায় পৌছেছিল তত দ্রুত পৌছাতে পারতো না।

এমন হতে পারে যে যারা বিভিন্ন সময় মুক্তি বাহিনীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের নিজেদের জন্য সব দরজাই খোলা রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এমন অনেকেই ছিলেন যারা প্রতিদিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মুক্তি বাহিনীকে সহায়তা করতেন, এদের মধ্যে নারীরাও ছিলেন যারা তথ্য আদান প্রদান সহ অন্যান্য বিপদজনক অভিযানে সহায়তা করতেন।

যে দশ মিলিয়ন বাঙালী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের বাদ দিলে ঐ সব আশ্রয় পাওয়া লোকদের মধ্যে একটি খুব ছোট অংশই দেশের স্বাধীনতার জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরে তারা খুব দেশপ্রেম দেখাছিলেন এবং যারা দেশে থেকে গিয়েছিলেন তাদের জাতীয়তাবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন। তারা এমন ভাব করেছিলেন যেন ভারতে পালিয়ে গিয়ে তারা বিশেষ যৰ্যাদার দাবিদার হয়ে গিয়েছেন; এদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা নভেম্বরের দিকে যখন দেশের স্বাধীনতা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে সে সময় দেশ ত্যাগ করেছিলেন। প্রথম দিকে তাদের দেশে ফিরে আসা বীরের সম্মান দেয়া হলেও, খুব দ্রুতই এ ধরনের লোকদের বিকল্পে মত তৈরি হতে থাকে। কেউ কেউ তাদের কোতুক করে 'হাজী' বলে সমোধন করতে থাকেন। যাই হোক যে দশ মিলিয়ন লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে খুব ছোট একটি অংশই এমন আচরণ করেছিলেন। অবশিষ্টদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র মানুষ, যারা সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সামান্য পুনর্বাসন ভাতা দিয়েই নতুন করে জীবন উন্ন করার উদ্যোগ নিছিলেন। খাবার ও আশ্রয় অনুসন্ধানের মত বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা মেটানো নিয়ে তারা এতোটাই বাস্ত ছিলেন যে অন্য কিছু নিয়ে ভাববার মত সময় তাদের হাতে ছিল না।

বদরুল্লাহ উমের বলেন, যখন দেশত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বা দেশত্যাগ করেন নি এমন ৬৫ মিলিয়ন মানুষকে হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারী বলা হতে লাগলো তখন 'ভারতের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের মনোভাব ক্রমেই বক্রত থেকে শক্তির দিকে যেতে থাকল'। এতে কোন সন্দেহ নেই যে কিছু কিছু কর্মকর্তা যারা অস্থায়ী সরকারের হয়ে কাজ করেছিলেন তাদের ওক্ফ্য এক ধরণের বিদ্বেষ তৈরি করেছিল, কিন্তু 'ভারত-ফেরত ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ ক্রমান্বয়ে ভারত-বিদ্বেষে ক্ষপাত্তিরিত হয়েছিল' বলা হলে এতেটাই সরলীকরণ করা হয়ে যায় যে বলা যায় এখানে আসলে একটি ভুল চিত্র দেখানো হচ্ছে।

যারা 'সীমানা পেরোনো'র কারণে বিশেষ ঘর্যাদা দাবি করছিলেন তাদের মধ্যে সবাই যে ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন তা কিন্তু নয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন বিদেশী এজেন্ট। কেউ কেউ ভ্যাক্স ভারত বিরোধী পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিলেন, অনেকে ডিন্ব উপায়ে আইযুব সরকারকে সহায়তা করেছিলেন। এমন কি হতে পারে সীমাত্ত পাড়ি দিয়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে যাওয়ার ফলে তাদের এসব অতীত অপকর্ম মুছে গিয়ে তারা সব নতুন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন? হয়তো দুই একজনের ক্ষেত্রে এটা সত্য।

ভারত থেকে ফেরত আসাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন পিকিংপাহী বামপন্থী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সত্যিকারের বামপন্থী, কিন্তু অনেকে ছিলেন বামপন্থার মুখোশের আড়ালে সাম্প্রদায়িক। তারা মোটেও বদলাননি, কিন্তু তাদের জন্য সেই সময়টা বুকিপূর্ণ হওয়ায় তারা চৃপচাপ থাকাটাই বুক্সিনের কাজ মনে করেছিলেন। এসব লোকের মধ্যে এমন অনেকেও ছিলেন যারা আগে ভারতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকলেও ভারতে গিয়ে তাদের সেই অনুরাগ কোন কারণে কেটে গিয়েছিল। এটা হয়তো সে ধরণের প্রেম কাহিনীর মতো যেখানে একজন প্রেমিক অনেক স্বপ্ন নিয়ে শুরু করলেও পরে বুঝতে পারে বাস্তবতা তার স্বপ্ন থেকে অনেক দূরে।

যদি ১০ মিলিয়ন লোক ভারতে আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাহলে অন্তত এর দ্বিতীয় পরিমাণ লোক দেশের ভিতরেই নিজেদের বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়েছিলেন। দখলকৃত বাংলাদেশে সর্বত্তই ছিল মৃত্যু। সে সময় মানুষ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দেও ডয় পেত, তাদের মনে হত হয়তো ছেট বাচ্চার কান্নার শব্দেও তাদের বাড়ির সামনে টুহুলরত পাকসেনারা বিরক্ত হয়ে উঠবে। ইটার সময় তারা নিজেদের ছায়াকেও ডয় পেতেন, যে কোন শব্দ তাদের চমকে দিত এবং এগিয়ে আসা গাড়ির শব্দে ডয়ে তাদের আজ্ঞা শুকিয়ে যেত।

দশ মিলিয়ন লোক ডয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এরপরও আরও ৬৫ মিলিয়ন লোক পেছনে থেকে গিয়েছিল। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজ দেশেই পলাতকের জীবন যাপন করেছিল। তাদেরকে শরণার্থী বলা যাবে না

কারণ আতঙ্কের রাজ্যে পরিষ্ণত হওয়া দেশে সেই সময় কেউই তাদের আশ্রয় দেয়ার মত ছিল না। এদের অনেককেই তখন পাক বাহিনী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এমন কি রংহল কুন্দুস, যিনি আগরতলা ষড়যজ্ঞ মামলায় আসামী এমন তিন জন সি এস পি (সিডিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান) অফিসারের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনিও দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র এক মাস আগে নভেম্বর মাসে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত যান, তাও প্রবাসী সরকারের তাকে ডেকে পাঠানোর পর। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ সরকারের মহা সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

কী কারণে অনেক দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী ভারতে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন দেশের ভিতরে শিকারির ভয়ে পালাতে থাকা প্রতির মত জীবন যাপন করেছিলেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রথমাত কবি শামসুর রাহমান তার কবিতায় লিখেছেন, “আমিও নিজেকে ভালোবাসি...”। আর সবার মত তারও অনেক কিছু করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি নিজের দেশের মানুষের পাশে থেকে গিয়েছিলেন যাদের ‘দিন আর রাত সব এককার হয়ে গিয়েছিল।’

যখন বেঁচে থাকার প্রশ্ন সামনে চলে আসে তখন এমন কি কখনো কখনো পিতৃত্বের বক্ষনও দূর্বল হয়ে পড়ে। অনেক বাবাই সে সময় সন্তানদের ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেই পরিবারের টানে দেশে থেকে গিয়েছিলেন। এক ভাই যখন ভারতে চলে গেছে, তখন হয়তো অন্য ভাই তাদের অসুস্থ বৃক্ষ মাকে ফেলে পালিয়ে যেতে চায়নি। পালিয়ে যাওয়াটা এক হিসেবে সবচেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা ছিল, অনেকেই পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু পালিয়ে না গিয়ে থেকে যাওয়ার কারণগুলো এতেই জটিল যে কেবল একজন দক্ষ ঔপন্যাসিকের পক্ষেই সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা সম্ভব।

একজন বাঙালী কূটনীতিক যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক দিন আগেও সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছিলেন, তাকেই আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প সময় পরে বাংলাদেশ সরকারের হয়ে কথা বলতে দেখে একজন ভারতীয় সাংবাদিক বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সাংবাদিকটি প্রশ্ন রেখেছিলেন, “বাংলাদেশকে কি সুযোগ সন্তানীদের সহায়তায় পাকিস্তানের মত করেই তৈরি করা হচ্ছে?” যদিও ঐ কূটনীতিকের নাম প্রকাশ করাটা অন্যায় হয়েছিল, তারপরও সাংবাদিকের প্রশ্নটি ওরুক্তব্রহ্ম।

সুযোগ সন্তানীরা সব সময়ই সুবিধা নেয়, তারা সব আমলেই কর্তৃত্বে যথাযথ সেবা করে থাকে। এমনও হতে পারে ঐ কূটনীতিকের আচরণ ছিল পেশাদারী, হয়তো তার কাছে কয়েকদিন আগে যা বলেছিলেন তার ঠিক বিপরীত কথা বলাটা অনৈতিক বা অপমানকর মনে হয়নি।

অনেক বাঙালী কূটনীতিকই মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকেই অন্তর্ভুক্তিকালিন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাদের পরবর্তী নির্দেশ

না দেয়া পর্যন্ত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছিল। এভাবেই তারা বাংলাদেশকে সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর পাশাপাশি এমন অনেক কৃটনীতিকও ছিলেন যারা দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষে তো আসেনই নি বরং পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দণ্ডে ছেড়ে বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে আসার আগে এ নিয়ে অনেক দর কথাকথি করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশ সরকারে যোগ দিয়েছিলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় বছর খালেক পর।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দণ্ডে চাকুরি করার সুযোগ সুবিধা ছেড়ে বাংলাদেশের পক্ষে এসে অনিষ্টিত জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়াটা বাঙালী কৃটনীতিকদের জন্য কঠিন ছিল। একজন বাঙালী কৃটনীতিক বলেছিলেন, “অনিষ্টিত জীবনের চেয়েও যে বিষয়টি নিয়ে আমরা বেশি ভাবিত ছিলাম তা হল, যদি আমরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করি তাহলে হয়তো দেশে থাকা আমাদের আত্মীয় স্বজনদের নির্যাতন করা হবে।” তার এই যুক্তি খুবই গ্রহণযোগ্য।

যে সব বাঙালী কৃটনীতিক পাকিস্তান বা তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলোতে অবস্থান করছিলেন তাদের অবস্থা সে সময় সত্যিই খুব জটিল ছিল।

থার্ড সেকেন্টারীর মর্যাদা সম্পন্ন একজন বাঙালী কৃটনীতিক রাষ্ট্রদৃত পর্যায়ের নিয়োগ দাবি করেন, কারণ তিনি অনেক আগেই ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। (এটাকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ বলা যায় কেবল পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিতে, কিন্তু অনেক বাঙালী কৃটনীতিক তাদের বাংলাদেশের পক্ষ নেয়াটাকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ বলেন। এটাকি ভাষাগত ভূল, না কি তারা এভাবেই বিষয়টি দেখে থাকেন?)

অনেক বাঙালী কৃটনীতিককেই ভূল করে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বনকারী মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ আসলেই মনে প্রাণে পাকিস্তানপক্ষী ছিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্র দণ্ডের বাইরের কিছু কর্মকর্তা, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের জন্যও এ কথা প্রযোজ্য।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দণ্ডের কর্মরত অধিকাংশ বাঙালী কর্মকর্তাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন তাদের কাজ অব্যাহত রেখেছেন, এদের মধ্যে অনেকের পদোন্নতিও হয়েছিল যুক্ত চলাকালিন। তবুও দুই একটি ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সবারই চাকুরি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বহাল ছিল, এমন কি পাকিস্তান সরকারের বিশেষ কৃপা পেয়েছেন এমন অনেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ বাস্তীয় পদে আসীন হয়েছিলেন যেখান থেকে তারা জাতীয় নীতিকে প্রভাবিত করতে পারতেন। বিভিন্ন অঙ্গীত রয়েছে এমন কর্মকর্তারা কিভাবে এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলেন তা ব্যাখ্যাতীত।

কেন এসব বাঙালী কৃটনীতিক যারা আগে থেকেই জনগণ থেকে অনেক দূরে ছিলেন, তাদের কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করা হবে? বরং সিএসপি

কর্মকর্তারা জেলা পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের মানুষের কাছে যাওয়ার এবং বাঙালী আবেগ অনুভূতি সম্পর্কে জানার কিছু সুযোগ পেতেন।

সবকিছু বিবেচনা করে বলা যায় কিছু বাঙালী কৃটনীতিক মুক্তিযুক্তের তরম্ভ দিকেই তাদের নিজেদের জীবনের অনিষ্টতা আর দুর্দশার কথা না ভেবে নিজ নিজ চাকুরি থেকে ইন্তফা দেন। তাদের পদত্যাগের ঘটনা ব্যাপক প্রচার পায় এবং এর ফলে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম বেগবান হয়।

ইকবাল আতাহার নামে একজন জোষ্ঠ বাঙালী কৃটনীতিকের কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে পাক বাহিনী যে জন্মন্য হত্যায়জ্ঞ চালাচ্ছিল তার প্রতিবাদে ইকবাল আতাহার ১৯৭১ সালে কোন একটি ইউরোপীয় দেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদ্বৃত থাকা অবস্থায় পাকিস্তান পররাষ্ট্র দণ্ডের থেকে পদত্যাগ করেন। মুজিব তাকে মধ্য প্রাচ্য মুজিবের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে এটি একটি অস্থায়ী নিয়োগ ছিল এবং ইকবাল আতাহারের মনে এ নিয়ে কোন অলীক আশার জন্ম হয়নি।

দেশে পাকিস্তানি আঘাসনের সেই ভয়ঙ্কর অক্ষকারের সময় বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাস ছিল স্বাধীনতা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। সব কিছু যখন বাংলাদেশের বিপক্ষে যাচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল সে সময়ে এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই মানুষ টিকে ছিল। ১৯৭১-এর জুনে একজন এশীয় সাংবাদিক বলেছিলেন, “আর্জুর্জতিক পর্যায়ের চক্রান্তের কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা হয়তো বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু কোন কিছুই এদেশের স্বাধীনতা অর্জন ধরিয়ে রাখতে পারবে না।” এ বিষয়ে প্রায় সবাই নিশ্চিত ছিল। এই সময়ে একজন বাঙালী কিভাবে এতোটা অনুরূপশী হবেন যে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য লিখবেন? হয়তো তারা যদি ‘পাকিস্তানের ধারণা’য় বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তখনই তাদের পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব, কিন্তু আঘাসন অভিযান তরম্ভ আগে তো এই সব ব্যক্তির সবাই প্রচণ্ড রকম বাঙালী জাতীয়তাবাদি ছিলেন। আসলে তাদের এসব জাতীয়তাবাদ ছিল ভগ্নামি এবং তারা পাকিস্তানি প্রভুদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে আগ্রহী ছিলেন।

তাজউদ্দীন জোড় গলায় বলেছিলেন- এটা কোন গৃহযুক্ত নয়, বরং স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ছিল। এই প্রার্থক্যকরণ জরুরি ছিল, কিন্তু এই প্রার্থক্যটা এমন কি উচ্চ পর্যায়ের অনেক ব্যক্তিত্বের কাছেও স্পষ্ট ছিল না।

পাকিস্তানিদের চালাচ্ছন্ন ধর্মসংঘের কারণে এমনকি প্রচণ্ড রকম পাকিস্তানপক্ষী বাঙালীদের অনেকেও বাঙালী জাতীয়তাবাদের সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন, অন্তত যুদ্ধের নয় মাস সময়ের জন্য। কিন্তু যদিও বাঙালীরা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৭ ভাগ তারপরও অনেক বাঙালী রূপান্তর ছিলেন, এমনকি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর ক্ষুক্ষ হওয়ার পরও।

আবু সায়িদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১২ জানুয়ারি ১৯৭২-এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন। তিনি বাঙালির উপর পাক বাহিনী ঝাপিয়ে পড়ার কয়েকদিন পর লক্ষ্মন একজন সাংবাদিক কে বলেন, “আমি সব সহয়ই মনে করতাম দেশের দুটি অংশ একসাথে থাকা উচিত। কিন্তু এত এত হত্যা করার পর এখন আর সে প্রশ্নই আসে না। সেনাবাহিনী যদি তখুন বাঙালি হওয়ার কারণে কাউকে হত্যা করতে পারে, তাহলে বাঙালিরা আর একই রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে না। আমার মত একজন বাঙালি যে সবসময়ই অবিভক্ত পাকিস্তানে বিশ্বাসী, সে যদি এভাবে কথা বলতে পারে, তাহলে অন্য বাঙালির মনজয় করা কি আমো পাকিস্তানিদের পক্ষে সম্ভব?”

২৩ বছর ধরে পাকিস্তানিরা বাঙালির সাথে প্রতি সুলভ আচরণ করেছে এবং সব সময়ই পাকিস্তানের প্রতি বাঙালির আনুগত্যকে প্রশংসিক করেছে। এমন কি একবারের মত একটু দেশপ্রেমের চিহ্ন দেখানোর সময়েও আবু সায়িদ চৌধুরী তার পাকিস্তানি অঙ্গীকার আর পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কাছে আনুগত্যের প্রয়াপ দাবি করতে পারে এমন ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি।

একজন বাঙালি ব্যবসায়ী যিনি প্রায় নয় মাস ধরে বাঙালিদের উদ্ধার না করার কারণে তারভীয় সেনাবাহিনীকে অভিসম্পাত করছিলেন, তিনি বিজয়ের দিনে দুর্ঘট্যে কেঁদে ফেলেন। তিনি তার প্রতিবেশিকে প্রশ্ন করেন, “আমরা কি পাকিস্তানের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছি?”

যে পাকিস্তানের জন্য তিনি কাঁদছিলেন তা বহুদিন ধরেই খুঁকছিল এবং ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ সেই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়।

এই ব্যবসায়ীটি ছিলেন একজন মুসলিম শীগার, তিনি দেশভাগের সময় কোলকাতা থেকে ঢাকা আসেন এবং ঢাকায় তার ব্যবসার বেশ উন্নতি হয়েছিল। তার পরিচিত পৃথিবী খৎস হয়ে গিয়েছিল এবং হঠাত তিনি অনিয়াপদ বোধ করছিলেন।

তার স্থান তখন ছিল অতীতে। যারা নতুন আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সামনে এগোনোর মত ছিল ভবিষ্যতটা তাদের জন্যই।

তাজউদ্দীন ছিলেন স্পষ্টভাবী এবং মাঝে মাঝে তিনি একদম সরাসরি অধিগ্রহণ সত্ত্ব কথা বলতেন। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ তিনি এক সাতকারে বলে বসেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে দক্ষিণে প্রকাশ্য শক্তি দেখিয়েছে।

তারপরও, যখন তিনি তার প্রাথমিক তৈরি ক্ষেত্র কাটিয়ে উঠেছিলেন তখন ‘মার্কিন সংবাদ মাধ্যম, বৃক্ষজীবী নেতা এবং আরও যারা অবিচারের বিরুদ্ধে দাঢ়িয়েছিলেন’ তাদের কথা স্মরণ করতে ভোলেন নি। টাইম সাময়িকীকে তিনি

বলেন, “পাকিস্তান আমদের দেশকে নরকে পরিণত করেছিল। আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ করেছিলাম কিছু কিছু বহু প্রতিম রাষ্ট্রের প্রশাসন বাংলালী নিধনকারীদের সমর্থন দিয়েছিল। বাংলাদেশের জনগণ নিঞ্চলের কাছ থেকে পাওয়া কোন ধরণের সাহায্য পছন্দ করবে না, তবুও আমরা মনের মধ্যে শক্তি পূর্ণ রাখার বিপক্ষে।”

১৯৭১-এর ২৬ ডিসেম্বরে সরকারি বক্তব্যে বলা হয়েছিল, “দেশপ্রেম, সাহস এবং ধীরত্বে অভ্যন্তরীণ মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রত্যাবিত নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর জন্য উৎকৃষ্ট সদস্য হতে পারেন।” এই আবেদন মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের ‘সমন্ত শক্তি ও সামর্থ একটি ‘নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজে বিনিয়োগ করতে’ উৎসাহিত করে।

মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের দেশপ্রেম এবং সাহস ছিল প্রশাঁতীত। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আদর্শবাদী তরুণ যারা একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইতেন, কিন্তু তাদের একার পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব ছিল না। জাতীয় উদ্যোগের অংশ হিসেবেই তাদের শক্তি সামর্থ বিনিয়োজিত করা দরকার ছিল, আর এমন উদ্যোগ নেয়া কেবল সরকারের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

তথ্য স্বাধীনতার যুক্তে অংশ নেয়ার মাধ্যমেই কেউ বিপ্লবী হয়ে যায় না। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও এমন কেউ কেউ থেকে যেতে পারেন যারা হয়তো ভবিষ্যতে দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। ক্যাস্টো যখন সমাজবাদী কার্যক্রম তরুণ করেন, তখন একদম যারা তার সাথে কিউবা বিপ্লবের সময় হাতানা দখলে ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ তার বিপক্ষে চলে যান।

সশস্ত্র সংগ্রাম যদিও প্রয়োজনের সময় নিঃসন্দেহে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ, তারপরও নওয়েন নগেহ'র ভাষায় ‘এটি একটি বৃহত্তর বিপ্লবী সংগ্রামের অংশ মাত্র, এবং সেই বিপ্লবী সংগ্রাম সর্বোপরি ও মূলত রাজনৈতিক।’ নওয়েন নগেহ বলেন, “যখন কেউ সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে মনযোগ দিতে গিয়ে রাজনৈতিক ও আদর্শিক লড়াইকে উপেক্ষা করে তার ফলে তাকে হতাশ হতে হয়, বিশেষত বিজয় অর্জিত হওয়ার পর যখন শাস্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময়ের জন্য এ কথা বেশি প্রয়োজন।”

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুক্ত বিপ্লবের পূর্ব পর্যায় হতে পারতো যদি আগে থেকেই এ বিষয়ে রাজনৈতিক পরিকল্পনা থাকতো বা যুক্ত চলাকালিন রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা থাকতো। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া যে কোন বিপ্লবী পরিস্থিতি মৈরাজ্যকর সংঘর্ষে পর্যবসিত হতে পারে। ঠিক এমনটিই ১৯৬৮-৬৯ সালের গ্রীষ্মে ঘটেছিল যখন সম্ভবত বিপ্লবের জন্য আরও বেশি অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

যুক্ত বিষ্ফলতা বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজ নিশ্চিতভাবেই সশস্ত্র সংঘামের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যদিও দেশ গড়ার কাজটি যুক্ত করার মত বীরোচিত মনে নাও হতে পারে। এটি ছিল অনেক দীর্ঘ আর শ্রম সাপেক্ষ। দেশ পুনর্গঠনের কাজে যুক্তিবাহীকে সংযুক্ত করা প্রয়োজনীয় ছিল, যাতে তারা অনুভব করতে পারে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্যথায় তারা হতাশার স্থীকার হতে পারতো অথবা তাদের শক্তি ভুল পথে চালিত হতে পারতো।

তাজউদ্দীন বলেছিলেন, সামনে যে দেশ গড়ার কাজ রয়েছে তা এমন কি স্বাধীনতার যুক্তের চেয়ে কঠিনতর হবে, কিন্তু তার সহকর্মীরা তাদের ক্ষমতা দখল যে একটি বৃহত্তর বিপ্লব বা স্বাধীনতা সংঘামের একটি অংশ মাঝে বিষয়টি যথাযথ বুঝতে পেরেছিলেন কি না তা নিয়ে সন্দেহের সুযোগ রয়েছে। একদিকে তারা সশস্ত্র সংঘামকে মহান করে দেখতেন। আবার একই সাথে তারা এই সশস্ত্র সংঘামকে তাদের ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ার উকুল চেয়ে বেশি কিছু মনে করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

সব ধরণের সংঘাতের প্রশংসনোদনার জায়গাটি একই রকম হয়ে থাকে। যখন লড়াই করার অনুপ্রেরণা হারিয়ে যায়, তখন সংঘাত ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে দেখা দিতে পারে। হিতীয় বিশ্ববুক্ষের পর ইউরোপের শত শত দেশপ্রেমিক পার্টিকামী আর যুক্তকালিন বীর নায়কেরা দস্যুবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এমন হতে পারতো।

যুক্তের সময় মানুষের ডেতরের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা বেরিয়ে আসে এবং অনেক সময় মানুষের ডিতরের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলো এ সময় প্রকট হয়ে ধরা দেয়। এরকম সময় সব ধরণের কাওজান লোপ পায় আর সাধারণ মানুষ সংঘাতের কথা ডেবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেনা, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে অভ্যন্তর তৈরি হয়। যে যুক্তে বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছেন এবং হাজারো নারীর সন্ত্রমহানী করা হয়েছে সেই যুক্তের পর সবকিছু আবার আগের মত হয়ে যাবার কোন কারণ ছিল না।

আন্তে মালরো তার লেখায় জেনারেল দ্য গলের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এভাবে, “জাতি আর জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।” জাতীয়তাবাদকে অন্ত কাজে যেমন লাগানো যায় তেমন এর অপব্যবহারও হতে পারে। সবার আশা ছিল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ দেশ পুনর্গঠনের কাজে লাগবে। ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত ক্ষার্থ চরিতার্থ করার অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

নতুন স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে নানা রকম আন্তর্জাতিক শক্তি তিন্যাশীল থাকবে, এবং এগুলোর মধ্যে সবগুলো বন্ধুত্ববাপন হবেনা এটাই স্বাভাবিক। শত্রুরা তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বন্ধু রাষ্ট্রের নাগরিক বা এমনকি বাংলাদেশের

নাগরিকদেরকেও ব্যবহার করতে পারে—স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালিন এমন ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালিকে এ বিষয়ে একবারে অসচেতন মনে হয়েছিল। তাদের একমাত্র ভাবনা ছিল অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিয়ে- এবং সেটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিয়েই ভাবা হচ্ছিল। এই জাতীয়তাবাদ ছিল ‘আমি, আমার’ কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের চিকিৎসা দিয়েছেন এমন একজন নারী চিকিৎসক এ বিষয়ে সঠিক অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বলেন, “আমাদের সকল বিদেশীকে বের করে দেয়া উচিত। অথচ আমরা সবাইকেই উচ্চে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভেতরে আসতে দিচ্ছি। যে সমস্ত দেশ এখনো বাংলাদেশকে শীকৃতি দেয়ানি সেসব দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশে চুক্তে দেয়া উচিত হবেনা।” তখন একজন বৃক্ত তাকে বলেন, “তাহলে তো অধিকাংশ দেশের নাগরিকদের এদেশে চুক্তে দেয়া যাবেনা।” জবাবে ঐ নারী চিকিৎসক বলেন, “তাতে কি আসে যায়। তাদের জন্ম উচিত আমাদেরও জাতীয় অঙ্গভাগ রয়েছে। যে সব দেশ সরাসরি আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে আমরা সেসব দেশের নাগরিকদেরও এখনে আসার অনুমতি দিচ্ছি। তারা মুক্তভাবে এদেশে ঘূরে বেড়াচ্ছে। তাদের গতিবিধির উপর কে নজর রাখছে? আমাদের রাজনৈতিক অগ্রাধিকারগুলো ঠিক করার এখনই সঠিক সময়, আগামীকাল হয়তো অনেক দেরী হয়ে যাবে। আমরা নিজেদেরকে বিপুরী সরকার বলে দাবি করি, সেক্ষেত্রে আমাদের সবার এক হয়ে কাজ করা উচিত।”

কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধার ঔন্তুত্যপূর্ণ আচরণ গভীর দুর্চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল, এদের অনেকেরই কোন রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা ছিল না এবং তারা ক্রমেই প্রতিরোধমূর্খ হয়ে উঠেছিলেন।

মুক্তিবাহিনীতে নানা রকম বিভাজন ছিল এবং এই বিভাজন তীব্র ছিল। এদের মধ্যে অনেকগুলো গোষ্ঠী দাবি করতে থাকা তারা বিপুর সম্পন্ন হওয়ার আগে পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না। মুক্তিবাহিনীর সামনের সারির সদস্যরা ক্ষুক হয়েছিলেন কারণ দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাননি। নিজেদের এলিট সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তারা তাদের নিজেদের নাম রেখেছিলেন ‘দি মিশন’। তারা বলেছিলেন যতক্ষণ মুজিব ফিরে না আসবেন ততক্ষণ মুক্তিযুদ্ধ চলমান এবং ততক্ষণ তারা নিজেদের অন্ত সংবরণ করবেন না। কিন্তু শুধু তারাই মুজিবের প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আঘাতে অপেক্ষা করছিলেন না।

তখন অনেক বালকও মুক্তিযোদ্ধা সেজেছিল। তারা বিজয়ের দিন ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে তৈরি হয়েছিল এবং তারা নিজেদেরকে ১৬তম ডিভিশন হিসেবে পরিচয় দিত। এদের সংখ্যা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে বেশি ছিল এবং প্রকৃত আর নকল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের সবার কাছেই অন্ত ছিল।

ইতিমধ্যেই রাজাকার এবং আল-বদর দলের সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধার ছবিবেশে গ্রামাঞ্চলে লুটপাট চালানোর খবর পাওয়া যাচ্ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যারা তাদের সহায়তা করেছিল তাদের প্রচুর অস্ত্র সরবরাহ করেছিল, কিন্তু যখন দেশের সর্বত্তরের মানুষ রাজাকার আর আল-বদর বাহিনীর বিপক্ষে ছিল তখন তারা লুটপাট চালানোর সাহস কোথায় পেল?

নিচ্যই কোথাও কোন বিরাট ভুল হয়েছিল।

চীনে রেড আর্মি তাদের লংমার্টের সময় জন সমর্থন পেয়েছিল কারণ এ সময় যেসব দস্যু গ্রামাঞ্চলে লুটপাট চালাচ্ছিল তাদের দমনে রেড আর্মি গ্রামের মানুষদের সহায়তা করেছিল। কান্তোর বাহিনী হাতানার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় যারা এ বাহিনীর নামে লুটপাট চালাচ্ছিল তাদের সাথে লড়াই করেছিল।

একজন বাঙালী উপন্যাসিক তার লেখায় বলেন, “আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম একবার যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই সব তরঙ্গেরা আবার পশ্চাদপটে চলে যাবে। কিন্তু তারা আমাদের নির্দেশ মান্য করতে আগ্রহী ছিল না। এতে আমরা কিন্তু হচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমাদের ভাবা উচিং এসব তরঙ্গ যোদ্ধাদের কার্যক্রমের জন্য কি আমরাই দায়ী কি না। তাদের সামনে আমরা কি লক্ষ্য রাখতে পেরেছি? তারা ভেবেছিল তারা সমাজ বদলে দেবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা, এসব তরঙ্গের সামনে তাদের নিজেদের সময়ের সমাজ বদলে দেবার কি এমন সুযোগ রয়েছে? তারা নিজেরা ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই, আর তাদের হতাশা প্রশ্নিত করার একমাত্র পথ হল সংঘাত এবং এই এক ধরণের কাজই এই পরিস্থিতিতে তাদের করার আছে।

ভারতীয় সেনারা দুই তিনজনের ছোট দলে ভাগ হয়ে মুক্তভাবেই ঢাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রথম দিকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলা এসব সৈনিকদের বিষয়ে মানুষের আগ্রহ থাকলেও, তারা এতোটাই কম কৌতুহলোদীপক ছিল যে খুব দ্রুতই মানুষ তাদের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

১৯৫৮ এর ১ অক্টোবর পাকিস্তানে সেনা শাসন কায়েমের পর থেকেই সেনা বাহিনী সেদেশের সন্ত্রাস শাসক গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে ছিল। এমন কি পরাজয়ের পরও এসব সেনা কর্মকর্তাদের আচরণ ছিল অহমিকাপূর্ণ। অন্যদিকে তাদের তুলনায় ভারতীয় সেনা সদস্যরা ছিল খুবই বন্ধু বৎসল।

ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা এবং সৈনিকদের ব্যবহার এতোটাই ভাল ছিল যে তারা কিছু পশ্চিমা সংবাদ প্রতিনিধিরণ প্রশংসা পায়। বিভিন্ন সামাজিক ক্লাবে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা খুব ভদ্রভাবে বিনামূল্যে পানীয় পান করার প্রত্বাব প্রত্যাখ্যান করতেন এবং সৈনিকেরা উপহার বা এমন কি বিনামূল্যে যান বাহনে ঢাকার প্রস্তাবও এহল করতেন না।

ভারতীয় বাহিনীকে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল।

লন্ডন টাইমস নামের একটি পাঞ্জিকে পিটার হ্যাজেলহার্স্ট লিখেন, “জন প্রশাসনে নাক গলানো হয়েছে সামান্য বা একদমই নয়...। জনগণ সানন্দে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তাদের উক্তারকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর ভারতীয় সেনা সদস্যরা তাদের উপর কড়া নির্দেশ থাকার কারণে প্রতিটি কোণায় বিনামূল্যে পাওয়া উপহার সামঞ্জী প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছে।” তিনি আরও লিখেন, “...নয় মাস ধরে পাকিস্তানি সেনা বাহিনীকে দেখার পর বাঙালীরা প্রকাশ্যে ভারতীয় বাহিনীর পেশাদারী সংস্কৃতি আর তাদের দক্ষতার প্রশংসন করছেন।”

তারপরও ইতিমধ্যেই কিছু দাগ পড়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সেনারা প্রশংসনীয়ভাবে যে কোন ধরণের প্রতিশোধমূলক তৎপরতা ঠেকানোর চমৎকার কাজটি করেছিল। কিন্তু মুজিব বাহিনী মনে করছিল ভারতীয় সেনারা বিহারীদের বাঁচাতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উদ্যোগ নিয়েছিল।

ভাষা একটি শক্তিশালী বস্তু। মোহাম্মদপুর এবং মিরপুরে বিহারী কলোনীগুলো পাহারা দেয়ার সময় বিহারীদের মুখে তাদের নিজেদের ভাষা ওনতে পেয়ে ভারতীয় সেনা সদস্যরা বিহারীদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। অনেক বিহারীই ভারতীয় সেনাদের সাথে স্বত্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো ভারতীয় সেনা এবং বিহারীদের মধ্যে মাত্রাতিক্রিক সৌহার্দ্য প্রদর্শিত হয়েছিল। কিন্তু যে বিষেষের থেকে মুজিব বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দেয়ার কারণটি ছিল আরও গভীর। প্রতিটি মুক্তিযুক্তেই ‘স্বত্য করার স্বপ্ন’ থাকে, ব্যর্থ হলে যেমন দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে তেমন সাফল্য পেলে থাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা, এবং প্রতিশোধের সুযোগ হল এসব পুরস্কারের মধ্যে অন্যতম।

একজন ভারতীয় জেনারেল যিনি তার বাঙালী প্রাক্তন সহযোগিদের মধ্যে এই বিষেষ সম্পর্কে অবগত ছিলেন তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়ার অন্য একজন জেনারেলের পদ অতোটা বড় ছিল না, তারপরও যেহেতু ঐ জেনারেল তখন মাঠ পর্যায়ে যেখানে সব ঘটছে সেখানে ছিলেন, তাই তার মতকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর যখন পাক বাহিনী ঢাকায় যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করছে তখন জেড. এ. ভুট্টো ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানে থাকা তার শুভাকৃতকীর্তি চাইছিলেন তিনি যেন দ্রুত দেশে ফিরে আসেন, কিন্তু তিনি জানতেন মার্কিন সমর্থন ছাড়া তার পক্ষে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্তানে ফিরে আসার আগে ১৮ ডিসেম্বরে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিঙ্গনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎ করেন।

১৯৬৯ সালের মার্চ সারা পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন যখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে আর রাষ্ট্রপতির পদ ধরে রাখা সম্ভব হয়নি, তখন তিনি সে সময়কার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা দিয়ে পদত্যাগ করেন। আইয়ুব ২৪ মার্চ ১৯৬৯ এ ইয়াহিয়াকে লেখা চিঠিতে বলেন ‘পাকিস্তানের সেনা বাহিনী যা এই মুহূর্তে একমাত্র কার্যকর ও আইনসিঙ্ক প্রতিষ্ঠান যা দেশের সকল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারে, সেই বাহিনীর কাছে দায়িত্ব বৃদ্ধিয়ে দিয়ে পদত্যাগ করা’ ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না। তিনি ইয়াহিয়াকে অনুরোধ করেন যেন ইয়াহিয়া শুধু বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা নয়, পাশাপাশি দেশের ভেতরের অস্থিতিশীল অবস্থা থেকেও দেশকে বাঁচিয়ে তার ‘আইনি ও সংবিধানিক দায়িত্ব’ পালন করেন।

এগারো বছর ধরে বিনা বাধায় দেশ শাসন করেছেন এমন একজন সেনা শাসকের পক্ষ থেকে এটি ছিল একটি ব্যর্থতার স্বীকারোক্তিমূলক পত্র। তারপরও তিনি আশা করছিলেন যা তিনি নিজে পারেন নি তা আরেকজন জেনারেল পারবেন।

পাকিস্তানের একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ জি. ডাব্রিউ. চৌধুরী^১ বলেছিলেন যে আইয়ুব খান তার আসন ইয়াহিয়া খানের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু শয়ঃ আইয়ুব যে সংবিধানের প্রবক্তা ছিলেন, সেই সংবিধানে রাষ্ট্রপতির অন্য কারণ ও জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ানোর কোন সুযোগ ছিল না, রাষ্ট্রপতিকে তার অক্ষমতার কারণে অভিশাংসিত করা বা তাকে সরিয়ে দেয়ার সুযোগ সেখানে থাকলেও কোন ক্রমেই রাষ্ট্রপতিকে অন্য আরেকজনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে দাঁড়ানোর সুযোগ রাখা ছিল না। এর পাশাপাশি ‘দেশের অভ্যন্তরের বিশৃঙ্খলা আর দাঙা ঠোকনো’র দায়িত্বও সংবিধানে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের উপর অর্পণ করার কথা লেখা ছিল না।

আইয়ুব খান দেশে সেনা শাসন কায়েম করতে চেয়েছিলেন। সেনাবাহিনীও সেনা শাসন কায়েম আগ্রহী ছিল, তবে তারা আইয়ুব খানকে বাদ দিয়ে সেনা শাসন কায়েম করতে চাইছিল। ইয়াহিয়া খানের নিজেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তিনিই আইয়ুব খানকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, ঠিক যে পক্ষাতিতে আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবরে ইক্সান্দার ঘর্জাকে সরিয়ে গিয়ে বসেছিলেন। জেনারেল জিয়াউল হকের ভাষায় পাকিস্তানের রক্তপাতাহীন অভ্যাসানের সংস্কৃতি অব্যাহত ছিল।

পরে কোন এক সময় ইয়াহিয়া খান সৎ স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছিলেন, “জনগণ আমাকে ক্ষমতায় বসায়নি, আমি নিজেই ক্ষমতায় এসেছি।”

জনগণের কাছে তার কোন জ্বাবদিহিত ছিল না। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর থেকে জনগণ নয় বরং পাকিস্তানি জেনারেলরাই দেশটির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে আসছিলেন।

বিতীয় দফায় আসা সেনা শাসন দেশে সংস্নীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠতে থাকা গণ আন্দোলন দমন করতে সমর্থ হয়। সরকার তখন এমন কি গণতন্ত্রের ডেক ধরে থাকাও বন্ধ করে দেয়, এবং আইয়ুব খানের শেষ সময়ে সেনা বাহিনী যতটা ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাদের ক্ষমতা তার চেয়ে বেড়ে যায়।

পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) বিতীয় দফা সেনা শাসন কায়েম হওয়ার প্রথম খেকেই এর বিকল্পে জনতা সোচার হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার বন্দর নগরী চট্টগ্রামে শ্রমিকরা ধর্মঘট তরঙ্গ করে, উন্নত বঙ্গে কৃষকরা মিছিল বের করে এবং পুলিশ টেক্ষনগুলোতে হামলা চালায়। ঢাকা সহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদী দেয়াল লিখন দেখা যেতে থাকে। এরকমই একটি দেয়াল লিখনে লেখা ছিল, “আমরা বাংলায় বিতীয় দফা পাঞ্জাবী আঞ্চাসনের দ্বিতীয়ে।”

পাকিস্তানে ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে ইকোনমিস্ট পত্রিকায় লেখা একটি সম্পাদকীয়’র শিরোনামটি বেশ মজার ছিল, “টুইভল খান ক্ষমতা দখল করেছেন।”

১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ উইনস্টন চার্চিলের হাস্যকর অনুকরণ করে আইয়ুব গান বলেছিলেন, “আমি আমার দেশের মৎস দেখতে চাই না।” দেশ মৎসের যে অপকর্ম তিনি নিজে তর করেছিলেন তার অবশিষ্ট দায়িত্বকু তিনি তার অনুসারীর জন্য রেখে গিয়েছিলেন।

ঢাকায় পাকিস্তানিদের লজ্জাজনক হারের পর, ইয়াহিয়া খানকে পদত্যাগ করতেই হত, কিন্তু ঠিক সাথেই আরেকজন জেনারেলের দেশ শাসনের দায়িত্ব নেয়া সম্ভব ছিল না। জেনারেলরা দেশ শাসনের জন্য ভূট্টোকে বাজাই করেছিলেন। ভূট্টোর যেমন সেনা বাহিনীর সমর্থন দরকার ছিল, তেমনি সেনা বাহিনীরও অস্তুত তখনকার মত ভূট্টোকে প্রয়োজন ছিল।

ইয়াহিয়া খানের পরিবর্তে ভূট্টোর দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজে লেখা হয়, “সরকিতুতে ভজগুট পাকিয়ে ফেলেন এমন একজন ব্যক্তির পরিবর্তে একজন সুযোগ সঞ্চানী লোককে পাওয়া গেছে।”

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় পাকিস্তানের পরিষত্তির জন্য ভূট্টোকে দায়ী করা হয়, “কিন্তু” এর পাশাপাশি বলা হয়, “তার দ্রুত পক্ষ পরিষত্তি করার ক্ষমতা পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সেবায় কাজে আসতে পারে।”

ক্ষমতা ও ভগুমী

তাজউদ্দীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মার্কিন সরকারের ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত বিত্তশুল্ক ছিলেন, তিনি ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ বলেন মার্কিন সওম নৌ বহর নিচয়ই মাছ ধরার জন্য বঙ্গোপসাগরে আসেনি।

ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের মতে বঙ্গোপসাগরে পরমাণু শক্তি চালিত উড়োজাহাজ পাঠানোটা ছিল 'প্রাচীনপূর্ণী ও অদৃবদ্ধী' চিন্তার ফল। তখু মার্কিন নাগরিকদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিরাপদে সরিয়ে আনার জন্যই এটি করা হয়েছিল কি না এ বিষয়ে ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল সদেহ প্রকাশ করে।

মাত্র কয়েকশো মার্কিন নাগরিককে সরিয়ে নেয়ার জন্য একটি আন্ত নৌ বহর পাঠানো হয়েছিল? যাই বলা হোক না কেন যে সব বিদেশী নাগরিক ঢাকা ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন তারা সবাই ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর মধ্যেই ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন।

ঐ প্রত্রিকায় বলা হয়, "সাধারণত এ ধরণের সিদ্ধান্তের পেছনে যে কারণ দেখানো হয়ে থাকে তা হলো, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি 'পরাশক্তি' সেহেতু যখনই কোথাও গোলযোগ দেখা দেয় সেখানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রদর্শন করা উচিত যাতে করে সংকট সমাধানের জন্য যে সিদ্ধান্তে পৌছানো হয় সেটিতে মার্কিন প্রভাব থাকে।" এখানে শুধুই প্রতাকা দেখানোর জন্য নৌ বহর পাঠানো হয়নি।

১৯৬৫ সালের এপ্রিলে মার্কিন মেরিন সেনারা ডমিনিকান রিপাবলিকে অবতরণ করেছিল, যাকে এভাবেনের ভাষায় 'মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার নামে সেখানে আসলে মেরিন সেনারা যেসব বিদ্রোহীরা নির্বাচিত সরকারকে পুনর্বাসিত করতে লড়াই করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো।'

যে মার্কিন টাঙ্ক ফোর্স বঙ্গোপসাগরে যোতায়েন করা হয়েছিল তার নামকরণ করা হয়েছিল ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতপূর্ণভাবে, "ওহ, কোলকাতা!"

আন্দোলন মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে লেখা খোলা চিঠিতে লিখেছিলেন, "যদি আপনার বিমানবাহী বণ্টতার পক্ষে কোলকাতায় আক্রমণ করা সম্ভব হত, তারপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই মৃত্যুর মিছিলে থাকা জনতার সাথে লড়াইয়ে যুক্ত হতো না। এবং যখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী, অর্ধেৎ আপনার দেশের সেনাবাহিনী ভিয়েতনামের নগপুর যোকাদেরকে হারাতে পারেনি, তখন আপনি কি সত্তিই বিশ্বাস করেন যে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের দেশ থেকে ১২০০ মাইল দূরের একটি দেশ যা স্বাধীনতার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ছিল সেই দেশটি পুনর্দখল করতে সক্ষম হতো?"

বাধীনতা সংযোগের সময় বাংলাদেশে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটেছিল তার উত্তীর্ণতা এতো বেশি যে, সি. এল. সুলজারবাগের ভাষায় তা ‘মানুষের সমবেদনা পরিমাপকারি ডলরিমিটারের সীমা’ অভিক্রম করে গিয়েছিল। তবুও মার্কিন নীতি নির্ধারকরা এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি।

অপ্রচ ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর যখন মুক্তিযুদ্ধ খুব দ্রুত বেগে একটি পরিষ্কারির দিকে যাচ্ছিল তখন কিসিঞ্চার পূর্ব বাংলায় অবস্থানকারি ১.৪ মিলিয়ন বিহারীর ভাগ্য নিয়ে এতেটাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাদের বাঁচাতে ‘একটি আন্তর্জাতিক মানবিক উদ্যোগ’ নেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি তৎক্ষণিকভাবে ‘ব্যাপক রক্তপাত ঠেকাতে’ একটি অভিযান শুরু করতে চেয়েছিলেন।

ঐ একই বৈঠকে জনসন এলেক্সিস বলেছিলেন, যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি ‘তলা বিহীন ঝুড়ি’ হিসেবে দেখা দিবে। জবাবে কিসিঞ্চার নাকচ করে দিয়ে নালেন, “ঐ তলা বিহীন ঝুড়ির দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে এমন নয়।”

কিসিঞ্চারের মানবিকতা বাঙালীর জন্য জেগে ওঠেনি। তার দরদ ঢিল শুধু বিহারীদের জন্য যারা তার মতে ছিল ভালো পাকিস্তানি।

১৫ এপ্রিল জাকাৰ্তা টাইমস এ লেখা হয়: “রাজনীতিক, চিকিৎসক, ছাত্র, চিকিৎসক, শিক্ষক এবং নারী ও শিশু সহ নিরস্ত্র মানুষজনকে পূর্ব পাকিস্তানে হত্যা করা হচ্ছে। সারা মুসলিম বিশ্ব কি এ কষ্ট ডোগ করবে? ইসলাম কি সশস্ত্র মুসলিমদের দ্বারা নিরস্ত্র মুসলিম নিদান অনুযোদন করে? ইসলামী আদর্শের দ্বারা কি সামাজিক ও অগনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য সংখ্যা গবিন্টের দাবি সংস্থালগুদের দ্বারা দমন করা বৈধ করা যায়?”

মুসলিম বিশ্ব এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয়নি; তারা কোন ধরণের প্রতিক্রিয়াটি তথ্য পর্যন্ত দেবায়নি। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তেহরানের পত্রিকা কাহয়ান হঠাতে বুবাতে পেরেছিল যে পৃথিবীর এক পক্ষমাণ মুসলিম বাংলাদেশ সমসাস করে। তবে অবশ্যই তারা বাংলাদেশে বসনাসকারি অবাঞ্চলি মুসলমানদের নিয়েই ভাবিত ছিল।

১৯৭২ এর ১৫ মার্চ কাহয়ান পত্রিকা জেদা কনফারেন্সের মাধ্যমে যে মীমাংসা যিনি নেয়া হয়েছিল তার আওতায় দ্রুত কাজ শুরু করে ‘এ অঞ্চলে ভাতৃহত্যা বক্ষের উদ্যোগ’ এবং ‘চাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের সূচনার উদ্যোগ’ গ্রহণ করা উচিত বলে মন্তব্য করে।

যখন পূর্ব পাকিস্তানে পুরুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছিল এবং নারীদের সন্ত্রমহানি করা হচ্ছিল তখন তা ঢিল সম্পূর্ণ পাকিস্তানের অভাস্তুরীণ নাপার। কিন্তু যখনই বিহারী মুসলিমদের বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল তখনই ভাতৃহত্যার কথা উঠল।

এটি ছিল সবচেয়ে জন্মন্য বি-মুসলীম নীতি।

তেহরানের এই পত্রিকাটি মুজিব বিষয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে আরেকটু উদার হতে দাবি করছিল। তাদের মতে মুসলিম বিশ্ব যদি মুজিবকে সম্পূর্ণ বয়কট করে তাহলে, মুজিব আরও বেশি করে ‘ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন, যে ভারত খুব সহজে মাঝ থেকে সরে দাঁড়াবেন।’

১৯ মার্চ ১৯৭২ এ-টুষ্ট আবদুর রহমান মুজিবের কাছে ‘আল্লাহ’র নামে’ ফরিয়াদ জানান যেন মুজিব তার ব্যক্তিগত প্রভাব থাটিয়ে বাংলাদেশের অবাঙালী মুসলিমদের রক্ষা করেন। তিনি অবাঙালী মুসলিমদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত করার জন্য ছয় জাতির একটি প্রতিনিধি দলকে ঢাকায় আসার অনুমতি দেয়ার জন্য আবেদন করেন। ঐ প্রতিনিধি দলটিকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করে বঙ্গবন্ধু বলেন, “অত্যন্ত দুঃখের সাথে শ্যারণ করাতে হচ্ছে যে গত নয় মাসে যখন পাকিস্তানিরা ঠাণ্ডা মাথায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করে, তখন আপনারা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলামন রাষ্ট্রে নির্যাতিত নিরপরাধ মুসলমান এবং অন্য ধর্মাবলীদের রক্ষার্থে কোন উদ্যোগ নেননি।” জবাবে টেক্সু আদুল রহমান জানান যে সে সময় পাকিস্তানিরা যে হত্যায়জ্ঞ চালিয়েছিল তা সম্পর্কে তাকে কিছু জানানো হয়নি।

সারা পৃথিবী যা জানতো তা তাকে আলাদা করে জানানো প্রয়োজন ছিল কি?

বাংলাদেশে দেশ বিভাগের সময় আসা শরণার্থীদের সিংহভাগ ভারতের বিহার থেকে এলেও, উর্দুভাষী শরণার্থী তা সে ভারতের যে অংশ থেকেই আসুক না কেন তাদের বাঙালীরা বিহারী হিসেবে চিহ্নিত করত। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ত্যক্তির রকম ভারত বিদ্যুতী ছিলেন এবং পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেতেন। তারা ছিলেন তুলনামূলকভাবে বেশি সুযোগ সুবিধাভোগকারী সংখ্যালঘু, এদেশে আসার পর তাদের উন্নতি হয়েছিল- তবে অবশ্যই তাদের স্বার উন্নতি হয়নি। কিন্তু গড় পরাদ। এসদের অধিকারি বিহারীদেরকেও ‘পাকিস্তানি প্রভৃতির স্থানীয় প্রতীক’ হিসেবে বিবেচনা করা হত, এমন কি ঢাকার উপর পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ঙ্কর আক্রমণের আগে থেকেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অনেক বিহারীই পাক বাহিনীর তথ্য সরবরাহকারি হিসেবে কাজ করেছিল বা লভন টাইমসে যেভাবে লেখা হয়েছিল, বিহারিরা “পাক বাহিনীর লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞে তাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল। তারা বৃহৎ সংখ্যায় ‘রাজাকার’ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছিল, এই বাহিনীটি ছিল এক ধরণের অনুগত স্থানীয় বাহিনীর মত...”। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপকর্মের সাথে বিহারীরা এত ওতোপ্রেতভাবে জড়িয়ে ছিল যে অনেকেই আশঙ্কা করেছিল যে যুক্ত শেবে তাদের উপর প্রতিশোধমূলক হামলা হতে পারে। স্থানতার পর কিছু বিহারীকে হত্যা করা হয়, কিন্তু একইভাবে কিছু বাঙালী যারা

পাকিস্তানি বিহারীকে সহায়তা করেছিল তাদেরও হত্যা করা হয়েছিল। ৯ মার্চ ১৯৭৩ এ লন্ডন টাইমস পত্রিকায় লেখা হয়, “এটা সবাইকেই অবাক করেছিল যখন ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে দেশ বাধীন হওয়ার পর বিহারী জনগোষ্ঠীর ওপর কোন প্রতিশোধমূলক ব্যাপক হামলা হয়নি।”

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একজন বাঙালী উপন্যাসিক বলেছিলেন, “এদেশে বিহারীরা আলজেরিয়ায় ফরাসী উপনিবেশকারিদের মত- আসলে তার চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করে, কিন্তু সব সময় তাদিয়ে পাকে পঞ্চম পাকিস্তানের দিকে। তারা নিজেদেরকে বাঙালীর চেয়ে উন্নততর মান করে, অন্যদিকে পঞ্চম পাকিস্তানিরা তাদের কে অবজা করে। তারা শাসক সামরিক জান্মার হাতের গুটি মাঝ, এই বোকারা বুঝতে পারেনা তারা ক্রমাগত বাবদ্বৃত হচ্ছে, এবং তাদের উপর্যোগিতা শেষ হয়ে গেলে তাদেরকে ছুড়ে ফেলা হবে। তাদের হয়তো আবার অভিবাসন করতে হবে, কিন্তু পঞ্চম পাকিস্তান কখনো তাদের গ্রহণ করবে না।”

বিহারীরা পাকিস্তানের প্রতি অনুগ্রাত ছিল এবং তারা বাংলাদেশের জন্য ক্ষমতি স্বীকৃত ছিল। তারপরও তাদের মধ্যে যারা বাংলাদেশে পেকে গেতে চেয়েছিল তাদের বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে নিয়েছিল, এমন কিং মুক্তিযুক্ত চলা কালে তাদের ভূমিকা কি ছিল তা নিয়ে তাদের কোন প্রশ্নের মুখেও পড়তে চল্লিন। এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল এক প্রজন্ম পরেও এসব বিহারী বাংলাদেশের সামীনতার সাথে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, কিন্তু তারপরও মুক্তিব তাদেরকে একটি মার্মান্ত সমস্যা হিসেবে দেখেছিলেন এবং ডেবেছিলেন তিনি তাদের মন জিতে নিতে পারবেন।

কিছু কিছু পাকিস্তানি পত্রিকা বিহারীদের ‘সত্যিকারের পাকিস্তানি’ নলছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার যে সব বিহারী পাকিস্তানে যোগে চেয়েছিল তার একটি শূল ক্ষুদ্র অংশকেই তথ্য সে দেশে নিয়ে যেতে রাজি ছিল। লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিক পিটার প্রেস্টনকে ১৯৭২-এর ১ মার্চ ডুয়ো বলেছিলেন, “আজ্ঞা হতভাগ্য বিহারীরা! তারা এ নিয়ে দুবার তাদের জন্য প্রতিশ্রুত ভূমিতে স্থানান্তরিত হয়েছেন। একবার দেশ নিভাগের সময়। এখন তারা ব্যপ্ত দেগছেন পাকিস্তানে আসার। পঞ্চম পাকিস্তানে জাতীয়তা নিয়ে আমাদের নানা রকম সমস্যা রয়েছে এবং আমরা আমাদের নিজেদের দেশের মানুষের কাছেও অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে রয়েছে।”

আহা হতভাগ্য বিহারী!

তাদের ‘প্রতিশ্রুত ভূমি’ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। দেশ নিভাগের স্বচ্ছে বড় বোকা ছিল এই বিহারীরাই।

১৯৪২ এর ১০ জানুয়ারির সাংবাদিক সম্মেলনে নিম্নোন প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, ঐ দিনই শেখ মুজিব দেশে ফেরত আসেন, সৌদিন সংবাদ সম্মেলনে নিম্নোন উদাস কঠে বলেন, “আমরা এক নৃতন সম্পর্ক গড়ে তৃলতে যাচ্ছি যা হবে ভারত-মুঠি, বাংলাদেশ-মুঠি, পাকিস্তান-মুঠি এবং সর্বপোর শান্ত-মুঠি।” তিনি আরও বলেন, “আমাকে ভারত বিরোধি বলা হলেও আমি মনে করি আর্ম যুদ্ধ বিরোধি। অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে তুল হয়েছে, কিন্তু আমাদের নীতির উদ্দেশ্য ছিল যুক্ত টেকানো, যখন যুক্ত চলমান ছিল তখন আমাদের পক্ষে যা কিছু সম্ভব ছিল আমরা করেছি এবং এখন যুক্তের শেষে আমরা যুক্তের ক্ষত সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।”

শান্তকামা এবং যুক্তের ক্ষত সারানো নিয়ে অতি উৎসুক নিম্নোন মার্কিন কংগ্রেসের কাছে একটি রিপোর্টে নিশ্চিত করেন যে, “আমরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেয়েছি যে পাকিস্তানিরা মুজিবকে হত্যা করবে না।” তিনি বিজ্ঞারত কৃত জানানন্দ। সে সময় ইসলামাবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনকারি জোসেফ ফারল্যান্ড ইতিহাসের পাতায় তার জ্যোগা হবে বলে দ্বাব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “যখন ইতিহাস লেখা হবে তখন সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি এবং তাদের আর্থিক পর্যায়ের উদ্দোগের ফলেই যে মুজিবের জীবন গঞ্জ পেয়েছিল তা উল্লিখিত থাকবে।”

মার্কিনরা মুজিবের জীবিত থাকার জন্য কৃতিত্বের দাবি করছিল, কিন্তু মুজিবের অক্ষত অবস্থায় ঢাকায় ফেরাটা তাদের অহামকায় আধাত করেছিল। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কার্ডিপলে হেনরি কিসিঞ্চারের সহযোগী হিসেবে কাজ করা রজার মারসের মতে, মুজিবের ঢাকায় ফিরে বৌরের সংবর্ধনা পাওয়াটা ‘সম্ভবত ক্যান্সে একটি টাকে চড়ে হাতানা প্রবেশ করার পর মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির জন্য সবচেয়ে অপমানকর মুহূর্ত।’

কিসিঞ্চারের ‘বিদেশি শক্তি’র তালিকায় আলেন্দে, খিউ এবং মুজিব এই তিনি জন ছিলেন তার সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তি।

সালভাদার আলেন্দে চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে ও পরে তার বিরুদ্ধে কৃত্স্না রটনা করার যে অভিযান মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) চালিয়েছিল তার মূল পরিকল্পনাকারি ছিলেন কিসিঞ্চার। মার্কিন সিনেটের গোয়েন্দা তৎপরতা সংক্রান্ত কমিটির একটি রিপোর্টে বলা হয় সিআইএ ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৩ এই সময় কালের মধ্যে চিলিতে আলেন্দে বিরোধী অপপ্রচার চালানোর জন্য ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করেছে। আলেন্দে বিরোধী এই অভিযানের অংশ হিসেবে ১৯৭০ সালে আলেন্দে যেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করতে না পারেন সে জন্য একটি সামরিক অভ্যর্থনা ঘটানোর চেষ্টাও ছিল।

কিসিজ্ঞারের ৪০ টি কমিটি এবং সিআইএ যৌথ প্রচেষ্টা চলিয়েও আলেন্দের রাষ্ট্রপতি হওয়া ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি, কিন্তু তারা মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে একটি সমবোতায় পৌছাতে পারে ‘যার ফলে চিলির উপর অর্বান্তিক চাপ দেয়া হয় এই আশায় যা ভবিষ্যতে আরেকটি অভ্যর্থানের পথ সুগম করবে।’

৮৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে চিলির বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেয়ার যে কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল সেটির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উৎস থেকে খণ্ডের সরবরাহ কর্ম যাওয়া এবং চিলির ক্ষেত্র খণ্ডগুলোতে ধর্মঘটের ফলে দেশটির অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে।

১৯৭০ সালে আলেন্দের ক্ষমতায় যাওয়া ঠেকানো যায়নি, কিন্তু ১৯৭৩ সালে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া গিয়েছিল।

কিসিজ্ঞার মনে করতেন চোট ছোট দেশগুলোর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার ছিল এবং তার পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তিনি ধরে নিতেন তারা তার কাজকে কঠিন করে তুলছে। কিসিজ্ঞারের অনেক চেষ্টা সংকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল। এটিকে তিনি নিজের ব্যক্তিগত পরায়ণ হিসেবে দেখেছিলেন। মরিস বলেছিলেন যে ‘কিসিজ্ঞারের কৃটনীতিতে ব্যক্তিগত পচন্দ অপচন্দ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং সে কারণে প্রতিশোধও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’ মুজিব সম্পর্কে কিসিজ্ঞারের মূল্যায়ন ছিল যে ‘মুজিব একজন গোঁয়ার প্রকৃতির বাজানৈতিক মেতা যিনি সমজা বিশ্ব নিয়ে কিসিজ্ঞারের মহা পরিকল্পনা ভেঙ্গে দিচ্ছিলেন।’

নিম্নলিখিত নিজের স্বার্থ রক্ষায় যে কোন কিছু করার মত লোক ছিলেন। কিসিজ্ঞার তার পরিকল্পনা বাস্তুবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন যে কাউকে বিনা ইধায় ইত্যা করতে পারতেন। তবে যাই হোক, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর মাঝাত্তিক মনযোগ দিলে তা ডুল দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

মরিসের মতে বাংলাদেশ ‘স্বাধীন হওয়াটা বিশ্বের ক্ষমতায় কোন বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসেনি এবং দীর্ঘ যোরাদের বিবেচনায় বাংলাদেশের আবির্ভূত হওয়াটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোন কৌশলগত পরাজয়ও ছিল না।’ কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরে ১৯৭১-এ যখন ঢাকা স্বাধীন হল তখন মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে এমন মনে হয়নি।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে নিউইয়র্ক টাইমস ছাপে, “পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে সংকটে পড়েছে তা একই সঙ্গে মার্কিনীদের জন্যও একটি সেনা সংকট। শেষ মুহূর্তে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে যাঙ্কেকে তারা যেন তারতাকে নিবৃত্ত করে এমন বিফল সন্তর্ক্ষণ পাঠানো বা বিমানবাহি ব্রণতরী সম্মত টাঙ্ক ফোর্সকে বঙ্গপোসাগরে পাঠানো—এসবের কোন কিছুই গণতান্ত্রিক বিশ্বের সামানে (এখানে বিশ্বেভাবে জোর দেয়া হয়েছিল) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মান-মর্যাদা রক্ষার্পে এই দুর্যোগ লুকাতে বা দূরীভূত করতে কাজে আসেনি।

পরিকাটি আশঙ্কা প্রকাশ করে 'এই দুর্ঘোগের ফলে উজ্জ্বলশীল অন্যান্য দেশে
প্রতিষ্ঠানসমূহের খাদ্যনির্ভাব পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া সহায়তাকে প্রশ়্ণবিদ্ধ
করতে পারে।'

খাদ্যনির্ভাব প্রতিষ্ঠানের সামরিক জাতা?

যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাক্তনীদের অব্ধওতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, তখন তাদের
অন্যান্য অনুগত রাষ্ট্রগুলো কিসের ভিত্তিতে মার্কিন আশাসের উপর ভরসা রাখবে?

পূর্ব প্রাক্তনীদের মার্কিন কনসাল জেনারেল হিসেবে কর্মরত থাকা হারবার্ট স্পিডাক
আশঙ্কা করছিলেন বাংলাদেশ খাদ্যনির্ভাব হওয়ার পর হয়তো এখানে মার্কিন কনসাল
জেনারেলের পদটি অবৈধ হয়ে যাবে। ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বরে ওয়াশিংটনে
পাঠানো এক তারবার্তায় তিনি লিখেন, "চাকা খাদ্যনির্ভাব বাংলাদেশের ভূ-ভাগের
অগ্রর্দৃষ্টি হবে বলে অবস্থাদৃষ্টি মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এখানে দৃতাবাসের কার্যক্রম
চালিয়ে যাওয়ার কোন আইনি ভিত্তি থাকবে না এবং যে সমস্ত কর্মকর্তা এখানে
থেকে যাবেন তাদের প্রতি জনতা ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গ হবে বৈরি।"

যে সমস্ত মার্কিন কৃটনীতিক ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন তাদের সৌভাগ্যক্রমে
স্পিডাকের এই আশঙ্কা বাস্তবে ঝুঁপ নেয়ানি। প্রায় সকল বাঙালীই নিখ্বল
প্রশাসনের উপর ঝুঁক ছিল, কিন্তু মার্কিন দৃতাবাসের কর্মকর্তাদের তারা
বাংলাদেশীর প্রতি সমব্যর্থী হিসেবেই জানতেন এবং দৃতাবাসের লোকদের উপর
তাদের কোন বিশেষ ক্ষোভ ছিল না।

১৯৭১-এর মার্চে পাক বাহিনী যখন নৃশংস হামলা চালায় তখন মার্কিন সরকার এ
বিষয়ে নিশ্চৃণ থাকায় এর প্রতিবাদ করে সে সময় মার্কিন দৃতাবাসের কনসাল
জেনারেল আর্টার কে.ব্রাউন ওয়াশিংটনে একটি পিটিশন পাঠান।

জুন মাসে তাকে সরিয়ে দিয়ে স্পিডাককে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু ব্রাউন বাংলাদেশ
ত্যাগ করার আগেই তিনি নিজে তৈরি করেছিলেন এমন একটি রিপোর্ট কনসাল
জেনারেলের অফিসে কর্মরত একজন বাঙালী আরও তিনি জন মার্কিন গবেষকের
সহায়তায় বাইরে পাচার করতে পেরেছিলেন। এই রিপোর্টটির সাথে এর আগে
গবেষকরা যেসব রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলেন সেগুলোর তেমন কোন পার্থক্য না
থাকলেও, যেহেতু এর গায়ে 'অত্যন্ত গোপনীয়' কথাটি লেখা ছিল এবং যেহেতু
এটি 'পাচার' করা হয়েছিল তাই এই রিপোর্টটি গুরুত্ব পায়।

এই রিপোর্টে বলা হয়, "দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভূত হওয়াটা
অবশ্যিক্তাৰী মনে হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল তা ঘটার আগে কি পরিমাণ রক্তপাত
ঘটবে। রাজনৈতিকভাবে এটা বোৰা যাচ্ছে যে খাদ্যনির্ভাব আসতে যত দেৱী হবে
ততোই যুক্তিযুক্তির নিয়ন্ত্রণ মধ্যমপৰ্যুৱা আওয়ামী লীগের হাত থেকে আরও বেশি
বামপৰ্যুৱা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (যারা ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে অংশ
নেয়ানি) কাছে চলে যাবে।"

সত্য হলো ব্রাড চিনপছন্দী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)কে নিয়ে অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যতা করছিলেন, এই ন্যাপ ১৯৭০-এর নির্বাচনে অংশ নেয়ান কারণ সে সময় বিচ্ছিন্নতাবে মার্কিন শার্থ এবং চীনের স্বার্থের সাথে পাকিস্তানের স্বার্থের অনেক খনিই মিলে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী নিধনের সময় পাকিস্তান, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার মিহতা দেখে মার্কিন বিপুলী আই। এফ. স্টেন বলেছিলেন, “বিশ্ব বিচ্ছিন্ন ধরণের সব মিহতা দেখেছে, কিন্তু এমন বিচ্ছিন্ন এবং রক্তস্নাত মিহতা এর আগে দেখেনি।”

ব্রাডের সে রিপোর্টটি কৌতুককর মনে হয়েছে, “যে সামরিক শক্তি পাকিস্তানের রাজীনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন গত তিন বছরে তার প্রধান পৃষ্ঠাগুলকে পরিণত হয়েছে।” কিন্তু এর পাশাপাশি রিপোর্টে এও বলা হয়, “১৯৫১ সাল থেকে পাকিস্তান মার্কিন অর্থনৈতিক সহায়তার একজন প্রধান গ্রহিতা হিসেবে রয়েছে এবং ১৯৬৯ সাল নাগাদ এ অর্থ সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌছেছে।” রিপোর্টের তথ্য অনুসারে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পাকিস্তানকে দেয়া মার্কিন সামরিক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৫ থেকে ২ বিলিয়ন ডলার। মার্কিন সরকার কি পাকিস্তানে গণতন্ত্রের স্বার্থে এই বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পাঠিয়েছিল?

এই রিপোর্টটিতেই এ প্রশ্নের জবাব দেয়া আছে, “পাকিস্তান যা এসইএটিও এবং সিইএনটিও এর প্রথম দিককার সদস্য ছিল, তাদেরকে মার্কিন সামরিক সাহায্য দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির ভূলস ঘুণে কম্যুনিস্টদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যাতে এ সাহায্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে সীমান্তে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধটি বাদে এসব উন্নত মানের অক্তাদি ব্যবহৃত হয়েছিল তখন পূর্ব পাকিস্তানের নিরন্তর জন্মতার উপর।”

ব্রাড তার লোটে আরও লিখেছিলেন, “সোভিয়েত ইউনিয়ন আগেও বাঙালীর দাবী দাওয়ার বিষয়ে সংবেদনশীল ছিল না, এবং এখনও নতুন বাংলাদেশকে পরাশক্তিগুলোর প্রভাব বৃক্ষির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হতে দিবে না।”

এই পর্যবেক্ষণটি পরবর্তী ঘটনাবলীর আলোকে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু যে সময়ে এই পর্যবেক্ষণটি দেয়া হয়েছিল তখনকার প্রেক্ষাপটে এটি যথোচিত ছিল। তখনো পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব বাংলার বিষয়ে বিশেষ কোন অগ্রহ দেখায়নি।

ব্রাড তার রিপোর্টে আরও লিখেছিলেন, “যে সব সরকার অসহায় মানুষের উপর অত্যাচার চালায় তাদেরকে মার্কিন অঙ্গ অবশ্যই সরবরাহ করা উচিত নয়।” দিল্লীতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেধ কিটিংও মার্কিন সরকারের কাছে তাংকপিকভাবে পাকিস্তানকে অঙ্গ সরবরাহ বক্ত করতে অনুরোধ করেন।

নিম্নদের প্রতিক্রিয়া ছিল যেমনটি আশা করা যায় তেমনই। যেসব কূটনীতিক তাদের রিপোর্ট পাঠানোর পরিবর্তে 'পিটিশন' পাঠিয়েছিলেন তাদের উপর তিনি প্রচও কৃক্ষ হয়েছিলেন। তিনি কিটিকে নিয়ে তামাশা করেছিলেন এবং ঢাকা থেকে ঢাকের বদলির নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নিম্ন তার 'সকল কর্মীদের জন্য নোট' এ বলেন: "এই মুহূর্তে ইয়াহিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।"

ড্রাইভের পরিবর্তে ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পাওয়া স্পিভাকের সঙ্গেও ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের মাঝে মাঝেই মতপার্থক্য হতো। স্পিভাক যেখানে ঘটনাগুলো ঘটছে "সেখানে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু ফারল্যান্ড ইসলামাবাদে থাকার কারণে ওয়াশিংটন গোটা বিশ্ব পরিস্থিতি কিভাবে দেখছে সে সম্পর্কে বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন।

বাংলাদেশকে স্থীরূপি দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছিল সে সময়টাতে ফারল্যান্ডের সাথে স্পিভাকের যে সর্বজন বিদিত মতবেততা ছিল তার কারণে স্পিভাকের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন ঢাকায় ফিরে আসেন তখন তাকে স্বাগত জানাতে স্পিভাক এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এর দুদিন পর আবু সাইয়িদ চৌধুরী যখন এক্ট্রোপতি হিসেবে শপথ নেন তখন স্পিভাক উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বলেন তিনি এয়ারপোর্টে মুরিবকে দেখতে গিয়েছিলেন ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে।

ইতিমধ্যে ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের সাথে যে কোন ধরণের যোগাযোগ করতে নিষেধ করা হয়।

সিনেটের এডলাই স্টিভেনসন ঢাকায় একটি সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭১ এ বলেছিলেন যে পাকিস্তানিদের ঢাকানো 'ধর্মসংজ্ঞের তীক্ষ্ণতা' এতো বেশি যে 'বিশ্বের ইতিহাসে এর কোন তুলনা পাওয়া যায় না।' তার মতে এটি ছিল, "বাঙালী সংকৃতিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে নেয়া পরিকল্পিত মীড়ি।"

১৯৭১ এ নয় মাসব্যাপী মার্কিন বিশেষজ্ঞরা পাক সেনাবাহিনীকে তাদের ধর্মসংজ্ঞ চালাতে সহায়তা করেছিলেন।

হিউ হাইটের নাম মেজর-জেনারেল রাও ফরমান আলীর সাথে জড়িয়ে ছিল। দৈনিক বাংলা নামের ঢাকার একটি দৈনিক ফরমান আলীর টেবিলে হিউ হাইটের নাম লেখা রয়েছে এমন একটি টেবিল ক্যালেন্ডারের ছবি ছাপার পর হাইট ঢাকা ত্যাগ করেন। ইউনাইটেড প্রেসের আর্নেল্ড জেইটলিন বলেন, "ঐ ছবিটির সাথে হাইটের একটি সুনির্দিষ্ট জীবন বৃত্তান্ত ছাপা হয়েছিল মোটিতে সিআইএর সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গিয়েছিল।"

হাইট চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু অন্যান্য বিদেশি এজেন্টরা নিশ্চয়ই ঢাকায় তাদের তৎপরতা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারকে তাদের নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত মনে হয়নি।

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনো প্রকাশ্যে বাংলাদেশের বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছিল, তবুও দুই একজন বাঙালী মার্কিন সরকারের নিম্নরুণে সেবানে সফরে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দণ্ডের তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হৃষ্ণকি দিলেও, পরবর্তীতে তাদের কে কিছুই করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের ভিতরেই তাদের ক্ষমতাধর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

ডাও জোনস অর্থনীতি বিষয়ক সাংগীতি ব্যারন'স এ ছাপা হয়, বাংলাদেশ, ঐ দেশটির নেতৃত্ব কল্পনায় আর ভুল পথে চালিত জনমতেই শুধু একটি রাষ্ট্র।" ঐ সাংগীতি পত্রিকাটির মতে বাংলাদেশ 'সোভিয়েত এবং চাইনিজ কম্যুনিজমের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধের জন্য বিদেশের মাটিতে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে' পরিষ্ঠ হতে যাচ্ছিল।

১৯৭১-এর মার্চ এইসব মার্কিন সংবাদ প্রতিনিধিরাই পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র কম্যুনিস্টদের আনাগোনা দেখতে পাচ্ছিলেন। আইন ও সংসদীয় বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন জানিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ বামপন্থী চাপ মোকাবেলা করার জন্য তরম্পদের দলভূক্ত করছিল।

জেইটলিন তার প্রতিবেদনে কম্যুনিস্ট আর আওয়ামী শীগারদের মধ্যে দড়ি টানাটানির খেলা এবং মুজিব আর তাজউদ্দীনের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। মক্ষেপহী বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ন্যাশনার আওয়ামী পার্টি (মুজাফফর) আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানিয়েছিল। চীনপন্থী কম্যুনিস্ট দলগুলো তখনো বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। তাজউদ্দীন মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এটা ভাবাটা ছিল বিরাট বোকামী। যদিও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাজউদ্দীনের ভাবমূর্তি বেড়েছিল, তারপরও মুজিবের হান তারচেয়েও অনেক উর্ধ্বে ছিল। আওয়ামী লীগের ভেতরেই তাজউদ্দীনের অনেক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল, যারা তার উপর প্রতিশোধ নিতে মরিয়া ছিল।

যাই হোক এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে এগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল: এর ফলে মুজিব এবং তাজউদ্দীনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল।

বিজয়ীর প্রত্যাবর্তন

মুজিব নিরাপদ আছেন এমন ইঙ্গিতটি প্রথম পাওয়া যায় ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ। ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে ভূট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের দুদিন পর, ভূট্টো ঘোষণা করেন যে মুজিবকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। একই দিনে মার্কিন এসোসিয়েটেড প্রেসে ব্যবর ছাপা হয় যে, ভূট্টো কয়েকজন পশ্চিম ইউরোপীয় এবং দক্ষিণ আমেরিকান কূটনীতিকের কাছে বলেছিলেন যে মুজিবের মনের অবস্থা তিনি জানেন না। ঐ কূটনীতিকরা ভূট্টোর ভাষ্য হ্বহ তুলে ধরেন, ‘যতদূর আমার মনে হয়, মুজিব আমাকে নরকে যেতে বলতে পারেন।’

ভূট্টো মুজিবকে ভালোভাবে চিনতেন; সে কারণেই তিনি এমন উত্তর প্রত্যাশা করছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের বদ্ধ এবং তার অত্যন্ত বিখ্যাসভাজন হিসেবে পরিচিত ফারল্যান্ডের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে বিশ্বাস করতে হ্যায় যে, ইয়াহিয়া খান তাকে ত্রীন্দের শুরুর দিকে বলেছিলেন, ‘আপনার আমাকে বিশ্বাস করাতে হবে যে মুজিবকে হত্যা করা হবে না।’ কিন্তু প্রতিশ্রূতি তো চিরকালের জন্য দেয়া হয় না।

যখন ইয়াহিয়া খানকে পদচার করা হয়, তার আগে আগে তিনি মুজিবের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছিলেন যাতে তার পরে যিনি রাষ্ট্রপতির আসনে বসবেন তাকে সে পরোয়ানাটি কার্যকর করতে হয়। কিন্তু ভূট্টো যথেষ্ট বিবেচনাবোধ সম্পদ হওয়ায় এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হতে দেননি। অনেকেই ভূট্টোর এ আচরণকে তার মহসূল হিসেবে দেখাতে চাইলেও, প্রকৃত পক্ষে এটি ছিল শুধুই বিবেচনাবোধ থেকে নেয়া সিদ্ধান্ত। যদি মুজিবকে হত্যা করা হতো তাহলে বাংলাদেশে ধাকা ৯০,০০০ এরও বেশি যুদ্ধবন্দীর মধ্য থেকে একজনকেও পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হতো না, জেনেভা কনভেনশনে যাই লেখা থাকুক। এবং যেই মুজিব হত্যার দায় কাঁধে নিক না কেন, এই অপকর্মের কৃগল ভূট্টোকেই ডোম করতে হতো।

নয় মাস ধরে কনডেম সেলে বন্দী থাকার পর মুজিবকে যখন গৃহবন্দী করা হলো তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তানে কোন একটি নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, কিন্তু তখনো তাকে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল এবং আসলে কি ঘটছে তা জানার কোন উপায় তার ছিল না। যখন ভূট্টো প্রথমবারের মত মুজিবকে দেখতে এসেছিলেন তখন মুজিব বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ‘আমি এখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সেনা প্রশাসক’ ভূট্টোর একথার জবাবে মুজিব বলেছিলেন, ‘আপনাকে আবার কবে থেকে একজন জেনারেল বানানো হলো?’

একজন বেসামরিক ব্যক্তি কিভাবে প্রধান সেনা প্রশাসক হতে পারেন তা কোন ক্রমেই মুজিবের বোধগম্য হচ্ছিল না।

ভূট্টো প্রাণপণে চাইছিলেন পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের একটি সম্পর্ক ধারুক, আর তাই মুজিবের প্রতি তিনি খুব সহানুভূতিশীল আচরণ করছিলেন। তিনি মুজিবকে একটি ট্রানজিস্টর সেট উপহার দেন।

ততক্ষণ পর্যন্ত মুজিব কি ঘটে গেছে তা সম্পর্কে শুধু ভূট্টোর ভাষ্যাটিই জানতেন। ট্রানজিস্টরটি পেয়ে তখন তার জন্য বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু নির্ভরযোগ্য সংবাদ শোনার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি প্রথম যে কষ্টটি শোনেন তা তার জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার কষ্ট। দেশ শাধীন হওয়ার পর এক পক্ষ কেটে যাওয়ার পরও তার বাবার কোন খবর পাওয়া যায়নি বলে হাসিনাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। তিনি সাক্ষাত্কার এইভাবে বলেন তার বিয়ের সময়ও তার বাবা কারাবন্দী ছিলেন এবং তার প্রথম পুত্রের জন্মের সময়ও তিনি কারাবন্দী ছিলেন। হাসিনা জানান; ‘আমার বাবা বলেছিলেন যে আমার একটি ছেলে হবে এবং আমি যেন তার নাম রাখি জয়।’ তিনি তার বাবাকে নিয়ে এতেটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে রাজনৈতিক পরিষ্কৃতি নিয়ে ঠিকভাবে কথা বলতে পারছিলেন না।

মুজিব খুবই আবেগাত্মক হয়ে পড়েছিলেন, তার একটি নাতি হয়েছে: জয়। জয় বাংলা! হাসিনা নিরাপদে আছে। তার অন্য চার সন্তান, তার স্ত্রী এবং তার বৃক্ষ পিতা-মাতার কি অবস্থা? তিনি হাসিনার সাক্ষাত্কারের একটি অংশ তনেছিলেন শুধু, এবং তার সিংহভাগ জুড়ে তাকে নিয়েই কথা হয়েছিল। অনেক প্রশ্নের উত্তরই অজানা থেকে গিয়েছিল।

মুজিবের সাথে কয়েকবার দেখা করার পর ভূট্টো জানান, তার আগে দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ মুজিবের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। তিনি সমবেদনার সাথে আরও বলেন, ‘মুজিবের এখন একটু বিশ্রাম প্রয়োজন, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে তিনি সে সুযোগ পাবেন কি না।’

১৯৭২ সালের তৃতীয় জানুয়ারি মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটবে তা নিয়ে ভূট্টোর একটি ঘোষণা দেয়ার কথা ছিল। তৃতীয় জানুয়ারি নিউইয়র্ক টাইমসে লেখা হয়েছিল, ‘মুজিবকে দ্রুত ঢাকায় ফেরত পাঠানোতেই সবার জন্য মঙ্গল। ভূট্টো আজ মুজিবের ভাগ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন বলে যে প্রতিক্রিতি দিয়েছিলেন তার জন্য সারাবিশ্ব অপেক্ষা করে থাকবে।’ এই একই দিনে নিউজ উইক, এডওয়ার্ড বিলো ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর যে সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন তা ছাপে। বিলো প্রশ্ন রেখেছিলেন, ‘যদি এখন মুজিবের মৃত্যু হয় তাহলে কি তিনি বাংলাদেশের নেতৃত্বের যে দ্বিতীয় বিভক্তি দেখা দিয়েছে তা ঠিক করতে পারবেন?’ এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে করা একটি প্রশ্ন।

বিলো সম্বরত মোতাকের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, কিন্তু মোতাকের কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না এবং তার রাজনৈতিক মর্যাদা ছিল আরও কম। তিনি আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন শোক ছিলেন না।

১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে সারা বিশ্বের মতামতের প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যি দিতে যাচ্ছে। ঢাকায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। বপ্রবক্তৃকে মৃত্যি দেয়া হয়েছে এবং তিনি দেশে ফিরে আসছেন এ বিশ্বাস থেকে হাজারো জনতার ঢল রাতায় নেমে আসে, তারা নেচে, গেয়ে, বাতাসে ফাঁকা গুলি চালিয়ে এবং ‘জয় বাংলা!’ শ্লোগান দিতে থাকে। শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে এয়াপোর্ট জড়ো হতে থাকে। কিন্তু তারা একটু বেশি আগেই উদ্যাপন করতে শুরু করেছিল।

মুজিবের জন্য প্রতীক্ষা করে শেষ হবে?

৩ জানুয়ারি রেডিও পাকিস্তান থেকে মুজিব দেশে ফিরে যা যা করবেন তা বর্ণনা করতে থাকে। সেখানে বলা হতে থাকে মুজিব দেশে ফিরে প্রশাসনের দায়িত্ব বুঝে নেবেন এবং ‘পূর্ব পাকিস্তান’ থেকে ভারতীয় সেনা বাহিনী প্রত্যাহার করতে বলবেন।

সবকিছুর চেয়ে ব্যবসা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লভন থেকে প্রকাশিত ফাইনাসিয়াল টাইমস পত্রিকার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল বাংলাদেশ থেকে পাটের সরবরাহ করে বাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়া ডাক্তির পাটকলগুলোর ভাগ্যে কি ঘটবে।

১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার যতোগুলো পাট চুক্তি করেছিল তার সবগুলো বাতিল ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার। কোন নতুন চুক্তি করার আগে বাংলাদেশ সরকার কি পরিমাণ পাট দেশে রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে চেয়েছিল। ৪ জানুয়ারিতে ফাইনাসিয়াল টাইমস লেখে যে বাংলাদেশ সরকারের এমন সিদ্ধান্তে ত্রিটেনের সবচেয়ে বড় আশঙ্কাটি সত্য হল।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ এ শুরু সকালে পিআইএ’র একটি বিশেষ বিমানে করে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শেখ মুজিবকে কোন একটি অপ্রকাশিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ভূট্টো নিজে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শেখ মুজিবকে বিদায় দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে সেই দুর্বোধ্য ঘোষণাটি দেন: ‘পার্থ উড়ে গেছে।’ পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১-এর ২৫/২৬ মার্চে তাদের নিজস্ব গোপন ভাষায় যে ‘পার্থ’কে খাচায় আটকে ছিল সেটি এখন মৃত্যু।

যখন সাংবাদিকরা ভূট্টোর কাছে জানতে চাইছিলেন কেন মুজিব লভনে গিয়েছিলেন, জবাবে ভূট্টো বলেছিলেন, ‘আপনারা নিজের মতো করে এর কারণ বুঝে নিন।’ ভূট্টো জানতেন অন্তত কিছু সাংবাদিক তার কথার ইঙ্গিতটি ধরতে পারবেন এবং তিনি সাংবাদিকদের তাদের নিজেদের মতো করে গল্প তৈরি করতে

সাহায্য করার জন্য তাদের জ্ঞান যে পুরো প্রাক্রিয়াট মুজিবের নিজের ইচ্ছানুসারেই করা হয়েছে। তেহরান থেকে প্রকাশিত কায়হান ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকায় ছাপা হয়, ‘মুজিবের যাত্রা নিয়ে যে গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে তা মুজিবের নির্দেশেই করা হয়েছে।’

লভনে পৌছে মুজিব তার পরিবারের সদস্যদের ফোন করেন, যুক্তের নয় মাস তিনি তাদের কোন ব্যবরহ পাননি।” ফোনে পুরু কামালকে অত্যন্ত উৎসুকিত কষ্টে মুজিব প্রশ্ন করেন, ‘তোমরা কি বেঁচে আছো? তোমাদের মা কেমন আছে?’ বেগম মুজিব এতেওটাই আবেগে আকস্ত ছিলেন যে প্রথমবারে তিনি মুজিবের সাথে ফোনে কথাই বলতে পারেন নি।

মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন একটু দেরীতে শুরু হয়েছিল। লভনে কারিজ হোটেলে মুজিব অবস্থান করছিলেন, সেখানে সমবেত হওয়া সাংবাদিকদের সামনে প্রথমে তিনি একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান। তার প্রথম বাক্যটি ছিল: “আজ আমার নিজের দেশের মানুষের সাথে স্বাধীনতার আনন্দ ভাগভাগি করে নেয়ার জন্য আমি মুক্ত হয়েছি।” তার শেষ কথা ছিল, ‘আমি আবারও নিশ্চিত করে বলতে চাই বাংলাদেশের অস্তিত্ব এখন একটি সম্দেহাতীত বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতার নিরিবেই আমরা অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যে কোন ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করবো।’

মুজিবকে প্রথমেই যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল, ‘আপনি কেন ঢাকায় যাওয়ার আগে লভনে এলেন?’ মুজিব সাথে সাথেই তিক্ততার সাথে জবাব দিয়েছিলেন, “আপনি কি জানেন না আমি আমার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছায় বস্তি ছিলাম।” তিনি আরও যোগ করেন, “আমার নিজের জনগণের কাছে ফিরে যেতে আমার আর তর সইছে না।”

মুজিবকে দেখতে ক্রান্ত আর বিধ্বস্ত লাগছিল, কিন্তু একজন সাংবাদিক বলেন তাকে দেখে বোধ যাচ্ছিল, ‘তার উপর দিয়ে যে বড় বয়ে গেছে তারপরও তখনো চেতনার দিক’ থেকে তিনি সজিব ছিলেন। তাকে একটি কনডেম সেলে রাখা হয়েছিল, বহির্বিশ্বের সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিল না, তারপরও তার মধ্যে সেরকম কোন তিক্ততা ছিল না। ‘তার সাথে যে ভয়ঙ্কর আচরণ করা হয়েছে তারপরও’ পাকিস্তানের জনগণের প্রতি তার কোন রকম বিষেষ দেখা যায়নি। তিনি ভূট্টোর বিরক্তে সরাসরি কোন বিষেদগ্রাহণেও যান নি, তিনি বলেন, ‘আমি তার জন্য শুভ কামনা করি।’

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য মুজিব তাকে ফোন করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, “আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।” জবাবে ইন্দিরা গান্ধীও মুজিবকে ‘২৫ বছরের অক্ষকার সময়ের পর ইতিহাসের মোড় মুরিয়ে দেয়ার জন্য’ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বেগম মুজিব চাইছিলেন তার স্থায়ী যেন যতো দ্রুত স্বত্ব দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু মুজিব ভেবেছিলেন তার অস্তত দিল্লীতে যাত্রা বিরতি দিয়ে ভারতের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্যোগের সময় পাশে দাঁড়ানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

১০ জানুয়ারি সকাল ৮ টায় যখন মুজিব দিল্লীতে পৌছান তখন তাকে ব্যাপক সংবর্ধনা জানানো হয়। ভারতীয়দের কাছেও তিনি একজন নায়কের মর্যাদা পেয়েছিলেন।

মুজিব যখন ভারতের মাটিতে নামেন তখন তাকে ‘জয় বাংলা’, ‘শেখ মুজিবুর রহমান জিনাবাদ’ এবং ‘মুজিব দীর্ঘজীবী হোন’ চিন্কার করে এসব জয়ধনি দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। গোলন্দাজ বাহিনী ২১ বার তোপধনি করে তাকে সম্মান জানায় এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সদস্যরা এয়ারপোর্টের টারমাকে মুজিবকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমায়। আমন্ত্রিত অতিথিদের যখন তাদের জন্য বরাদ্বৃক্ত চেয়ারগুলোর কথা মনে পড়ে তখন তারা সেগুলির উপর উঠে দাঢ়িয়ে যান মুজিবকে আরেকটু ভালোভাবে দেখবার জন্য। এই ব্যাপক জয়ধনির জবাবে মুজিব তার ডান হাত নেড়ে প্রতেক্ষা জানান।

সবার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই মহান নেতা—যিনি উপমহাদেশের ইতিহাস বদলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক সন্তান আগেও তিনি জানতেন না তার নিজের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে, অথচ এ মুহূর্তে তার হাসিমুখ দেখে হাজারো মানুষের হৃদয় জানুয়ারি মাসের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সকালেও উষ্ণ হয়ে উঠছিল।

একটি ব্যাক দল ‘আমার সোনার বাংলা’ এবং ‘জনগণ মন’ বাজিয়েছিল, এগুলো বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। এ দুটি সঙ্গীতই বরীস্বনাম ঠাকুরের লেখা ও সুর করা ছিল, এবং এই প্রথমবারের মতো একই অনুষ্ঠানে বাজানো হচ্ছিল।

ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বাগত ভাষণের জবাবে মুজিব বলেন, ‘অবশ্যে আমি আমার স্বপ্নের সোনার বাংলায় যাচ্ছি নয় মাস পরে, এই নয় মাসে আমার দেশের মানুষ কয়েক শতাব্দি পাড়ি দিয়েছে।’ মুজিবের যাত্রা ছিল ‘বঙ্গীদশা থেকে মুক্তির দিকে, অক্ষকার থেকে আলোর দিকে, হতাশা থেকে আশার দিকে; এবং মুজিব ভারত ও এর জনগণের প্রতি ‘তাদের ক্রান্তিহীন প্রচেষ্টা এবং সাহসী ত্যাগের’ যেগুলোর কারণে মুজিবের এই যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল সে জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন।

মুজিব বলেন, ‘আমার জন্য এটি একটি ব্যাপক কৃতজ্ঞতাময় মুহূর্ত। আমি দেশে ফেরার পথে আপনাদের মহান রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রা বিরতি করেছি। কারণ, আমি মনে করি আপনাদের মহৎ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী’র নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণ যারা আমার দেশের মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্মান প্রদর্শনের জন্য অস্তত এতোটুকু আমার করা উচিত।’

তিনি তার নিজের দেশের মানুষের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন যেখানে শিরে জনগণকে সাথে নিয়ে তাকে বিশাল কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব কাঁধে ভুলে নিতে হবে। তিনি বলেন, “আমি কারও প্রতি কোন বিষয়ে মনে নিয়ে নিজ দেশে যাচ্ছি না, বরং আমার মধ্যে কাজ করছে আত্মাপূর্ণি, কারণ অবশ্যে অসভ্যের বিরুদ্ধে সভ্যের, উন্নাদনার বিরুদ্ধে সুহাতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এবং সর্বোপরি মন্দের বিরুদ্ধে ভালোর জয় হয়েছে।”

এয়ারপোর্টে সংবর্ধনার পরে কৃত্তকাওয়াজের যথানন্দে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মুজিব তার ভাষণ ইংরেজিতে দিতে শুরু করেছিলেন কিন্তু তিনি কেবল ‘লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান’ পর্যন্ত বলতে পেরেছিলেন। জনতার মধ্যে তখন শুন্নন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তারা ঢাইছিল তিনি যেন তার মাতৃভাষা বাংলায় ভাসণ শুনান করেন। মুজিব হেসেছিলেন, তার মাতৃভাষায় ভাষণ দেয়ার চেয়ে ভালো তার কাছে আর কি হতে পারে। শ্রোতাদের মধ্যে সিংহভাগই তিনি বাংলায় যা নলছিলেন তা বুঝতে পারছিলেন না, কিন্তু তার প্রতিটি কথাতেই তারা এমন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল যেন তারা কোন সঙ্গীত উপভোগ করছেন; যখন মুজিব পাকিস্তানিদের অপকর্মের কথা বলছিলেন তখন তারা যেমনভাবে তার বেদনচূর্ণ অনুভব করছিলেন, তেমনি যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা নলছিলেন তখন তারা তার আনন্দের সাথে একাত্মা অনুভব করছিলেন। ‘জনগণ এতো নিশ্চৃণভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে তারা একে অপরের নিখাসের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছিল।’

জনসভা থেকে মুজিন বাট্টপত্তি ভবনে যান ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলাপচারিতার জন্য এবং সেখান থেকে তিনি আবার এয়ারপোর্টে ফেরত আসেন দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য। মুজিব আকাশ থেকে তার সোনার বাংলা দেখতে চেয়েছিলেন। তার অনুরোধে রাজকীয় বিমানবাহিনী (আরএএফ)-এর বিমানটি ঢাকার আকাশ একবার ঢকাকারে ঘুরে এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। আবেগে আর্দ্র হয়ে মুজিব কেঁদে ওঠেন, ‘আমি এখন কি করবো? আমাকে বলে দাও, আমি এখন কি করবো?’

ঢাকা তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ নাচছিল আর হর্ষস্বনি করছিল। রাতের অক্ষকারে এই এয়ারপোর্ট থেকেই পাক সেনারা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই এয়ারপোর্টেই তিনি ফিরছিলেন দিনের আলোতে তার প্রিয় জনতার কাছে। জনতার বিজয় তখন পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল, তাদের আনন্দ তখন সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই স্বাগত জানানোর উৎসবের মতো কোনকিছু পৃথিবীতে কুব অল্পই দেখা গিয়েছিল।

যখন দুপুর একটা বেজে পঞ্জাবীশ মিনিটে মুজিবের বিমানটি অবতরণ করে তখন প্রহরীদের উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ বিমানটির দিকে এগিয়ে যায়। দশ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে মুজিব বিমান থেকে নামতে পার্শ্বে নেমেছিলেন না। এমনকি

যখন কৃটনীতিকদের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছিল তখনও জনতা তাকে চেপে ধরতে চেষ্টা করছিল। শোরগোলের মধ্যে দুজন পাকিস্তানী সেনা সদস্য এয়ারপোর্টের প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। তারা নিরত্ব ছিল, এবং সম্ভবত তারা মুজিবকে এক নজর দেখতেই পাশের ঢাকা সেনানিবাস থেকে সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু তারা সেখানে পৌছালো কিভাবে? সৌভাগ্যজন্মে একজন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা তাদের চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তা না হলে জনতা হয়তো তাদের ছিড়ে ঝুড়ে ফেলত।

এয়ারপোর্ট এবং এর আশে পাশে সেদিন যারা মুজিবকে খাগড় জানাতে হাজির হয়েছিল তাদের মধ্যে হয়তো আরও কিছু বক্তুভাবাপন্ন নয় এমন চোখ ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ঢাকার সব জনতাই যেন সেদিন এয়ারপোর্ট এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (রেসকোর্স ময়দানে) জড়ো হয়েছিল। হাজারো মানুষ তখন আশে পাশের জেলাগুলো থেকে বা আরও দূরবর্তী অঞ্চল থেকে মুজিবকে দেখতে এসেছিল। ছাত্রনেতারা যারা আগৈ জানিয়ে রেখেছিলেন যে তারা এয়ারপোর্টে কিছু বিচারপতি এবং উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার চেহারা দেখতে চান না, তারা মুজিবের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরোপুরি প্রশাসনের উপর ছেড়ে দেননি। শত শত ছাত্র সেদিন জনতার কাতারে যিশে ছিলেন যাতে করে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে।

মুজিব একটি বোলা ট্রাকে চড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তার রাজনৈতিক সহযোগীরা তাকে ঘিরে রেখেছিলেন। পুরো ট্রাকটি ফুল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল, তখন তার সামনের কাচের মধ্যে একটি ছিদ্র সাম্প্রতিক ডয়াবহ অতীতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

ট্রাকটি যখন এয়ারপোর্ট থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে যাচ্ছিল তখন 'জয় বাংলা', 'বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন' এসব স্লোগানের পাশাপাশি ছদ্মে ছদ্মে 'জন্ম নিল নতুন দেশ- বাংলাদেশ, বাংলাদেশ' বলা হচ্ছিল। তিনি কিলোমিটারের কম দূরত্ব থেকে সেদিন ট্রাকটি সময় লেগেছিল দুই ঘণ্টারও বেশি।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ছিল একটি বিশাল এলাকা, এখানেই মুজিব ৭ মার্চ ১৯৭১-এ বক্ষকচ্ছে উচ্চারণ করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' কিন্তু সেদিন যখন তিনি ভাষণ শুরু করতে চাচ্ছিলেন তখন তার চোখজোড়া ছিল অক্ষসজল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তিনি প্রায়ই ঝুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। তার সেই ঝুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা সেদিন তার কথার চেয়েও বেশি আবেদনময় ছিল।

তিনি বলেছিলেন, 'আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার সারা জীবনের স্বপ্ন সত্য হয়েছে।' তিনি স্বাধীনতা যুক্তে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সালাম জানান আর ঘোষণা করেন তাদের রক্ত বৃদ্ধা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, “হে বঙ্গ জননী, ৭ কোটি বাঙালীকে বাঙালী করেছ, মানুষ করেনি।” কিন্তু মুজিব সেদিন বলেছিলেন, এ কথা তখন আর সঠিক ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ সে সময় প্রশংসন করেছিল তারা একটি বীরের জাতি।

মুজিব বলেছিলেন তার সহকর্মীরা তাকে ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর রাতে প্রেফেডার হওয়ার আগে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন এবং অন্যান্যরা কান্নাকাটি করেছিলেন। কিন্তু যে জনগণ তার কাছে তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদের ছেড়ে তিনি পালিয়ে যেতে পারেন নি।

মুজিব বলেন, “আমি তাজউদ্দীনকে তার কাজ চালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলাম।” তিনি তাজউদ্দীন এবং অন্যান্যকে তাদের ‘দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য’ সাধুবাদ জানান। স্বাধীনতার সংহ্যাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তার সহকর্মীদের যাদের প্রচও কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাকিস্তানিয়া নির্দোষ লোকদের হত্যা করেছিল এবং নারীদের সম্মতিহনি ঘটিয়েছিল। এই কাপুরষের দল। তারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে। মুজিব অনতার কাছে আবেদন রাখেন, ‘ওদের প্রতি তোমরা করুণা অনুভব কর।’ যারা অপরাধ করেছিল তাদেরকে বিনা দণ্ডে ছেড়ে দেওয়ার কথা মুজিব ভাবেননি, কিন্তু তার মনে পাকিস্তানের জনগণের প্রতি কোন বিশেষ নিষেধ ছিল না। তিনি তাদের ভালোই চাইছিলেন।

মুজিব বলেন তার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তার জন্য একটি কবরও খোঢ়া হয়েছিল; কিন্তু তারপরও তিনি পাকিস্তানিদের সামনে মাথানত করে করুণা ডিক্ষা করেননি। তিনি একজন মুসলমান হিসেবে, একজন বাঙালী হিসেবে হাসতে হাসতে মরতে প্রস্তুত ছিলেন এবং মৃত্যুর মুখেও তিনি বলতে চাইছিলেন: ‘জয় বাংলা!’ মুজিব পাকিস্তানিদের বলেছিলেন, “তোমাদের আয়াকে মেরে ফেলতে হলে মেরে ফেল, তখন আমার দেহটি বাংলাদেশে পাঠিও।”

ভাষণ দেয়ার সময় মুজিব কথা এলোমেলো করে ফেলছিলেন, তিনি একই কথা বারবার বলেছিলেন, প্রায়ই ভেঙে পড়েছিলেন এবং কাঁদেছিলেন, কিন্তু তারপরও তার এই ভাষণটি সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কান্না চেপে তিনি বলেছিলেন, “আজ আমি আর বেশি কিছু বলতে পারবো না।”

তারপর একটি আবেগঘন পারিবারিক পুনর্মিলনী ঘটে। মুজিব তার মাতা এবং কন্যাদ্যয়কে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তারা তার জন্য বাড়িতেই অপেক্ষা করছিলেন।

ধানমন্ডির ১৮ নামার সড়কে যে বাড়িটিতে পাক বাহিনী তার পরিবারকে আটকে রেখেছিল, রাতে খাবার খেয়ে মুজিব সেখান থেকে পায়ে হেঁটে রাস্তার বিপরীত দিকের একটি বাড়িতে যান, এই বাড়িটি তিনি ফিরে আসার ঠিক আগের দিন তার পরিবারের সদস্যারা থাকার জন্য ভাড়া করেছিলেন। এই অন্য বাড়িটিতে কেউ ছিল না।

মুজিবের মেয়ের জামাই ওয়াজেদ সৌড়ে শিয়ে প্রহরীদের জানান যে মুজিব অন্য বাড়িতে যাচ্ছেন। “এটা বাংলাদেশ” একথা বলে মুজিব সেদিন ওয়াজেদকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ, মুজিবের অতি প্রিয় বাংলাদেশ।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ যদি মুজিবকে সরাসরি ঢাকায় উড়িয়ে নিয়ে আসত তাহলে সেটা হতো সরাসরি না হলেও একভাবে বাংলাদেশকে শীক্ষিত দেয়া। এছাড়াও আরও ব্যবহারিক সমস্যা ছিল। একটি পাকিস্তানী বিমান কিভাবে ঢাকায় অবতরণ করতো?

পাকিস্তান সরকার মুজিবকে পাঠানোর জন্য বেশ কয়েকটি স্থানের কথা বিবেচনা করেছিল এবং তাদের কোনটিই খুব গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। শেষ পর্যন্ত লন্ডনকেই তাদের পছন্দ হয়েছিল, এর বিষয়ে কারও তেমন কোন আপত্তি ছিল না।

জানুয়ারি মাসে সংবাদ সম্প্লেনেই মুজিব এটা স্পষ্ট করেছিলেন যে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষই তাকে লন্ডনে পাঠিয়েছিল এবং একজন বন্দী হিসেবে এক্ষেত্রে তার কিছুই করার ছিল না। এ বিষয়ে আবারও জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার নিজ দেশে ফিরে যেতে আমার আর তার সইচেনা।’ কিন্তু তার এমন সোজাসান্তা উত্তর অনেক ত্রিপ্তিশ সাংবাদিকের মনঃপূর্ণ হয়নি।

ডেইলি মেইল পত্রিকা ১০ জানুয়ারিতে ছাপে, “পৃথিবীতে সর্বশেষ যে দেশটি খার্দীন হয়েছে সেটির নেতা মুজিব পর তার প্রথম দিনটি লন্ডনে কাটিয়েছেন, ত্রিপ্তিশ সরকার নিয়েই এ সুযোগের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা করেছে। আমরা যদি দ্রুতই বাংলাদেশকে শীক্ষিত দিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন না করি, তাহলে পৃথিবীর এই অংশে প্রভাব বিত্তারের জন্য মুখ্যে থাকা ফ্রেমলিন আমাদেরকে হারিয়ে দিয়ে আগেই বাংলাদেশের মন জয় করে নিবে।” দৈনিক টেলিগ্রাফে লেখা হয়, ‘এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে ভারত যে ব্যাপক প্রভাব বিত্তার করতে খাকরে তার বিপরীত একটি প্রভাব বল্লা’ ঝুঁজে বের করার লক্ষ্যেই মুজিব তার যুক্ত বিধৃষ্ট দেশে ফেরত যাবার আগে ত্রিটেন সফর করেছিলেন। বাংলাদেশ ‘ভারতের বশ্যতা’র মধ্যে চলে যেতে পারে বলে ইকোনমিস্ট পত্রিকা আশঙ্কা প্রকাশ করে। গার্ডিয়ান সাময়িকীর সাংবাদিক মার্টিন ওয়ালকট লিখেছিলেন, মুজিব তার দেশের খার্দীন নেতা হিসেবে প্রথম রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ‘ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিমানে করে ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তাৱ প্রত্যাখান করে এবং কোলকাতায় যাত্রাবিরতি করে সেখানে একটি জনসভায় ভাষণ দেয়ার প্রস্তাৱ বাতিল করে।’ এবং তিনি দাবি করেন আওয়ামী লীগের একজন উপদেষ্টা ও তার সাথে একমত। এই ‘উপদেষ্টা’র বক্তব্য তিনি এভাবে তুলে ধরেন, ‘মুজিবের বিবেচনাবোধ আগের মতোই কাজ করছে।’

এই ‘উপদেষ্টা’ জনতেন না যে বাংলাদেশ সরকার মুজিব লড়নে পৌছেছেন এবর পেয়ে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এয়ার ইভিয়ার (ভারতীয় বিমান বাহিনীর নয়) একটি বিমান বুকিং দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু যখন ত্রিটিশ সরকার মুজিবকে ঢাকায় পৌছে দেয়ার প্রস্তাৱ কৰে তখন আৱ ভাড়া কৰা বিমানেৰ কোন প্ৰয়োজন পড়েনি।

ঢাকায় ফেরার পথে মুজিব ভাৰতেৰ সরকার ও জনগণেৰ কাছে তাৱ কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাতে দিচ্ছিলে যাবা বিৱৰিতি কৰেছিলেন। মুজিবেৰ এই পদক্ষেপ ভাৰত উক্ততাৰ সাথে প্ৰশংসা কৰেছিল। কোলকাতায় তাকে আবাৰ পামতে অনুৱোধ কৰাবাটা তাৱ উপৱ অভিবিক্ত চাপ হয়ে যেত। অবশ্যই মুজিবেৰ নিজেৰ দেশৰ লোক যাবা তাৱ জন্য অধীৱ আগ্রহে অপেক্ষা কৰেছিলেন, তাদেৱ দাবিই সবচেয়ে অগ্ৰগণ্য ছিল। প্ৰথম সুযোগেই মুজিব নিক্ষয়ই কোলকাতা সফল কৰিবেন।

গার্ডিয়ান পত্ৰিকায় এই প্ৰতিবেদন পড়ে ঢাকায় অনেকেই হেসেছিলেন। কিন্তু এৱকম একটি চাতুৰ্যপূৰ্ণ বিকৃতি, তা যত ক্ষুদ্ৰই হোক না কেল, এৱকম ঘটানোৱ ফলে তুল বোঝাৰুবিৰ সূত্রপাত ঘটতে পাৱে এবং এৱ এৱলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পাৱে। একজন ভাৰতীয় সম্পাদক যিনি যওয়ালকটৈৰ লেখাৰ সমালোচনা কৰে কলাম লিখেছিলেন তিনি বছৰ খানেক পাৱে প্ৰশংস কৰেছিলেন কি কাৱণে মুজিব একটি ভাৰতীয় বিমান প্ৰস্তুত ধাকা সঠেও একটি ত্ৰিটিশ বিমানে ঢাকাৰ সিন্ধান্তটি নিয়েছিলেন। এটি আসলে কোন অগ্রাধিকাৱেৰ বিষয় ছিল না। ঐ মুহূৰ্তে বাংলাদেশ সরকার মারাত্মক অৰ্থ সংকটে ছিল, এবং এ কাৱণে তাৱা ত্ৰিটিশ সরকাৱেৰ মুজিবকে ঢাকায় পৌছে দেয়াৰ প্ৰস্তাৱ সামনে গ্ৰহণ কৰেছিল। কে-ই বা ডেবেছিল এমন একটি সামান্য বিষয়াও তুলভাৱে ব্যাখ্যা কৰা হতে পাৱে?

মুজিবেৰ ঢাকা ফেৰা বিষয়ে রিপোর্টে অবজাৰভাৱ পত্ৰিকাৰ গ্যাডিন ইয়ং লিখেছিলেন, “কেউই মুজিবেৰ অনুপস্থিতিতে নিৱাপন বোধ কৰেছিলেন না।” তিনি লিখেছিলেন, ‘বামপঞ্জী বাঙালীদেৱ থেকে তুক কৰে চৌগাম বা সিলেটে কৰ্মৱত ত্ৰিটিশ জাহাজ কোম্পানী বা চা কোম্পানীৰ লোকেৱা যাদেৱ একমাত্ৰ চিন্তা ছিল দ্রুত ব্যবসায়িক কাৰ্যকৰ্ম তুক কৰা, পাণড়ি যাধাৱ দেয়া ভাৰতীয় শিখ জেনারেলৱা, যাদেৱ কাজ ছিল যুক্তবন্ধীদেৱ দেৰ্ভভাল কৰা বা সাধাৱণ আইন শৃঙ্খলা পৱিষ্ঠিত নিয়মৱলি রাখা তাৱা সবাই চাইছিল যেন মুজিব হিঁৱে আসেন।’ (ইয়ং এৱ মনে হয়েছিল সব ভাৰতীয় জেনারেলই হয়তো পাণড়ি পড়া শিখ)

বাংলাদেশেৰ জনোৱ সময় ইয়ং ‘কিছু সাধু ধৰণেৰ’ লোক বুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘এদেৱ মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিবেচনাবোধ এবং আলোকিত মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়াৰ মতো ছিলেন মুজিব নিজেই।’ মুজিবেৰ এমন তুয়সী প্ৰশংসা কৰাৱ পৰ ইয়ং হয়তো ডেবেছিলেন মুজিব যুক্তিপৰাধীদেৱ বিচাৱেৰ বিপক্ষে মত দিবেন। তিনি তাৱ পাঠকদেৱ উদ্দেশে লিখেছিলেন, ‘বাধীনতা মুজিবেৰ লক্ষ্য ছিল না- অন্তত নিকট ভবিষ্যতেৰ লক্ষ্য ছিল না।’ তিনি আৱও লিখেছিলেন, ‘সন্তুষ্ট

মুজিব সেই ব্যাপক আবেগধন সময়ও অনুধাবন করতে পারছিলেন যা পেয়েছে তার জন্য কি ভিষণ মূল্য বাঙালীদের জীবন দিয়ে দিতে হয়েছে। এর পাশাপাশি এই বিজয়ের মুহূর্তেও আর সব বাঙালীর মতো আনন্দে ডেসে না গিয়ে কিছু চিন্তাশীল আওয়ামী শীগার এবং বাঙালী পাকিস্তানের খেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়ে যাওয়া নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট হননি সেটাও হয়তো তার মাথায় খেলা করছিল।

ইয়ৎ এসব ‘আওয়ামী শীগার এবং বাঙালী’দের চিহ্নিত করতে ব্রহ্মাবতীই ব্যর্থ হলেও, তার মতে এরা ছিলেন চিন্তাশীল।

তখন হয়তো এমন কিছু বাঙালী ছিলেন যারা পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিল হয়ে যাওয়ায় ‘আনন্দে ডেসে’ যাননি এবং এদের মধ্যে হয়তো কিছু আওয়ামী শীগারও ছিলেন। কিন্তু বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীই খুশ হয়েছিলেন, কিন্তু ইয়ৎ এর মতে তারা সবাই ছিলেন অগভীর চিন্তার অধিকারী এবং অগুরুত্বপূর্ণ। যে বাঙালীর কথা ইয়ৎ বলছিলেন তারা ‘নিচয়ই ইসলামাবাদের ডয়াক জেনারেলদের খেকে বিছিন্ন হওয়া নিয়ে দৃঢ় করছিলেন না’- এ কথা বলে ইয়ৎ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এবং এরপরই তিনি আসল কথায় আসেন। ইয়ৎ এর বাঙালীরা আসলে চিন্তিত হচ্ছিলেন একটি বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে ধাকার ফলে ‘এই বিছিন্ন মুসলিম ভূখণ্টি কৌতুহলোদ্ধীপকভাবে বক্সের মধ্যে খেকেও যে অপরিমেয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল’ তা নিয়েই। ইসলামের নামে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালীর উপর যে বর্বরতা চালিয়েছিল তারপরও ইসলামিক বক্সের কারণে প্রাণ অপরিমেয় সুযোগ সুবিধার প্রসঙ্গ তোলা হচ্ছিল? মাতাল অথবা সুস্থ যে কোন অবস্থায় একজন পাকিস্তানী জেনারেলের মন্তব্যের সাথে ইয়ৎ এর এই জগন্য বক্তব্যের তুলনা করা যেতে পারে।

মুজিব সম্পর্কে লভন টাইমস মন্তব্য করেছিল, ‘কেবল তিনিই পারেন এই তিক্ততাময় অবস্থায় আশা সঞ্চার করতে।’ কিন্তু পশ্চিমের সকল সাংবাদিক মুজিবের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। দুই একজন তো তাকে নেতা হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করে বসেছিলেন। দৈনিক গার্ডিয়ানের একজন সাংবাদিক হ্যারল্ড জ্যাকসনের প্রতিবেদন যেটির শিরোনামে কৌতুক করে লেখা হয়েছিল “ইংরেজ প্রেরিত উক্তাবকারীর জন্য প্রতিক্ষা”, সে প্রতিবেদনে মুজিব উপকথায় পরিণত হয়েছিলেন এবং নেতা হিসেবে তার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফাইনান্সিয়াল টাইমসে কেভিন রাফেরতি মুজিবকে একজন ‘গৌয়ার ও শ্বেচ্ছাচারী’ বাস্তি হিসেবে দেখিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে মুজিব কোন যুক্তি ন্তরে আগ্রাহী ছিলেন না এবং তাকে সহজে প্রভাবিত করা যেত না বা তার মত পরিবর্তন করা সম্ভব হতোন। রাফেরতির মতে একটি চমৎকার তরফ হওয়া সন্তোষ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ছিল ভঙ্গুর। তিনি লিখেছিলেন, ‘যে তত সূচনা বাংলাদেশের জন্য দরকার তা করার সুযোগ বাংলাদেশকে দেয়া হবে কি না সেটাই এখন প্রধান প্রশ্ন।’

কে বাংলাদেশকে সুযোগ দিবে?

কিছু কিছু পচিমা সাংবাদিক ধারণা করেছিলেন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক দাবা খেলায় নতুন গুটি হতে যাচ্ছে।

একজন ‘নিরপেক্ষ সমালোচক’-এর বরাত দিয়ে নিউজউইক ছেপেছিল, ‘একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে মুজিব এবং একজন প্রশাসক হিসেবে মুজিব দুটি সম্পূর্ণ ডিম্ব বস্তি।’ এ কথা হয়তো সত্য, কিন্তু যখন ঐ সমালোচক বলেছিলেন, ‘একটি বেশ কৌতুহলোদ্বিপক উপায়ে মুজিব ইতিমধ্যেই অতীতে পরিণত হয়েছেন’ সেটি ভুল ছিল।

ঐ সাংগ্রাহিকে লেখা হয়েছিল, ‘কাজেই মুজিবকে আবার শুরু থেকে দেশের জনগণের কাছে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। তার অবিশ্বাস্য ক্যারিশমা এবং তার প্রচও জনপ্রিয়তা নিচয়ই তার পক্ষে কাজ করবে। কিন্তু তারপরও বাঙালীর অনেকে মনে করেন যে সমস্ত নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকার পরিচালনা করেছিলেন তারা শুরু সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চাইবেন না। তারা হয়তো মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’র স্মান দিয়ে তাকে কোন একটি অলঙ্কারিক পদে বহাল করে রাখতে চাইবেন। কিন্তু যারা মুজিবকে ভালোভাবে চিনতেন তারা নিশ্চিত ছিলেন যে, কারাবাসের কারণে যদি মুজিবের চেতনা ক্ষয়গ্রাণ না হয়ে থাকে তাহলে মুজিব যে জাতি গঠনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সে জাতি পরিচালনার কোন কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছাড়া শান্ত হবেন না।’

মুজিবের অব্দেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ফর্ম বাটারফিল্ড স্টার্টকভাবে বলেছিলেন, ‘শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা এতোই বেশি যে তার মৃত্যের কথাই অনেক বাঙালীর কাছে আইনের মর্যাদা পায়। বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় মুজিবের যে সমস্ত অনুসারীরা ছিলেন তাদের কারও জনপ্রিয়তাই মুজিবের জনপ্রিয়তার ধারে কাছে ছিল না এবং তারা সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তগুলো যাতে মুজিব ফিরে আসার পর নেয়া হয় সে জন্য সেগুলো ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।’

আওয়ামী লীগের মুজিবকে ‘প্রধানতম নেতা’ মনে করতেন। কেউ যদি ভেবে থাকে যে আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে কোন নেতা মুজিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে তবে তা হবে ইচ্ছাপ্রসূত করুন মাত্র। কোন আওয়ামী লীগ নেতা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে শেখ মুজিবের বিরোধিতা প্রকাশে করেন নি। যদি কোন প্রতিযোগিতা থেকে থাকে তবে তা ছিল হিটীয় স্থান দখল করা নিয়ে, এবং সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত যদি নিতেই হয়- তা নেবেন মুজিবই।

একজন সংবাদদাতা তার প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, ‘বাঙালীরা গভীর দ্বিধার মধ্যে ছিল। একজন বাঙালী বন্ধু আমাকে বলেছিলেন যে বাঙালীর একদিকে ভারতীয়দের বিষয়ে ঘৃণা আর ভীতি, অন্যদিকে পচিম পাকিস্তানীদের বিষয়ে ঘৃণা

আর তাও বাঙালাকে পাঢ়া দাওছল। তান বলোছলেন যে এখন এখনে অনেক গোলযোগ ঘটবে-অভ্যাস এবং হত্যা, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি। এই ব্যক্তিটি একজন প্রবল আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং একটু বামযোগী। শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসুন এই ব্যক্তিটি তাই চাইছিলেন, কিন্তু একই সাথে মুজিবকে হত্যা করা হতে পারে এমন ভয়ও তিনি পাছিলেন।'

তখনকার হিসেবে এই ভয়কে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদের বিবেচনায় এই ভীতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে।

বাঙালীর কেউ কেউ তখন ভারতীয়রা পাকিস্তানিদের স্থানে অধিষ্ঠিত হবে বলে মনে করলে, সাধারণের ভারতীয়দের উপর আহাই ছিল। অধিকাংশেরই এমন বিশ্বাস ছিল যে খুব শিফট ভারতীয়রা নিজেরাই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইবে।

ত্রিপুরা সাংবাদিকরা মুজিব তার মৃত্যু জীবনের প্রথম দিনটি লভনে কাটানোর 'সিক্ষান্ত' নেয়ার ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করছিলেন। উইলিয়াম জে কফলিন বলেছিলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুজিবের বেঁচে থাকার কিছু কৃতিত্ব দাবি করবে বলে আশা করা হচ্ছিল' আর ভারত কি করবে? ভারত বাংলাদেশের ১০ মিলিয়ন মানুষকে নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছিল এবং শত শত ভারতীয় সেনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভারত ছিল এই নতুন রাষ্ট্রের জন্মকালের ধাত্রির মতো। কিছু কিছু বিদেশী সাংবাদিক এমন অভিযোগও করেন যে এই ধাত্রি যদি তার পক্ষে নবজ্ঞাতকটিকে নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ কঠিন হয়ে পড়ে তবে এটিকে হত্যাও করতে পারে।

১২ জানুয়ারিতে মুজিবের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত করা আবু সাইয়াদ চৌধুরী এক সংগ্রহ পরে জানিয়েছিলেন মুজিব তাকে বলেছিলেন, "আমি এই প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে চাইনা। আমি আপনাকে রাষ্ট্রপতি করতে চাই এবং অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাই।" হয়তো দেশে ফেরার যাত্র একদিন পর প্রচও ক্রান্তির কারণে মুজিব এমন কথা বলে থাকতে পারেন, কিন্তু সুস্থ কোন মানুষের পক্ষে মুজিবের এ কথাগুলো গুরুত্বের সাথে নেয়া সম্ভব নয়।

১৪ জানুয়ারি মুজিব জানান যেহেতু তিনি তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী তাই তাকে আওয়ামী লীগের পদটি ছেড়ে দিতে হবে। আওয়ামী লীগের গঠনতত্ত্ব অনুসারে কোন ব্যক্তির একই সঙ্গে দলের এবং সরকারের প্রশাসনিক পদে থাকার বিধান ছিল না। কিন্তু মুজিবকে দলের প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করার সুযোগ দেয়ার চেয়ে দলের গঠনতত্ত্বে পরিবর্তন এনে মুজিবকে রেখে দেয়ার ব্যাপারেই সবার আগ্রহ ছিল।

একজন প্রত্নসূলত ব্যাকটের যে মর্যাদা মুঁজিব সে তুলনায় অনেক বেশি সজীব ও সতেজ ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তার জন্য কোন ‘আলাদা’ কিছু ছিল না, বরং এসব কর্মকাণ্ডই ছিল তার ‘পুরো অঙ্গিত জুড়ে’। তিনি স্বত্বাবগতভাবেই অবসর নেয়ার মত লোক ছিলেন না, এবং এমনকি সাময়িকভাবে তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে ভাবাটা দুষ্কর ছিল। তার সহকর্মীদের সহায়তাকারীর ভূমিকায় রেখে নিজেই প্রধান ভূমিকা নেয়া ছাড়া আর কোন কিছুতেই তিনি সম্মত হতেন না।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশে ১৫ জানুয়ারিতে শেখ মুঁজিব বলেছিলেন, ‘আমি চেয়েছিলাম সরকারের বাইরে থেকে দেশের মানুষের সেবায় আমার পুরো সময় ব্যয় করতে।’ কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে তখনো যেসব ঢকাণ চলমান ছিল সেগুলো ঠেকাতেই তাকে বাধ্য হয়ে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল।

প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রথম সংবাদ সম্মেলন করেন ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে। তিনি একটি লিখিত বিবৃতি পড়ে শোনান, যার উপরতেই দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হয়, ‘বাংলাদেশ এখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।’ ঐ মুহূর্তে দেশ যে সমস্ত সমস্যার মুখোয়াখি ছিল সেগুলো সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘জনগণের ব্রহ্ম’ বাত্তবায়ন সম্ভব প্রধু একটি ‘সমাজবাদি অর্থনীতি’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং নতুন অর্থনীতির পরিকল্পনার মধ্যে ‘কৃষি, শিল্প এবং আর্থিক বাতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।’

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হলেও সেজন্য তখনও হাতে সময় ছিল। আগ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো আরও প্রকট ছিল এবং এগুলো যতো দ্রুত সম্ভব সমাধান করা দরকার ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান জনিয়েছিলেন এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হতে যাচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশের সহায়তার দরকার ছিল। তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে উদাত্ত কর্তৃ আবেদন জানান, ‘নিয়ত প্রয়োজনীয় প্রবাদি যেগুলো আমাদের জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন সেগুলোসহ অন্য সকল ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করার জন্য সকল রাষ্ট্র, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে আমরা আহবান জানাচ্ছি।’

বাংলাদেশের যে পরিমাণ সহায়তা প্রয়োজন ছিল তা সম্ভবত কেবল একটি বহুজাতিক উদ্যোগের মাধ্যমেই করা সম্ভবপ্র হতো। এবং শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কোন দেশ থেকে সাহায্য আসছিল সে বিষয়ে তাজউদ্দীন আহমেদের মতো কেবল বিশেষ সংক্ষার ছিল না।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নৈতিক এবং বৃক্ষগত সহায়তা দেয়ার জন্য পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী জনতার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানান, তবে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি। তিনি যোগ করেন, ‘আমি এ সুযোগে বিশ্বের মুক্তিকামী জনতা, সাংবাদিক এবং বৃক্ষজীবী নেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এবং এদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরাও আছেন যারা আমাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।’

লিখিত বক্তব্যের কোথাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়নি। চারদিন আগে ঢাকায় ফিরে তার দেয়া ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানাতে ভূলে গিয়েছিলেন, সেদিনের সংবাদ সম্মেলনে তিনি সে ভূল পুরণে নিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের দিক্কতে তার মনে কোন বিষেষ ছিল না, কিন্তু মাঝে মধ্যে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু নীতি তার মনে নিচেরাই খুব কষ্ট দিয়েছে'। এটা এমন কি সে অর্থে কোন সমালোচনাই করা হয়নি।

তবে চীনের বিষয়ে 'মত দেয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান তখনো খুব সতর্ক ছিলেন। খুব মৃদু ভাষাতেও চীনের কোন সমালোচনা করা হয়নি, এমনকি চীন যে বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানী বর্বরতা সমর্থন করেছিল সে জন্য কোন বেদনা বা ক্ষেত্রেও প্রকাশ করা হয়নি।

'আমি আশা করবো', শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'গণপ্রজাতন্ত্রী চীন যে দেশটি নিজেরাই যুক্তবাজ এবং সামগ্রীয় এবং ঔপনিবেশিক শোষকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে শার্ধীনতা অর্জন করেছে তারা বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় সংগ্রামের এই বীরোচিত সাফল্যকে সীকৃতি দিবে।

একজন পশ্চিম সংবাদ প্রতিনিধি জানতে চাইছিলেন কবে নাগাদ ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে যাবে। জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন "ভারতীয় বাহিনী কোন দখলদার বাহিনী নয়, বরং এটি যৌথ বাহিনীর অংশ। যখন আমি চাইব তখনই ভারতীয় বাহিনী এদেশ ছেড়ে চলে যাবে।"

আর যদি কেউ শেখ মুজিবুর রহমানকে চিনে থাকেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন সেই দিন খুব দ্রুতই চলে আসবে।

আরেকজন সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি 'বৃহত্তর বাংলা' নিয়ে ভাবেন?' শেখ মুজিবুর রহমান এতোটাই খুশি ছিলেন যে তিনি কিন্তু না হয়ে বরং হাসি মুখে উত্তর দেন, 'আমরা যা চেয়েছি তা পেয়েছি এবং আমরা এটি নিয়েই খুশি আছি।'

তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের দেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চাই'। হয়তো তিনি তখন শুধু এটুকুই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশকে সুইজারল্যান্ডের মতো 'শান্তিময় ও উন্নত' দেখতে চান। কিন্তু তার এই কথা অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এমন নয় যে এ সন্তানবার কথা শেখ মুজিবুর রহমানের মনে আসেনি এবং হয়তো তার এই বক্তব্য যে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তা গড়ে তিনি হেসেছিলেন।

যুক্ত-বিধ্বন্ত বাংলাদেশের জন্য শাস্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ নিচেরাই বিশ্ব থেকে বিজিন্নতার নীতি বেছে নিতে চায়নি। মুক্তির সংগ্রামের সময় অনেক দেশের কাছ থেকেই বাংলাদেশ সাহায্য পেয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন বাংলাদেশের মানুষ 'ধারাবাহিকভাবেই বিশ্বের সর্বত্র মুক্তিকামী মানুষকে সমর্থন করেছে'। এবং এখন তারা আশা করে বিভিন্ন রাষ্ট্র, বিশেষত যারা নিজেরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শার্ধীন হয়েছে তারা বাংলাদেশকে সীকৃতি দিবে।

শেখ মুজিবুর রহমানের এমন মন্তব্যের ব্যাখ্যায় কিছু কিছু বিদেশি সংবাদকর্মী মত প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশ কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে চায় না বরং তারা কঠোরভাবে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রাখতে চায়। তারা আসলে বলতে চাইছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের এই বক্তব্য মূলত ভারত বিরোধী। তারা এমনটাই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন।

কিছু কিছু লোক যারা বিশ্বাস করতেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে একটি সমজবাদী রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব নয় অরো শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থানে অসম্ভব হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তারা মত প্রকাশ করেন যে এটি এক ধরনের পশ্চাদপসরণ এবং পূর্ব ঘোষিত নীতিগুলোর বিপরীত দিকে যাওয়া। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্তৃত ছিল চূড়ান্ত এবং কেউই সকল দেশের কাছে সহায়তার আবেদনের সিদ্ধান্তটির প্রকাশে বিরোধিতা করার কথা ভাবেনি।

কেউ কেউ ডেবেছিলেন হয়তো যুক্তের নয় মাস কারাবন্দী ধাকার কারণে শেখ মুজিবুর রহমান যে কোন পক্ষ থেকে সহায়তা গ্রহণে কৃত্তিত হচ্ছেন না।

যদিও সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান কিছু কিছু রাষ্ট্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, তারপরও তার বক্তব্যে তিনি যেসব রাষ্ট্র সর্বান্তকরণে বাংলাদেশের মুক্তিযুক্ত সমর্থন দিয়েছে এবং যেসব রাষ্ট্র সর্কিয়তাবে বিরোধিতা করেছে তাদের মধ্যে কোন স্পষ্ট বিভাজন করেনি।

শেখ মুজিবুর রহমান এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সব সময় যে কোন ঘটনার ভাস্তু দিকটি দেখতে অভ্যন্ত ছিলেন, এবং সংবাদ সম্মেলনে তিনি সৌম্য আচরণ করেন নি। কারাবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তির মাঝে এক সন্তানের মতো সময় পার হওয়ার পরপরই তাকে বেশ আশাবিহীন এবং উত্ত্বুল দেখে খুব ভালো লাগছিল। তারপরও কারও কারও মনে হতে পারে সামনের কঠিন সময় নিয়ে তার মনে ধাকা শাকাণ্ডো লুকানোর জন্যই হয়তো তিনি বেশ উত্ত্বুল ভাব দেখাচ্ছিলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে মুক্তিযুক্তের ফলে দেশের যে বৈপ্লাবিক পরিবর্তন হয়েছে এবং সামনে যে বিপুল বিশাল প্রতিবন্ধকতা আছে তা তিনি যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসার আগে পর্যন্ত বিদেশি সহয়তার বিষয়ে যে নীতি ছিল, সব দেশের কাছে সহায়তার আবেদন করার ফলে তা থেকে সরে আসা হয়েছিল, কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের এই সিদ্ধান্তকে কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি।

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আধীন হওয়া দেশের সাধারণত যে সব সমস্যা থাকে সেগুলোই সে সময় বাংলাদেশের সমস্যা ছিল। দেশের তাৎক্ষণিক ঝাগ ও পুণর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যা যোকাবেলায় বিদেশি সহয়তা প্রত্যাশা করা গেলেও, সশস্ত্র যুদ্ধের ফলে যে সমন্ত সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোর সমাধান বাতালির নিজেদেরই করতে হতো।

পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যকার শক্তিশালী বন্ধনের কারণ ছিল এ দুটো রাষ্ট্রের ভারত-বিহেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল চীনের আজাসম্মানের উপর একটি বিরাট আঘাত এবং চীন এই স্বাধীনতা যুক্তকে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায়' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসন বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ২১ ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদে 'সকল সংঘাতপূর্ণ এলাকায় একটি স্থায়ী মুক্তবিপ্রতি এবং অন্য সব ধরনের বৈরিতা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে' একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। যদিও ততোদিনে সব ধরনের বৈরি সংঘাতের অবসান হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের ডোক্ট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর পর চীনের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'আরেকটি দেশ তেজে দিতে পেরে সামাজিক সম্ভাজ্যবাদীরা এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা আনন্দে আত্মাহারা হয়ে আছে।' আরও বলা হয় 'চাকার পতন' হবে তাদের 'পরাজয়ের শুরু'। ২৩ ডিসেম্বর তারিখে ভূট্টোকে লেখা টেলিগ্রামে চৌ এন-লাই বিদেশ আগ্রাসন ঠেকাতে পাকিস্তানকে সহযোগিতা করার চীনের প্রতিশ্রুতি-পুনর্ব্যূক্ত করেন।

যদি চীনের মন জয় করা শেষ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য হয়ে থাকতো, তাহলে তিনি ভূল পথে চেঁটা করছিলেন। যে চীন তার নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মেনে নেয়ানি, তারা কি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে 'একটি বিরোচিত সাফল্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিবে? বরং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে চীনের বিপ্লবকে তুলনা করা নিয়েই কৃকৃ হবে?

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ যখন শেষ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২ যখন আবু সাইয়েদ চৌধুরী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন তার কোনটিতেই ঢাকাস্থ চীনের কৃত্তীতিরা উপস্থিত ছিলেন না। চাইনিজ কৃত্তীতিরা শেষ মুজিবুর রহমানের সংবাদ সংযোগের ১০ দিন পর ২৪ জানুয়ারিতে রেস্তুন হয়ে দেশে ফিরে যান। তারপরও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ আশাবাদী ছিলেন যে চীন খুব শীঘ্ৰই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ আব্দুস সামাদ আজাদ তার সংবাদ সংযোগে বলেন, 'আমাদের মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে।' তিনি নিশ্চিত ছিলেন না, সেই মুহূর্তটি কখন আসতে যাচ্ছে, কিন্তু অনেকেরই মনে হয়েছিল চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে। আব্দুস সামাদ আজাদ আরও বলেছিলেন, 'চীনের জনতার প্রতি আমাদের রয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা। আমরা চাইনিজ নেতাদের প্রশংসা করি এবং আমরা তাদের বিপ্লবকেও সমর্থন করেছি।' এতো প্রশংসা যেন যথেষ্ট হয়নি। এরপরও সামাদ স্বারণ করিয়ে দেন যে আওয়ামী সীগ সরকারই প্রথম চৌ এন-লাইকে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং শেষ মুজিবুর রহমান চীন সফরকারী একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং একটি সফরকারি দলের সদস্য ছিলেন। সামাদ নিজেও চীন সফর করেছিলেন।

নিম্ননের চীন-সফরের সময়, মাওলানা ভাসানী চেয়ারম্যান মাও সে তুং এবং প্রিমিয়ার টৌ এন-লাইয়ের কাছে যে ঠিক পাঠিয়েছিলেন তার অন্ত সময় পরেই মোত্তাক বাংলাদেশকে শীকৃতি দেয়ার দাবি নিয়ে চীন সফর করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান একটি জনসভায় বলেছিলেন রাষ্ট্রপতি নিম্নল বেইজিং এ বসে এশিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবেন না।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে চলার লক্ষ্যে চীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইছিল, এর কারণ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু চীনের প্রতি বাংলাদেশের এই আবেদন নিবেদন অসহায় আত্মসমর্পণের সাথে তুল্য ছিল।

ইসলামিক বর্ষ গণনা শুরু হয় মোহররমের মাস দিয়ে এবং এই মাসের দশম দিনটি হলো আতরা যেদিনটি ইয়াম হোসেনের শহীদ হওয়ার দিন হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। এই দিনটি মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় শুরুতপূর্ণ দিন এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কার মতো যেসব দেশে মুসলমানরা সংব্যালয় সেবানেও এ দিনটি ছুটির দিন। কিন্তু আওরার দিনকে বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত ছুটির তালিকায় ছুটির দিন হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

অনেক মুক্তিযোদ্ধা তাদের তিক্ততার কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরপরই মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস দেশের মানুষ যে ড্যাক্টর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিয়েছিল তারপর আর মোহররম পালন করা শুরুতপূর্ণ মনে করছিলেন না। যে কারণেই হোক, আতরাকে সরকারি ছুটি হিসেবে তালিকাভুক্ত করাটা ছিল একটি বিরাট তুল। অন্যান্য ধর্মীয় বিশেষ দিবসগুলোকে ছুটি ঘোষণা করার কারণে এ তুলটি আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পর পর এ তুলটির কারণে সে রকম কোন গণ প্রতিক্রিয়া দেখা না দিলেও, আরও পরে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ মোহররমের দিনে এ তুলটির প্রতিক্রিয়া ঠিকই দেখা দিত। বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠী যারা যুক্ত শেষ হওয়ার ঠিক পরপর শান্ত ছিল, তারা ঠিকই এ ইস্যুতে উত্তেজনা ছড়াতো। তারা এমন সুযোগ নিশ্চয়ই হাতছাড়া করতো না এবং যে সমস্ত আওয়ায়ী শীগ নেতা তাজউদ্দিন আহমেদকে পছন্দ করতেন না এবং তুলানমূলক কঠোরপঞ্চী ভানের দিকে যাদের ঝোক ছিল তারাও নিশ্চয়ই এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে এ কাজে সহায়তা করতেন।

শেষ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে আতরাকে সরকারি ছুটির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

মুহিত মজুমদার বলেছিলেন আওয়ায়ী শীগের ভেতরে থাকা 'অতি অসাম্প্রদায়িক' লোকেরা 'রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অসাম্প্রদায়িকতার দর্শনের সাথে ঐতিহ্য অনুসারে জনগণের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি' এবং এ ধরনের লোকেরা শেখ মুজিবুর রহমানের কাজ কঠিন করে তুলছিল। তিনি আরো বলেন, 'এই সংকটের দ্রুত সমাধান অত্যন্ত জরুরি ছিল এবং মুজিব বুব দ্রুতই এমন কিছু সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন, যা ছিল বুবই সঠিক।'

*

শেখ মুজিবুর রহমান একাই এসব সংকটের কার্যকর সমাধান করেছিলেন বলে মুহিত মজুমদার যে দাবি করেছিলেন তা যথার্থ। কিন্তু এ কথাও সত্য যে অতি অসাম্প্রদায়িকরা যেমন খুব দ্রুত এগোতে চাইছিলেন, তেমনি শেখ মুজিবুর রহমানও মাঝে খুব বেশি পেছনে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের এ পশ্চাদপসরণ কৌশলগত হলেও, তার এসব সিদ্ধান্তের ফলে যেসব আওয়ামী লীগার দলের কেন্দ্র থেকে এতেটাই ডানদিকে সরে ছিলেন যে তাদের অসাম্প্রদায়িক পেশা সত্ত্বেও তাদেরকে মুসলিম লীগার থেকে আলাদা করা কঠিন হতো। শেখ মুজিবুর রহমানের কারণেই তারা এমন সাহস পাচ্ছিল।

সরকারি ছুটির তালিকা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান নবান্ন দিবস যা ১৭ ডিসেম্বর পালিত হওয়ার কথা সেটিকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন।

নবান্ন, যার অর্থ হলো নতুন ফসল, এ দিনটি পালিত হতো ফসল ঘরে তোলার উৎসব হিসেবে। পঞ্জাশের দশকে যখন পূর্ববঙ্গে কৃষক আন্দোলন বেশ জোরদার হচ্ছিল তখন এ দিনটি রাজনৈতিক গুরুত্ব পেতে শুরু করে। পাকিস্তানি সরকার নিষ্ঠারভাবে এ আন্দোলন দমন করলেও আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো ঠিকই টিকে যায়।

১৭ ডিসেম্বরকে নবান্ন দিবস হিসেবে পালন করার চিন্তাটি এসেছিল বাহপাহী বৃক্ষজীবীদের মধ্য থেকে। এই শেখকের কাছে এসব বৃক্ষজীবীদের একজন পরে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, 'আমরা ১৭ ডিসেম্বরকে নবান্ন দিবস হিসেবে পালন করার কথা ভেবেছিলাম। এ দিনটি ছিল নতুন আশার প্রতীকের মত। বিজয় দিবসের ঠিক পরের দিন পালন করা গেলে দিনটির মাহাত্মা আরও বৃক্ষ পেত, নয় কি?' মুজিব বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখায় তিনি খুবই হতাশ হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'কিছু আওয়ামী লীগ নেতা এর বিপক্ষে থাকলেও মুজিব দেশে ফেরার আগে তারা এর সরাসরি বিরোধিতা করার সাহস পাননি। মুজিবের যুক্তি ছিল, বাংলাদেশে একই সময় ফসল কাটা হয়না এবং কোথাও কোথাও ১৭ ডিসেম্বরের পর ফসল কাটা হয়। এ কথা সত্য। কিন্তু এখানে এটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। ১৯৪৮ সাল থেকেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন এদেশের শাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। এর ফলেই সমগ্র জাতির মধ্যে জাতীয়তার বোধ জয়গত হয়েছিল এবং অসাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের রাজনীতিকীকৰণ হচ্ছিল। এখন সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো পশ্চাদপসরণ করছে। আমরা যদি ওই অপশক্তিগুলোর পুনর্জাগরণ না চাই তাহলে এখনই আমাদের জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ নিজেদের সংগ্রামের প্রতি সৎ থাকতে হবে। কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের সাংস্কৃতিক দিকটি অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতাই বুঝে উঠতে পারেন নি। এমনকি যে বিপ্লব ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে তাও তাদের কাছে বোধগম্য হয়নি।'

শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফেরার আগে পর্যন্ত চূপচাপ ছিলেন এমন একজন আওয়ামী শীগ নেতা বলেছিলেন, ‘নবাব উৎসব পালন করার পুরো ধারণাটির মধ্যেই কম্যুনিস্ট সুর পাওয়া যায়। কিছু কিছু কম্যুনিস্ট দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণার প্রয়ত্ন করছিল। এতেও পর্যন্ত তারা সরকারি নীতি তৈরি করেছে। তাজউদ্দিন আহমেদ সম্পূর্ণ তাদের প্রভাবের মধ্যে ছিলেন।’

অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা বামপন্থীর দিকে ঝুকে থাকলেও, অনেক আওয়ামী শীগ নেতাই কষ্টের বাম-বিরোধী ছিলেন, যদিও তারা প্রায়ই সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন।

যখন শেখ মুজিবুর রহমানের কিছু ডাকাতকী প্রবাসী সরকারের সদস্যরা দেশ স্বাধীন হওয়ার ছয়দিন পরে ঢাকায় আসার ফলে যে দ্বিধাদৰ্শ তৈরি হয়েছিল সে কথা জানান। জবাবে মুজিব চোখ টিপে দিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি হলে জেনারেল অরোরা’র আগে ঢাকা পৌছাতাম।’

শেখ মুজিবুর রহমান থাকলে আসলেই তিনি তাই করতেন, তিনি ছিলেন অসম সাহসী ব্যক্তিত্ব।

তাহলে কেন তিনি ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ তার দলের নেতাদের ঢাকা ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে নিজে ঢাকায় পেকে গিয়েছিলেন? এ প্রশ্ন হয়তো কখনোই থামবে না।

সাংবাদিক ডেভিড ফ্রেস্ট ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২-এ একটি টিভি সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ‘আপনি হ্যাতো কোলকাতা যেতে পারতেন।’ জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘আমার ইচ্ছ হলে আমি যে কোন জায়গায় যেতে পারতাম...।’ নিষ্ঠ তিনি কিভাবে নিজের জনগণকে ছেড়ে দেতেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন তাকে খুজে না পেলে পাকবাহিনী পুরো ঢাকা তছন্দ করে ফেলতো।

এটা কোন বিলম্বিত ভাবনা ছিল না।

২৫ মার্চ ১৯৭১-এ সকায় পাকসেনা কমান্ডোরা শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িটি ধিরে ফেলে এবং বাড়িটির উপর তীব্র আলো ফেলে।

শেখ মুজিবুর রহমানের একজন আত্মীয় বলেছিলেন, ‘যতোক্ষণ পাকসেনারা নিশ্চিত ছিল শেখ মুজিবুর রহমান বাড়িটির ভিতর ছিলেন, ততক্ষণ তারা অন্য নেতাদের খুঁজতে যায়নি। বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাকি নেতাদের রক্ষা করেছিলেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি মহৎ সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন। এরপরও তার এই নিঃশ্বার্থ কাজের প্রশংসা না করে অনেকে এর সমালোচনা করে থাকেন।’

২৫ মার্চের সে রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে পেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকে। কিন্তু এটা বলা শুবই অন্যায় যে মুজিব সে রাতে

বাড়িতে থেকে শিয়েছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন সেটা করাই তার জন্য নিরাপদ হবে।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে প্রথমবারের মত সেনাশাসন কায়েম হওয়ার পর থেকেই সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার আতঙ্ক শেখ মুজিবুর রহমানের মনে ছিল। ১৯৭১ এর মার্চ তিনি ক্রমগত সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার কথা বলছিলেন। অনেকবারই তিনি জনতাকে তার অনুপস্থিতিতেও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রায়ই বলতেন, ‘কারাগার আয়ার কাছে হিতীয় গৃহের মতো।’ শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রীষ্ম জৈষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা যখনই তাঁর প্রেফেক্টার হওয়া আশঙ্কা থাকতো তখনই তাঁর ব্যাগ আগে থেকেই উঠিয়ে রাখতেন, এবং এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। শেখ মুজিবুর রহমান একজন সাহসী এবং আজ্ঞাবিশ্বাসী নেতা ছিলেন, কিন্তু তাকে গোপনে থেকে রাজনীতি করতেন এমন নেতা হিসেবে কল্পনা করাই কঠিন ছিল। যখন পক্ষাশের দশকে তাঁর কিছু শুভকাঙ্গী তাকে পালিয়ে শিয়ে গোপনে রাজনীতি চালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘আমি মণি সিংহ নই।’

মণি সিংহ নামের একজন বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা বেশ কয়েক বছর আজ্ঞাগোপনে থেকে রাজনীতি চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কারণ পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনীর খুব কম লোকই তাকে চিনতো। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের তৃলনায় দীর্ঘকায় ছিলেন এবং এমন কি পক্ষাশের দশকেও এতেটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁরপক্ষে লুকিয়ে থেকে রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এছাড়াও কিছু মানসিক দিকও এখানে বিবেচ ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান আজ্ঞাগোপনে যাওয়া বা নির্বাসিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

২৫ মার্চের রাতে বা পরদিন সকালে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হতে পারতো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি অংশ শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে চাইছিল, কিন্তু অনেক পাকিস্তানি জেনারেল ভাবছিলেন সেটা বুবই বিপদজনক একটি কাজ হবে।

ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত আদমজী স্কুলে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ২৫ মার্চ রাতে। পরদিন ২৬ মার্চ সকালে তাকে যখন পাহারা দিয়ে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন একটি বুলেট তাঁর শরীর মেঝে দেয়ালে আঘাত করে। তাঁর পাহারায় থাকা সেনারা তখনই তাকে ঘিরে ফেলে।

এর অন্ত পরেই শেখ মুজিবুর রহমানকে ফ্যাগস্টাফ হাউসে সরিয়ে নেয়া হয় এবং তিনদিন পর বিমানে করে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়।

যখন শেখ মুজিবুর রহমানের বিষয়ে কি 'ব্যবহা' নেয়া হবে তা নিয়ে 'জটিলতা' দেখা দেয় তখন সাদিঃ সালিকের বক্তৃ মেজর বিলাল এক প্রশ্ন করেন কেন তিনি তাকে তৎক্ষণিকভাবে হত্যা করেনন। জবাবে বিলাল বলেন, 'মুজিবকে জীবিত প্রেক্ষণের জন্য জেনারেল মিথা বাস্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।'

দেশে ফেরার পর ধীরেন্দ্র নাথ দস্ত'র পুত্র সঞ্চীব যখন শেখ মুজিবুর রহমান তার সাথে দেখা করতে যান, তখন শেখ মুজিবুর রহমান তার উপর শূরু হয়ে বলেন, 'তুমি তোমার বাবাকে ফেলে কেলকাতায় চলে গিয়েছিলে। তুমি তাকে ফেলে না গেলে তার নিহত হতে হতো না।' এটি একটি অমূলক অভিযোগ ছিল, সঞ্চীব যদি ঢাকায় ধাকতেন তাহলে তাকেও তার বাবা ও ভাইয়ের মতো পাকবাহিনীর হাতে শুন হতে হতো। কিন্তু কি জবাব দেবেন তা হ্যাতো সঞ্চীব ঐ মুহূর্তে তেবে পান নি। কিন্তু সঞ্চীবের কন্যা বুয়া এটা সহ্য করতে পারেন নি। তিনি ক্ষোভাত্মিত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বলেছিলেন, 'আপনি পাকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করলে আমার দাদা আর কাকাকে নিহত হতে হতো না।' বঙবন্ধুর সাথে এভাবে কথা বলায় সেখানে উপস্থিত অনেক মষ্টী ওই মেয়েটির দিকে কড়া চোখে ঢাকাছিলেন। সঞ্চীবও তাঁকে ধামাতে ঢাইছিলেন, কিন্তু মুজিব আন্দোলিত হয়েছিলেন। তিনি সঞ্চীবকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার বাবাকে হারিয়েছ আর আমি আমার ভাইকে।'

১৯৭২ সালে ঢাকায় একটি সংক্ষিঙ্গ সফর শেষে করাচি থেকে প্রকাশিত ডল পত্রিকার সাংবাদিক মাজহার আলী খান লিখেছিলেন, 'যদিও কেউ এটা বীকার করছে না তারপরও এটাই সত্য যে বঙবন্ধু সরাসরি মুক্তির সংগ্রামে অংশ না নিয়ে পাকিস্তানের কারাগারে ধাকায় দেশবাসী ঐ নয় মাস মানসিকভাবে পঙ্ক অনুভব করেছিল।' তিনি আরও যোগ করেছিলেন, 'এই সত্যটি সামনে নিয়ে এসেছে তুলনামূলকভাবে বেশ যুক্তিদেহী ছাত্র নেতারা।'

'কারাগারে ধাকা' শব্দটিলো এখানে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যে মনে হতে পারে শেখ মুজিবুর রহমান আরাম আয়েসের মধ্যে ছিলেন, যা খুবই পক্ষপাতমূলক আচরণ। মাজহার আলী খান হ্যাতো কোন অসাধু উদ্দেশ্যে এভাবে লেখেন নি, তারপরও তিনি সম্ভবত অনিচ্ছা সন্ত্রেও যারা যুক্তের নয় মাস মুজিব নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করেছেন বলে প্রচার করে তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।

নয় মাস কনডেম সেলে কারাবন্দী ধাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের ওজন ২০ কেজি কমেছিল এবং আট জানুয়ারি যখন শেখ মুজিবুর রহমান রাওয়ালপিণ্ডি থেকে লন্ডন পৌছান তখনও তিনি ক্রান্ত আর বিধ্বন্ত ছিলেন না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল তার তুলনায় বাস্তুর এ অবনতি সামান্যই।

দুই মাসের বেশি সময় কলডেম সেলে বন্দী থাকার ফলে অনেক সময় বন্দীরা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ কারাবাস শেখ মুজিবুর রহমানকে ভেঙে না ফেললেও, যুক্ত অস্ত হারানো একজন সৈনিকের মতোই তিনিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কলডেম সেলে থেকেছেন এমন লোকের পক্ষেই তখু ওই কট বোধা সম্ভব।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ যখন শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার সংবাদ জানা যায় তখন ভূট্টো তাঁর আনন্দ পুরোপুরি গোপন করতে পারেন নি। কিন্তু তিন বছর পর যখন ভূট্টো নিজে মৃত্যুর অপেক্ষায় কারাগারে বন্দীর জীবন যাপন করছিলেন, তখন তাঁর শেখ মুজিবুর রহমানের কথা মনে পড়েছিল। তখন হয়তো তাঁর বোধদয়া হয়েছিল।

১৯৭৮-এর ৯ অক্টোবরে ভূট্টো রাওয়ালপিংডির জেলা কারাগারের সুপারিনিটেনডেন্টকে লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন, '১৫ থেকে ২০ জন সৈনিক সারাদিন পর্যায়ক্রমে কুচকাওয়াজ করে। তাদের ছবিবক্ষ পায়ের শব্দ এবং মাটি বোঝার শব্দ ইত্যাদির কারণে সামান্য একটু ঘুমানোও অসম্ভব। এসবের কারণে ১৯৭২ সালে মুজিব তাঁর কারাবন্দী অবস্থায় যে দুর্দশার বর্ণনা করেছিলেন সেগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন এটি তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করার কৌশলের অংশ ছিল।'

সাত বছর আগে শেখ মুজিবুর রহমান যা বুঝতে পেরেছিলেন তা এতোদিন পর ভূট্টো বুঝতে পেরেছিলেন।

এরপরও ভূট্টোর অবস্থা শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে ডালো ছিল বলতে হলে, কারণ তিনি ছিলেন নিজের দেশে, চাইলেই তাঁর স্ত্রী আর কন্যার সাথে দেখা করতে পারছিলেন এবং কারাগারে তখু লিখতে পারাছিলেন তাঁট নয় সে লেখা তিনি পাচারও করতে পারছিলেন। নয় মাস ধরে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্ত্রী আব সন্তানদের কোন ব্যবরাই পান নি।

২৮ জানুয়ারি ১৯৭২ নিউইয়র্ক টাইমস ছেপেছিল, 'এ বিময়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে মুজিব বাংলাদেশে একটি কার্যকর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। সারাদেশে গেরিলা গোক্ষাদের অন্ত সমর্পণ, ভারত থেকে লাখো শরণার্থীর ফেরৎ আসা এবং বাংলাদেশ থেকে পর্যায়ক্রমে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতাহার- এসব থেকে নতুন সরকারের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বোধ যায়।'

এটি ছিল তখনকার পরিহিতির নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ। মাত্র ঢাক্ষ দিন আগে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়া একটি দেশের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা ঠিক হতো না।

দেশ থেকে প্রথম দফা ভারতীয় সেনা প্রভ্যাহার শেষ হয়েছিল যথার্থ সময়েই, ১৯৭২-এর জানুয়ারির শেষদিকে, ৩০ হাজার ভারতীয় সেনা দেশে ফিরে যায়।

এরপরও আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের ট্যারেল খু একজন তথাকথিত পুঙ্গযোদ্ধার বরাত দিয়ে ছাপেন, ‘আমি বিদায় বলবো না। তুমি এক বছরের মধ্যেই আবার ফিরে আসবে— যখন আমাদেরকে ভারতীয় সেনাদের তাদের দেশে ছুঁড়ে দেয়া তরুণ করতে হবে।’

খু আর তার মতো আরও পঞ্চিমা সাংবাদিক যারা ভারতীয় সেনা আর মুক্তি বাহিনীর মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ নিয়ে প্রতিবেদন লিখতে হবে বলে আশা করছিলেন তাদের হতাশ হতে হয়েছিল। তারা যতোটা কল্পনা করতে পারেন তার চেয়ে অনেক দ্রুতই ভারতীয় সেনারা নিজ দেশে ফেরত গিয়েছিল।

আমার ভালোবাসা নিও

শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো বাংলাদেশের সাধীনতা সংগ্রামে বিশেষভাবে অবদান রেখেছিল, তার প্রতি এ রাজ্যগুলোর বিশেষ দাবি করার অধিকার ছিল। দেশে নানা রকম সমস্যা সংকেত ঢাকায় ফেরার মাত্র চার সঙ্গাহের মাধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান কোলকাতা সফর করেন।

গবর্ন ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মুজিব কোলকাতায় দুদিনের সফরে যান তখন হাজারো মানুষ তাকে উৎসুক দণ্ডয়ে অভ্যর্থনা জানাতে আসে। কোলকাতার মানুষের কাছেও তিনি একজন নায়ক ছিলেন। যে মানুষটি তার নিজের দেশের মানুষকে সাধীন করেছেন এবং পুরো উপমহাদেশের দৃশ্যপট বদলে দিয়েছিলেন তার প্রশংসা ছিল কোলকাতাবাসীর মুখে মুখে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে সাগত জানাতে যে জনতার চল নেমেছিল তা দেখে সাংবাদিকদের ১৯৭৫ সালের লভেবরের শেষ সঙ্গাহে গবর্ন বুলগানিন এসং ক্রচেড কোলকাতা সফর করেছিলেন সে সময়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এর আগে কোন সফরকারী নেতা কোলকাতায় শেখ মুজিবুর রহমানের মতো অভ্যর্থনা পাননি।

শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতায় সৌন্দর্য নেশনেজ আয়োজন করেছিলেন সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘আমার জীবনের শুরুর দিকে ছাত্র অবস্থায় এবং পরবর্তীতে ভাবনাত। পাকা অবস্থায় আমি এ শহরে কিছু চমৎকার সময় কাটিয়েছি। ওই সময়েই আমি নিজেকে গড়ে তুলেছিলাম বলে মনে করি।’

১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর শেখ মুজিবুর রহমান কোলকাতা ছেড়ে ঢাকায় এসেছিলেন, তারপরে তিনি নেতা হিসেবে আরও অনেক পরিপক্ষ তায়েছিলেন। তারপরও তার রাজনীতিতে একটি ধারাবাহিকতা ছিল, তিনি সব সময়টি তাঁর জনগণের পক্ষে লড়াই করেছেন।

কোলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ৬ ফেব্রুয়ারির জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান ‘ভারতের মহান জনগণ’ এবং ভারত সরকারের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ১০ মিলিয়ন লোক শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নির্যাচিল তাদের ‘গাকার জায়গা, শাদা, দন্ত এবং আশ্রাম’ দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেছিলেন ‘এ ক্ষণ আমি শোধ করতে পারবো না’, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তিনি বলেছিলেন-

‘নিঃস্ব আমি, রিক্ত আমি
আমার তথু প্রেম আছে, তুমি তাই নাও।’

এই সহজ সরল দুটি চরণে যা বলা হয়েছে সেই আবেগই সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান অনুভূত করেছিলেন। এ কথাগুলো সরাসরি শ্রোতাদের হস্তয়ে পৌছেছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের মানুধের তথ্য প্রশংসা করেই সম্ভৃত হতে পারেন নি। তিনি আলাদা করে পার্শ্বমবঙ্গ, প্রিপুরা, মেঘালয় এবং আসাম, এ রাজ্যগুলোর কথা বলেন যারা আশ্রয় দেয়ার পাশাপাশি নিজেদের খাবার বাংলাদেশিদের সাথে ভাগাভাগী করে খেয়েছেন এবং বাংলাদেশিদের ক্রমাগত আশ্রষ্ট করে গিয়েছেন। এমন সবাগুক সহযোগিতা ছিল নর্জিসাবাইন এবং তা কখনোই ভূলে যাওয়া সম্ভব নয়। শেখ মুজিবুর রহমান বিখ্যাস করতেন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার বক্ষুল অটুট এবং এটি চিরকাল এ রকমই থাকবে।

‘আমার দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক নয়’ শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন। পঞ্চিম পাকিস্তান অপশ্চিত্তপোই এদেশে সাম্প্রদায়িকতাকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। তিনি ভারতের জনগণের কাছে সাম্প্রদায়িকতার শেষ শিকড়টুকুও উপড়ে ফেলতে আহবান জানান।

নিজের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন এমন ব্যক্তির পক্ষেই প্রকৃত অর্থে কৃতজ্ঞ হওয়া সম্ভব। শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের প্রতি এবং নিজের প্রতি আস্থার কারণেই তিনি জানতেন যে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা আপনের ফলে বাংলাদেশের জাতীয় চেতনাকে অপমান করা হবে না।

একই সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় চেতনার উপরে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৭২ এর ৬ ফেব্রুয়ারিতে কোলকাতার ওই জনসভায় তিনি বলেছিলেন, ‘অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এগুলোই দুটি দেশের প্রধানতম আদর্শ। আমাদের দুই দেশের বক্ষুলও এসব আদর্শের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এবং পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের সুসম্পর্কে চির ধরাতে পারবে না।’

বাংলাদেশ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক। কিন্তু জাতীয়তাবাদের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে সবার কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে জাতীয় শর্ত সব সময়ই তার কাছে অঘণ্য হবে।

এই কোলকাতা সফরের সময়ই শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে আলাপ হয় যে ভারতীয় বাহিনী ২৫ মার্চ ১৯৭২-এর মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। বাংলাদেশ যেদিন প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে সেদিন কোন বিদেশি সেনাই দেশটিতে থাকবে না।

যেসব ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা দেশে ফেরার জন্য উদয়ীর হয়েছিলেন তাদের নিচ্ছয়াই এ সিদ্ধান্ত জানতে পেরে ব্যক্তিবোধ হয়েছিল। এদের মধ্যেই একজন লি লিসেজকে বলেছিলেন, ‘আমাদের সুনাম এখনও নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, কিন্তু আমরা যথার্থ সময়েই এদেশ ছেড়ে যাচ্ছি।’ আরেকজন পক্ষিয়া সাংবাদিক

একজন ভারতীয় জেনারেলের বক্তব্য হিসেবে ছাপেন; ‘ইস্টারের ছুটিতে জওয়ানদের নিয়ে বাড়িতে যেতে পেরে আমি খুবই খুশি।’ নিচয়ই কোন ভারতীয় জেনারেল এমন কথা বলতে পারেন না, কিন্তু হয়তো ওই সাংবাদিক কোরিয়ায় যুদ্ধ চলাকালীন জেনারেল ম্যাক আর্থার যেমন ‘ক্রিসমাসের ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার’ কথা বলেছিলেন সে কথাই প্রতিখনি করেছিলেন।

দেশ সাধীন হওয়ার একপক্ষ কালের মধ্যে ভারতীয় সেনা প্রতাশারের যে প্রক্রিয়া তখন হয়েছিল তা সমাপ্ত হয় ১২ মার্চ ১৯৭২-এ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১৩ দিন আগে।

১২ মার্চ ১৯৭২-এ ভারতীয় সেনাদের জন্য দেয়া বিদায়ী ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান অনেক আবেগে ভরা একটি বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের সবচেয়ে বিপদের সময় আপনারা যে সাহায্যের হাত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তার কথা আমরা সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞাতসহ শ্মরণে রাখবো সব সময়।’ যুক্তি বাহিনীর পাশে থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে তীর কর্মকর্তা ও জওয়ানবা তাদের জীবন দিয়েছিলেন তাদের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অকৃতিম শুক্রা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেছিলেন, ‘পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চালানো ধূসম্যজ্ঞের পর এদেশের মানুষ নিঃশ্ব হয়ে যাওয়ায় তারা ভারতীয় বাহিনীর প্রতি যতোটা আতিথেয়তা দেখানো প্রয়োজন ততোটা করতে পারেনি। কিন্তু আপনাদের জন্য তাদের মনে রয়েছে ভালোবাসা। আমি আপনাদের আহবান করলো আপনারা আপনাদের হন্দয়ে বাংলাদেশের মানুষের এই ভালোবাসা রয়ে নিয়ে যাবেন।’

একজন পঞ্চিয়া সংবাদকর্মী বলেছিলেন, ‘এমনকি ভারতীয়দের কঢ়ির জন্যও কিছু কিছু রান্না অত্যন্ত মসলাদার হয়ে যায়। এর আগে বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সেনারা অনেকদিন ধাকবে বলে তিনি যে ভবিষ্যত্বাণী করেছিলেন তা তুল প্রমাণিত হওয়ায় তিনি মনে কষি পেয়েছিলেন, আর এই সন্তা কথাটি বলে তিনি সাক্ষনা খুঁজছিলেন।

বাংলাদেশে পাকিস্তানিরা প্রাথমিক ধূসম্যজ্ঞ চালানোর পর একটি নিশ্চ্যাক প্রতিনিধি দল পরিষ্ঠিতি মূল্যায়নের জন্য এখানে আসে এবং তাদের মতে কয়েকটি শহরের অবস্থা ছিল ‘পারমাণবিক আক্রমণের পরবর্তী সকালের মতো।’ পরবর্তী নয় মাসের পাকিস্তানি দখলদারিত্বের সময় এ ধূস আরও বচ্ছে বৃক্ষি পেয়েছিল।

টাইম পত্রিকা তাদের ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২-এর মূল প্রতিবেদনে ছেপেছিল, এক মাস আগে পাকিস্তানি বাহিনী আন্তসমর্পণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেশটিতে ধূসম্যজ্ঞ অব্যাহত ছিল। যুক্তের শেষ দিকে পঞ্চিয় পাকিস্তানি বৃহৎ স্বাবসাহিক গোষ্ঠীগুলো কার্যত তাদের প্রায় সকল অর্থ পঞ্চিয় পাকিস্তানে পাচার করে নেয় এবং এদের অনেকেরই এখানে অনেক বকেয়া ছিল।’ ফ্যাট্টীর তদামগুলো

ନଃଶୋଷତ ହେଁ ପରେଛିଲ ଏବଂ ସୁଚାରୀ ସ୍ଵର୍ଗଶର ତାତ୍ର ଅଭାବ ଛିଲ । ପାକିତ୍ତାନ ସେନାରୀ ଏମନାକ ସରନଇ ସୁଯୋଗ ପେଯେଛିଲ ତଥନଇ ବ୍ୟାକ ନୋଟିଓ ଧର୍ମ କରେ ଦିଯେଛିଲ । ଟାଇମସ ସାମ୍ବାର୍କୀର ଭାଷାଯ, ‘ବନ୍ଦରଗୁଲୋ ସବ୍ ହୋଯାର ଆଗେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ଜନ୍ମ କରା ହେଁଛିଲ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ବିକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଲୋ ଥେକେ ଗାଡ଼ି ତୁଲେ ଦେଯା ହେଁଛିଲ ।’

କିଷ୍ଟ ପାକିତ୍ତାନ ସାମରିକ ଏବଂ ଆଧା-ସାମରିକ ବାହିନୀର ସକଳ ଲୁଟପାଟେର କଥାଇ ଖୁଲେ ଯାଉୟା ହେଁଛିଲ ଦ୍ରୁତତି । ଅନେକେ ଏମନ ପ୍ରଶ୍ନ କରେଛିଲେ ଯେ ଏତୋ ଅଞ୍ଚ ସମୟେ ପାକିତ୍ତାନରୀ ଏଣ୍ଠିଲେ କିଭାବେ ପାଚାର କରେଛିଲ ।

ଏମନାକ ଯେ ସବ ପଚିମା ସାଂବାଦିକ ଭାରତୀୟ ଅଫିସାରଦେର ପ୍ରଶଂସା କରେଛିଲେନ ତାରାଓ ପ୍ରତିବେଦନେ ଲିଖିଛିଲେନ ଯେ, ଭାରତୀୟ ସୈନିକେରା ପାଟ, ଧାନ, ସ୍ଵର୍ଗପାତି, ସୁଚାରୀ ସ୍ଵର୍ଗଶ, ଗାଡ଼ି, ଟିଭି ସେଟ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, କାପେଟି ଲୁଟେ ନିଯେ ଗିଯେଛିଲ, ଅର୍ଧାଂ ତାଦେର ପକ୍ଷେ ବହନ କରା ସମ୍ଭବ ଏମନ ସବକିଛି ତାରା ନିଯେ ଗିଯେଛିଲ ।

ଏମନ ପ୍ରତିବେଦନଗୁଲୋ ବାଂଲାଦେଶେ ବ୍ୟାପକଭାବେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଁଛିଲ ଏବଂ ଏମନ କି ‘ବୁନ୍ଦକ୍ଷିରୀବୀଦେର’ ମଧ୍ୟେ କୋନ ଯାଚାଇ ଛାଡ଼ାଇ ଏସବ ସଂବାଦ ବିଶ୍ୱାସ କରେଛିଲେନ । ଏର ମଧ୍ୟେ କିଛୁ ସଂବାଦ ନିଶ୍ଚଯାଇ ସତ୍ୟ ଛିଲ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଗୁଲୋଇ ଛିଲ ଅଭିରଞ୍ଜିତ । ବଦରମୌନ ଉମରର ଭାଷାଯ, ‘ଏଟା ହତେଇ ପାରେ ଏସବ ସବରେ ଅନେକଗୁଲୋଇ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କିଛୁ କିଛୁ ନିଚକ ଗୁର୍ବ ।’ ଏସବ ସବରେ ମଧ୍ୟେ କିଛୁ କିଛୁ ତୁଥୁଇ ଗୁର୍ବ ନନ୍ଦ, ବରଂ ଏଣ୍ଠିଲେ ଛିଲ ଅସଂ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେ ତୈରି କରା ଗଲା ।

ଓହର ତାର ପାଠକଦେର ଶ୍ରବଣ କରିଯେ ଦିଯେଛିଲେନ, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ତାର ଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିତେ ନିଶ୍ଚଯାଇ ସାଧୁ ସନ୍ତଦେର ନିଯେ ଗଠିତ କୋନ ସଂଗଠନ ନନ୍ଦ ।’ ତିନି ବେଳେଛିଲେନ ଯେ, ଭାରତୀୟ ବାହିନୀକେ ପ୍ରଥମେ ଶାଧୀନତା ନିଯେ ଆସାର ଜନ୍ୟ ବାପକ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଜର୍ମାନ ପରିହିତ ଯୋକାବେଳା କରାର ଶାଧୀନତା ଦେଯା ହେଁଛିଲ ଏବଂ ଏ ସୁଯୋଗେ ‘ତାରା ହ୍ୟତୋ ଅତିରିକ୍ତ ଅନେକ କିଛୁ କରେ ଫେଲେଛିଲ ଏବଂ ତାଦେର ଏସବ କର୍ମକାଳ ଦେଖେ ଦେଶବାସୀର ପାକବାହିନୀର ଅତ୍ୟାଚାରର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଗିଯେଛିଲ, ଫଳେ ମାନୁଷ ହ୍ୟତୋ ଗୁର୍ବ ଛାଡ଼ାଇଲ ।’

କୋନ ସେନାବାହିନୀ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗଠନ ପ୍ରକିଳ୍ୟ ଯେହନଟିଇ ହୋକ ନା କେନ, ସାଧୁ ସନ୍ତଦେର ସଂଗଠନ ହ୍ୟ ନା । ତାହାରୀ ସେନାବାହିନୀତେ ସାଧୁ ସନ୍ତଦେର ଧାକାର କାରଣଟାଇ ବା କୀ?

ପାକିତ୍ତାନ ଦଖଲଦାରଦେର ତୁଳନାଯ ଅତିରିକ୍ତ କରା ମାନେ ବୁନ, ଧର୍ମଣ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଲୁଟପାଟ, ଝୁଲାଓ-ପୋଡ଼ାଓ ।

ଦେଶ ଶାଧୀନ ହୋଯାର ପର ବିଶେଷତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାହ ଭାରତୀୟ ବାହିନୀ ଯେ ସୁଯୋଗେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲ ମେ ତୁଳନାଯ ତାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରେଛିଲ । ପାକିତ୍ତାନ ବାହିନୀର ସାଥେ ଭାରତୀୟ ବାହିନୀକେ ତୁଳନା କରାଇଲା ଛିଲ ଜନ୍ୟ ଅନ୍ୟାଯ ।

'একটি নতুন ভারত' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সানডে টেলিঘাফে ১২ ডিসেম্বরে ছাপা হয়, যে সাম্প্রদায়িকভাব ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করা হয়েছিল তা থেকে 'পরোক্ষ সশ্রামের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসা হয়েছে'। সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত মতানুসারে, 'উপমহাদেশে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের সমাপ্তি ঘটার প্রক্রিয়াটি এখন থেকে তরুণ হয়েছিল।'

পত্রিকাটিতে আরও ছাপা হয়, 'এখন দিন্তী যদি হত বিহুল পঞ্চিম পাকিস্তানের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে তাহলে হয়তো খুব শিগগির-ই সিঙ্কু আর পাঞ্চাবের মুসলমানরাও মহান ভারত পরিবারের অংশ হতে চাইবে, এই পরিবারটি থেকেই ত্রিটিশ সরকারের সহায়তায় (এ অংশে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল) ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের বিতর্কিত ব্রহ্মপুর্ণী জিম্মাহ এ দুটি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।

কিন্তু দ্বি-জাতি তত্ত্ব ব্যর্থ হয়েছে- এটা মেনে নিতে তখনো অনেক পঞ্চিমা সাংবাদিক প্রস্তুত ছিলেন না। তারা তখনো সাম্প্রদায়িকভাব সুর বাজিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এ দিয়ে যা অর্জন সম্ভব তা করে নিচ্ছিলেন, এ কারণেই মাঝে মাঝে তারা ডয়ঙ্কর সব মিথ্যা প্রচার করছিলেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ আমেরিকান ফোর্সেস নেটওয়ার্ক (এএফএন) রেডিও তাদের ৮.৩০-এর ব্ববরে বাংলাদেশের নতুন শাসকগোষ্ঠীকে হিন্দু বলে চিহ্নিত করে। এ তুল অসতর্কতা বশত হয়নি। এটি বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা অভিযানের অংশ ছিল।

এই সংবাদ সম্প্রচারে বলা হয়েছিল :

'দশ হাজারেরও বেশি লোককে এই নবগঠিত রাষ্ট্রটিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। একজন সরকারি মুখ্যপাত্র বলেছেন তাদেরকে পাকবাহিনীকে সহায়তা করার অপরাধে সন্দেহ বশত গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বিচার প্রক্রিয়া তরুণ হওয়ার আগে প্রতিটি মামলা খতিয়ে দেখা হবে। এই সন্দেহভাজনরা সবাই মুসলিম... আর নতুন শাসকরা হিন্দু... তাদের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক নেই।'

এই সম্প্রচারের শেষ লাইনটি প্রচারের পেছনে যে অসাধু উদ্দেশ্যাটি বুঝতে না পারার কোন কারণ রেই।

এখানে ১৪ জানুয়ারি পাকিস্তান রেডিও থেকে প্রচারিত আরেকটি বাংলা সম্প্রচার এখানে তুলে ধরা জরুরি: 'বাংলার মুসলমানরাই সর্ব প্রথম উপমহাদেশে হিন্দুদের একচেটীয়া সুক্ষলভোগের প্রতিবাদ করেছিল। সে কারণেই হয়তো আজ তাদেরকেই হিন্দু, রাশিয়ান, ত্রিটিশ এবং ইহুদিদের যৌথ চক্রান্তের লক্ষ্যবস্তুতে পরিগত হতে হয়েছে। 'পূর্ব পাকিস্তানে'র উপর আক্রমণের পুরো নকশাটিই করেছেন জায়নবাদী ইহুদি জেনারেল জ্যকব, যাকে এ জন্য ইসরায়েলে প্রশিক্ষণ

দেয়া হয়েছে।' পাকিস্তানি রেডিও-র ধারাভাষ্যকার আরও বলেন, 'কিন্তু আমাদের বিশ্বাস খুব শিখগির-ই শুধু অবঙ্গিলি হওয়ার দোষে যে বিপুল সংখ্যক বুজিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে, বোমা মেরে নির্দোষ শিশু এবং বিশ্বস্ত পাকিস্তানিদের খুন করা হয়েছে তার প্রতিশোধ নিতে বাংলার মুসলমানরা জেগে উঠবেন।'

নির্জন যিথ্যাচার এরচেয়ে বেশি করা সম্ভব নয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের আগে শেখ মুজিবুর রহমান দশ বছরেরও বেশি সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। এমনকি তাকে একাকী বন্দী করেও বাইরের দুনিয়া থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়নি, যতক্ষণ তাকে বাংলাদেশের কারাগারে আটক করা হয়। যখন তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ঘড়্যন্ত মামলা চলমান ছিল তখন এক সাংবাদিক ডয়ে তার সভাপত্নের উন্তর না দেয়ায় তিনি বলেছিলেন, 'যদি বাংলাদেশে থাকতে হয় তাহলে আপনাকে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কথা বলতেই হবে।' এমনই ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস।

একজন কম্যুনিস্ট যিনি মুজিবের সাথে এক বছরেরও বেশি সময় কারাগারে ছিলেন, এ লেখককে বলেন, 'কারাগারেও তিনি একজন নেতা ছিলেন। তিনি কারও উপর নিজেকে চাপিয়ে দিতেন না। তিনি আমাদের প্রেরণা দিতেন এবং আমরাও তাঁর উপর আস্থা রাখতাম। তিনি সহজেই মিশে পারতেন। যখন তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয় তখন কারাগারের কর্মীদের মধ্যে সবাই শুশি হলেও, দুই একজনের চোখে জল ছিল। তিনি প্রচও স্নেহ পরায়ন এবং দয়ালু ছিলেন। কারাগার মানুষের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার মতো, একজন মানুষের সব গুণ আর দুর্বলতা কারাগারে পরীক্ষার মুখে পড়ে যায়। আমার দীর্ঘ কারাবাসের সময় আমি শেখ মুজিবুর রহমানের মতো কাউকে পাইনি। আমাদের কম্যুনিস্ট নেতাদের মধ্যে এমন কেউ দাকলে খুব চমৎকার হতো।'

কিন্তু যে নয় মাস শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে তার পরিবারের থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন অবস্থায় কারাবাস করার পরও শেখ মুজিবুর রহমান যে তিক্ততাপূর্ণ হয়ে ওঠেন নি এবং তখনো যে কোন কিছুরই কালো দিকটি দেখতে পারছিলেন- এটি ছিল সত্যিই একটি কাকতালীয় ব্যাপার।

শেখ মুজিবুর রহমান সব সময়ই বক্তু আর ডক পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকতে ভালোবাসতেন। পাকিস্তানি কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি যে বক্তু আর ডকদের সঙ্গ থেকে বাস্তিত হয়েছিলেন মুক্তির পর তিনি তা পুরিয়ে নিছিলেন। তিনি সমস্ত প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজে কাছে পাওয়া যায় এমন ছিলেন এবং দেশের সব হাজার থেকেই লোকে তার কাছে আসছিল। একজন বিখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'সারাক্ষণ জনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকলে তিনি কাজ করেন কখন?'

শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে ভালোবাসতেন, কিন্তু তারচেয়েও বড় বিষয় হলো তিনি কাউকেই ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। তিনি বলতেন, ‘ওদেরকে দেয়ার মতো আমার কাছে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নেই।’

মুজিব ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠপ্রবণ পিতা আর অনুরক্ত পুত্র। তার দীর্ঘ কারাবাস নিচয়ই তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু এ নিয়ে কথা বলা তাঁর পছন্দ ছিল না। একজন সাংবাদিক একবার তাঁকে তুল করে জিজ্ঞেস করেছিলেন মানুষের সঙ্গ যার এত পছন্দ সেই শেখ মুজিবুর রহমান কি করে কারাগারে তাঁর দীর্ঘ একাকীত্ব কাটিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেছিলেন। ওই সাংবাদিক বুঝতে পারেন নি যে তিনি কাঁচা ঘায়ে আঘাত করেছিলেন।

১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি মুজিব তাঁর ভাষণে যখন দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর বিচার চলছিল তখন যারা তাঁর বিরক্তে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তাদের চিনি, আপনারাও তাদের চিনেন।’ কিন্তু দীর্ঘ নয় মাসের কারাবাসও শেখ মুজিবুর রহমানের মনে তিক্ততা সৃষ্টি করেনি, এবং যারা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঠিক মতো চিনতেন তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের বিরক্তে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাদের তিনি কোন রকম দণ্ড দিবেন না।

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরক্তে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এমন একজন সাংবাদিক শেখ মুজিবুর রহমান ফেরার আগে তার চাকরি হারিয়ে ছিলেন। যখন ওই সাংবাদিকের শৃঙ্খল তাঁর পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে তদবির করেছিলেন তখন সাংবাদিক তাঁর চাকরি ফিরে পান। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরক্তে সাক্ষ্য দেয়া আরেকজন ব্যক্তি যখন সরাসরি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান তাকে উপদেশ দেন, ‘কয়েক দিন চুপচাপ থাকুন।’ মুজিব বলেছিলেন, ‘আপনার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, কিন্তু অন্যদের কথা আমি বলতে পারি না।’ এক সময় এই ব্যক্তিটির সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কিন্তু মুক্তিবাহিনী সে সময় যুক্তিদেহী মনোভাবে ছিল এবং যারাই পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছে তাদের বিরক্তে দ্রুত কোন শান্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে নিতে পারতো।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর মাথার চেয়ে দনয়ের দাবিই বেশি শুনতেন। তিনি যেমন দ্রুত ক্ষিণ হতেন তেমনি দ্রুতই আবার ক্ষমা করতেন এবং যার প্রতিই তিনি কখনো ক্ষুক আচরণ করেছিলেন তাঁর প্রতি তিনি পরবর্তীতে দয়া দেখাতেন।

১৯৭৩ সালের পহেলা জানুয়ারি একটি মার্কিন বিমোরী মিহিল করার সময় ছাট ইউনিয়নের কর্মীদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল, এ খবরটি টেলিভাইম আকারে প্রকাশ করার কারণে একটি সরকারি মালিকানাধীন দৈনিকের প্রধান সম্পাদক এবং নির্বাহী সম্পাদককে শেখ মুজিবুর রহমান পদচূড় করেন। এর পরপরই এ দুজনকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সম্পাদককে কৃটনৈতিক দায়িত্ব এবং নির্বাহী সম্পাদককে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। এ প্রতিনিধি দলটির দায়িত্ব ছিল জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে কথা বলা, মাহমুদ আলী এবং শাহ আজিজুর রহমান নামে দুজন বাঙালি যথাক্রমে দলটির প্রধান এবং উপপ্রধান ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যেদিন বাংলাদেশ মুক্ত হয় সেদিন মাহমুদ আলী পাকিস্তানে ছিলেন। একটি অঙ্গুরত্পূর্ণ মন্ত্রী পর্যায়ের পদ দিয়ে পাকিস্তান সরকার তাকে পুরস্কৃত করেছিল। শাহ আজিজুর রহমান সে সময় ঢাকায় ছিলেন, তাকে পাকিস্তানি সামরিকজাতার সাথে সহায়তা করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

আজিজুর রহমানের স্তু তার স্বামীর মৃত্যির জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে আবেদন জানান। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে জবাবে বলেছিলেন আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। এসএম আলীর প্রতিবেদনে বলা হয়, 'এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান তার ব্যক্তিগত সচিবকে চমকে দিয়ে নির্দেশ দেন যেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে যেন আজিজুর রহমানের স্তুকে প্রতি মাসে সংসার চালানোর জন্য ৫০০ টাকা করে দেয়া হয়।' কতোদিন পর্যন্ত? যতদিন পর্যন্ত আদালত আজিজুর রহমান বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না নেয়।

একজন সাংবাদিক তাঁর ভগ্নিপতির কারামুক্তির জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যান। শেখ মুজিবুর রহমান ওই সাংবাদিকের কথা থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার কাছে ওর বিষয়ে কোন কথা বলো না, ওর সম্পর্কে আমি জানি; ওর বিকলকে অভিযোগের ফাইলটি অনেক মোটা। অন্য কোন বিষয় থাকলে আমার সাথে কথা বলতে পারো।'

যখনই কেউ কোন পাকবাহিনীর সহায়তাকারীকে মুক্ত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে তদবীর করতেন তার প্রথম প্রতিক্রিয়া এমনই হতো। কিন্তু একটু পরেই তিনি নরম হতেন। প্রায়শই বন্দী থাকা রাজনীতিকদের পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে নিয়মিত ভাতা প্রদানের নির্দেশ দিতেন।

যখন ওই সাংবাদিকটি বুঝতে পেরেছিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের রাগ একটু কমে এসেছে তখনই তিনি পাশের কক্ষে অপেক্ষারত তার বোনকে শেখ মুজিবুর রহমান কাছে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেন।

তখন মেহড়ো কষ্টে শেখ মুজিবুর রহমান তাকে প্রশ্ন করেন, 'আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?' তখন সাংবাদিকের বোন উত্তর দেন, 'আমার স্বামী গত ছয় মাস যাবৎ কারাগারে আছে। আমি এটা আর সহ্য করতে পারছি না।' শেষে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রশ্ন রাখেন, 'আমি আর আমার সন্তানদের অপরাধ কি?'

শেখ মুজিবুর রহমান এ কথা শনে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমার ভাই কোথায়। সে তোমাকে এখানে নিয়ে এসে নিজে কেটে পড়েছে। চিংড়া করো না। তোমার ভাইকে বল সে যেন আমাকে আগামীকাল ফোন করে।' পরদিন ওই নারীর স্বামীকে ছেড়ে দেয়া হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কিভাবে আবেদন জানাতে হবে যারা সেটা ঠিক মতো জানতো তারা তাকে দিয়ে প্রায় যে কোন কিছুই করিয়ে নিতে পারতো। পাকবাহিনীকে সহায়তা করে কৃত্যাত ছিলেন এমন এক ব্যক্তির স্তৰী শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে কিভাবে কানাকাটি করবেন তা আগে থেকে অনুশীলন করে নিয়েছিলেন, এবং তিনি এত ভালো অভিনয় করেছিলেন যে মুজিব বাধ্য হয়ে ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যি দিয়েছিলেন। যখন ডি. তার কাছে ওই অপরাধীকে মৃত্যি দেয়ার কারণ জানতে চেয়েছিলেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমি আর কিছুবা করতে পারতাম। ওই ব্যক্তি আমার বক্ষ ছিলেন। ভাবী বাচ্চাদের সাথে নিয়ে এসেছিলোঁ এবং তারা আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন।' ডি. তখন আবার বলেছিলেন, 'সে আমারও বক্ষ ছিল, তারপরও তার সবার শেষে মৃত্যি পাওয়া উচিত ছিল। তাকে মৃত্যি দিয়ে আপনি আর সবাইকে কারাগারে আটকে রাখতে পারেন না। তার পরিবারতো ক্ষুধায় মারা যাচ্ছিল না। যাই হোক, এভাবে যদি আপনি অপরাধীদের ক্ষমা করতে থাকেন তাহলে তো যে কোন খুনী বা চোর যারা তাদের পরিবারের একমাত্র উপর্যুক্ত ব্যক্তি তাদের কর্মনোই কোন দণ্ড হবে না।'

পরবর্তীতে তিনি তার শুভাক্ষণীদের বলেছিলেন, 'এটা আসলে কোন ব্যক্তিগত বিষয়ই নয়। শেখ মুজিবুর রহমান এখন ঠিকই বুঝতে পাচ্ছেন দেশ বিরোধীদের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করে তিনি জাতির কি ক্ষতি করেছেন। তিনি এখন আর শেখ মুজিবুর রহমান ভাই নন, তিনি একটি জাতির নেতা। ক্ষমাশীল হওয়ার চেয়েও তার জন্য এখন ন্যায় পরায়ণ হওয়া জরুরি। অর্থ কয়েকজনের প্রতি দয়া দেখাতে গিয়ে তিনি সংখ্যা গরিষ্ঠদের প্রতি অন্যায় করেছেন। প্রশাসনে আবেগের কোন জায়গা নেই, এ কথা সশ্রেষ্ঠ সংযোগের পরের সময়ের জন্য আরও বেশি প্রযোজ্য। স্বামীন্তা বিরোধী অপশক্তিতে ক্ষমাশীল আছে।'

শেখ মুজিবুর রহমান বলতেন, 'পরিবারের এক ভাই পাকিস্তানিদের সহায়তাকারী হলে দেখা যায় আরেক ভাই মৃত্যুযোগ্য। প্রতিটি পরিবারই অনেক ঝুঁগেছে। আমি তাদের ভোগাঞ্চি আর বাঢ়াতে চাই না।' এটি আসলে একটি আঘশিক ব্যাখ্যা।

কেউ কেউ বলে ধাকেন শেখ মুজিবুর রহমান তখন আহত করতে প্রস্তুত হলেও আঘাত করার মানসিকতা তার ছিল না। নিজ দেশের মানুষের ভালোবাসা পেতে তিনি এত উদয়ীর ছিলেন যে কাউকেই তিনি আঘাত করতে চাইতেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন না ‘যে দুষ্টকে রক্ষা করে সে শিষ্টের প্রতি অন্যায় করে।’

একজন বিকৃত তরুণ বলেছিলেন, ‘মুজিব মনে করেন বাংলাদেশ শেষের রাজত্ব।’ তিনি আরও বলেছিলেন, ‘একজন সাম্রাজ্য প্রভু যেই তার কাছে নিরাপত্তা চায় তাকে রক্ষা করে ধাকে। কিন্তু শান্তি বাংলাদেশে সাম্রাজ্য সংকৃতি আর বিভাস্ত ক্ষমতালতার জায়গা থাকতে পারে না।’ এই তরুণ নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং পাকিস্তানপক্ষীদের বিষয়ে তিনি ছিলেন আপোষহীন। ‘আমরা যদি এখনই নির্মূল না করি, তাহলে সুযোগ পাওয়া মাঝেই ওরা আমাদের খৎস করে দিবে।’

কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সময় জাতির পুনঃএকত্বকরণে বিশ্বাস করতেন। তিনি সত্যাই উঞ্চ এবং দয়ালু প্রকৃতির বাক্তিত্ব ছিলেন। ক্ষমতায় আসার আগে যারাই তাকে সহায়তা করেছিল তিনি তাদের কারও কথাই ভোলেন নি। কোন একটি সংলাপ বলার ক্ষেত্রে তার ভুল হলেও, কারও চেহারা চিনতে তার কথনে ভুল হতো না। শধু নাম মনে রাখা নয় শেষ করে দেখা হয়েছিল সেটি মনে রেখে তিনি অনেককে চমকে দিতেন।

১৯৭৪ সালে লাহোর সফরের সময় ১৯৭১-এর আগে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচিত ছিলেন এমন দু’একজন সাংবাদিকের সাথে স্বাক্ষর দেখানোর কারণে সে সময় শেখ মুজিবুর রহমান বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন। আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্প্রদানে যোগ দিতে গিয়ে এক বাংলাদেশি সাংবাদিককে সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান নিরাপত্তা সমস্যা তৈরি করে ফেলেছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান কিছু সমালোচক বলতেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে লোকে ভালোবাসলেও তাকে সম্মান করতো না। শ্রাকার সম্পর্কের মধ্যে একটু দূরত্ব থেকে যায়, শেখ মুজিবুর রহমানের সুকিয়ে রাখার মতো কিছু ছিল না। তিনি ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করতেন, তব পেতে নয়।

যারাই শেখ মুজিবুর রহমানকে এমন কি ঘোটাযুটি কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তারাই তাকে একজন স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি হিসেবেই জানতেন, এবং তারচেয়ে এমন কি দুই তিন বছর কম বয়সের বন্ধুরাও তাকে ভালোবেসে ‘তুই’ বলে সংযোধন করতেন।

মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং এর কিছু পরে পর্যন্তও লোকে তাকে ‘মুজিব ভাই’ হিসেবেই চিনতো। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ দেশে ফেরার পর ভাসমে তিনি নিজেকে এ নামেই সবার সামনে হার্জির করেছিলেন। এই সমোধনটিই তাকে মানাতো।

কিন্তু এই অতি পরিচিত 'মুজিব ভাই' সংস্থাদনের জায়গায় ধীরে ধীরে 'বঙ্গবন্ধু' আর 'বঙ্গপিতা' চলে আসে, এবং শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও নিজেকে 'বঙ্গবন্ধু' বলতেন। এর ফলে তার অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। হো তি মিন ছিলেন হো চাচা, শেখ মুজিবুর রহমানের উচিং ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ভাই হয়েই থাকা। শেখ মুজিবুর রহমান নিজে একজন সেহশীল পিতা হিসেবে ভাবতে ভালোবাসতেন, কিন্তু প্রায়শই তিনি একজন দায়িত্বজানহীন পিতার মতো আচরণ করতেন, বিশেষত অবাধ্য সন্তানদের বিষয়ে। অনেকেই ভাবতেন শেখ মুজিবুর রহমান হ্যাতো আর সব পিতার মতো নিজের সন্তানদের ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট।

পাবিত্রানি বাহিনীকে সহায়তা করেছিলেন এমন একজন সাংবাদিক মুক্তিবাহিনী তাকে হত্যা করবে ডেবে ডেয় পেয়েছিলেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গিয়ে তিনি তার পায়ে পড়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে রেঞ্চ গিয়ে বলেছিলেন, 'যাও! তুমি এমন করবে আমি আগেই জানতাম, তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না।'

একজন লেখক রেঞ্চ জিঞ্জেস করেছিলেন, 'মুজিব কি নিজেকে এ কালের যিত্ত ত্রিস্ট মনে করেন।'

শেখ মুজিবুর রহমান ওই সাংবাদিককে তিরক্ষার করেন নি বা তাকে সুপথে আসতেও বলেন নি। বরং তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের দয়ালু মনের কথা বোধা গেলেও, বিতর্কিত অঙ্গীত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো কি দরকারী ছিল?

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান কিছু সাংবাদিকের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আপনাদের কি মনে হয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বাস্তি মালিকানাধীন পুঁজি বলতে কিছু থাকবে?' সন্দেহ নেই এটি একটি বুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান কি ডেবেছিলেন, শারীনতা সংগ্রামের সময় আপোষ করেছিলেন এমন লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? এসব লোক যদি পেশাদারিত্বের দিক থেকে খুব দক্ষ বা সবার কাছে পরিচিত মুখ হতেন তখন না হয় তাদের নিয়োগ পাওয়ার এক ধরনের ব্যাখ্যা থাকতো, কিন্তু এরা সবাই ছিলেন অযোগ্য এবং কেউই তাদের সম্মান করতো না।

একটি প্রবাদ আছে, 'যে একবার তোমার প্রতি অন্যায় করেছে সে কখনোই তোমাকে ক্ষমা করবে না।' শেখ মুজিবুর রহমান যদি ডেবে থাকেন যে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করায় তারা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ থাকবে তাহলে তিনি একটি বিরাট ভূল করেছিলেন। বিশ্বস্ততা কি জিনিস তা এসব লোক জানতেনই না।

ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন প্রথম বিদেশি নেতা যিনি বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। কিন্তু তিনি সে অর্থে বিদেশি ছিলেন না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিমেয় এবং বাংলাদেশের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন একজন অসম্য সাহসী নেতা যিনি প্রচও আন্তর্জাতিক চাপ সহ্য করেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করে গেছেন।

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ ইন্দিরা গান্ধী যখন ঢাকা সফর করেন তখন তাকে যে ব্যাপক সংবর্ধনা দেয় হয় তা ছিল এদেশের মানুষের মনে তার জন্য যে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের লাখো মানুষ সেদিন যে নেতা তাদের সবচেয়ে দুর্বোগের মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে এক নজর দেখার জন্য জড়ো হয়েছিলেন।

ভারতের দরিদ্রদের মধ্যে যারা সবচেয়ে দরিদ্র তারা মুক্তির সংগ্রামের সময় যে দশ মিলিয়ন বাঙালি ভারতে শরণার্থী হয়েছিল তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ভারতের প্রতীক।

ইন্দিরা গান্ধীর ঢাকা সফরের তারিখটি ছিল একটি আনন্দের দিন, কারণ ১৭ মার্চ ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সেদিনের জনসভায় ইন্দিরা বলেছিলেন, 'আজকের দিনটি নিশেগভাবে উদ্যাপন করার মত। কারণ, আজ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন, শেখ মুজিবুর রহমান তখুন বঙ্গবন্ধুই নন পৃথিবীর সর্বত্র জুলুমবাজের নির্যাতনের শীকার মানুষেরই তিনি ভাই।'

ইন্দিরা গান্ধী সঠিকভাবেই বলেছিলেন, 'ভারত যদি আপনাদের সহযোগিতা করে থাকে তা করেছে আপনাদের আহ্বান তনে, আপনাদের উপর যে নিপীড়ন চলেছে তা সহ্য করতে না পেরে। আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছি আমাদের নিজেদের প্রতি সৎ থাকার জন্য এবং বহু বছর ধরে যে আদর্শ আমরা আকড়ে ধরে আছি তা তুলে ধরার জন্য। আমি বিশ্বাস করি আমাদের দুটি দেশের মধ্যে বক্তৃত গড়ে উঠবে মুক্তিযুদ্ধে আমরা যে সহযোগিতা আপনাদের করেছি তার ভিত্তিতে নয়, বরং দুটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের পারস্পরিক সাম্য ও সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে।'

কিছু ভারতীয় কর্মকর্তা চেয়েছিলেন যেন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে দু'দেশের বক্তৃতপূর্ণ সম্পর্ককে 'চিরস্থায়ী' চেহারা দিতে। প্রথমে এ প্রত্নাবের সমালোচনা করলেও পরে ইন্দিরা টিএস কাউলকে বলেন যেন বিষয়টি 'অনানুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে জানিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিক্রিয়া নেয়া হয়।'

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব টি.এ করিম এরকম একটি চুক্তি করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন এমন একটি চুক্তি চীনকে কেপিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত ছিলেন। কিন্তু ১৯ মার্চ ১৯৭২-এ যখন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বক্রতৃ, পারম্পরিক সহায়তা ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার আগে শেখ মুজিবুর রহমান চুক্তির বস্তুটিতে কিছু পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। চুক্তিতে যেন 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটির উল্লেখ থাকে সেটি শেখ মুজিবুর রহমান দাবি করেছিলেন এবং ইন্দিয়া গান্ধী এতে সম্মত হয়েছিলেন। এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমান চুক্তিপত্রটির একটি বাংলা কপি তৈয়েছিলেন।

ইংরেজিতে এই চুক্তিটির প্রথম বাক্যটি হিল :

Inspired by common ideals of peace, secularism, democracy, science and nationalism..."

একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় সকল প্রশাসনিক এবং সাংবিধানিক কর্তৃত তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধান বাক্তি ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। বন্দকার মৌলাক আহমেদ কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতে পারেন নি। অস্থায়ী সরকারের অপর চার সদস্যের মধ্যে তাজউদ্দিনেরই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে বিশ্বাস সবচেয়ে গভীর ছিল।

১৯৭২ সালে দেশ স্বাধীন হও্যার ঠিক পরেই একজন মেজর, যিনি বর্তমানে একজন মেজর-জেনারেল, বলেছিলেন, ‘তাজউদ্দিন আহমেদ নিবিট চিঠ্ঠে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি দৈনিক বারো থেকে খালো ষট্টা পরিশ্রম করতেন। তিনি নিজের অফিসেই দুমাতেন এবং নিজের কাপড় নিজেই পরিশ্রান্ত করতেন। অন্য কিছুর দিকেই তিনি মনোযোগ দিতেন না। মুক্তিযুদ্ধে জয় আসার আগে তিনি কখনোই আরাম করেন নি।’

চার বছর পর বাংলাদেশ: কোয়েস্ট ফর অটোনামি নামক গ্রহে উল্লেখ করেন, ‘প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বরত থাকা অবস্থায় তাজউদ্দিন আহমেদ নিজেকে একজন দৃঢ়চেতা এবং সর্বো উজাড় করে দেয়া নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দিন আহমেদ-ই-আওয়ামী সৌপ্রে প্রবাসী সরকারের চালিকা শক্তি ছিলেন।’

মুক্তির সংযোগে নতুন নেতার উৎব হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে যে তাজউদ্দীন সব সময় মুক্তিবের ছায়ায় থেকে কাজ করতেন, সেই তিনিই যুক্তের নয় মাসে নিজের যোগাতা প্রয়াসের সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিলেন। যুক্ত চলা কালে তার দায়িত্বটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তারপরও এ দায়িত্ব ছিল ‘অস্থায়ী’, কারণ যুক্ত চালানো হচ্ছিল মুক্তিবের নামে।

কিছু শীর্ষ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযুক্তকে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার শুরুর পর্যায় মনে করছিলেন। তারা যুক্তের সময় যে দৃঢ়ব্যৱহাৰ নয় মাস কেটেছে তা দ্রুত ভূলে যেতে চেয়েছিলেন এবং মুক্তির সংযোগে তাজউদ্দীনের ভূমিকাকে ন্যূনতম গুরুত্ব দিতেও তারা আঘাতী ছিলেন না।

পাকিস্তানী জেনারেলরা তাজউদ্দীনকে ঘৃণা করতেন। তারা তাকে হিন্দু বলতেন, তাদের মতে হিন্দু হওয়াটা অবমাননাকর ছিল। তারা তাজউদ্দীনের নাগাল পেলে তাকে ছিড়ে ঝুড়ে ফেলতেন।

অনেক পঁচিমা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরাও তাজউদ্দীনকে প্রচও রকম অপছন্দ করতেন। স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিগুলোর প্রথমেই মুজিবের সমালোচনা করার সাহস না থাকায় তারা তাজউদ্দীনকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিল। যারা প্রচও রকম ভারত-বিরোধী ছিলেন তারা তাজউদ্দীনকে ভারতীয় চর হিসেবে আখ্যা দেন এবং দেশের সব দুর্দশার জন্য তাকে দায়ী করতে থাকেন।

এককভাবে তাজউদ্দীনের প্রশংসা করার মাধ্যমে ভারতীয় সাংবাদিকরা তার অনেক ক্ষতি করেছিলেন। একজন প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক তাজউদ্দীন সম্পর্কে নিবেদন, ‘ড্যাক্টর রকম ভারতপুরী।’

তাজউদ্দীন ছিলেন বৃক্ষিমান, একনিষ্ঠ এবং পদ্ধতিগতভাবে কাজ করায় বিশ্বাসী। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতার চেয়ে তার পড়ালেখা বৈশিষ্ট্য ছিল এবং রাজনৈতিক জ্ঞানও ছিল যথার্গত, যে কোন বিষয়ে তার প্রতিভা প্রচও রকম বেশি না হলেও অন্তত সে বিষয়ে তার একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকতো। তিনি চয়ঙ্কার কপা বলতে পারলেও, অনসভার বঙ্গ হিসেবে সেরা ছিলেন না। দলীয় সভা আর কনফারেন্সে তিনি সবচেয়ে ব্রহ্মন্দে থাকতেন।

তিনি একজন বাশভাবি বাস্তিত ছিলেন এবং তার মধ্যে চট্টলতা ছিল না। তিনি রাসিকতায় জড়াতেন না, দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন এবং একজন রাজনীতিবিদের তুলনায় তিনি বেশি স্পষ্টভাবী ছিলেন। তিনি কপনোই নিজের অনুভূতি লুকাতেন না বা সহকর্মীদের সাথে তার মত পার্থক্য চেপে রাখতেন না। মতুন নতুন বন্ধুদের মন জয় করার পরিবর্তে তিনি নতুন শক্তি তৈরি করতেন।

চাকার একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, ‘বঙ্গবন্ধু প্রধানতম নেতা হলেও, আওয়ামী লীগের মধ্যে সত্ত্বাকারের রাজনীতিবিদ ছিলেন তাজউদ্দীন আর যোন্তাক। তাজউদ্দীন ছিলেন গঠনমূলক আর যোন্তাক ছিলেন ধৰ্মসাঙ্গীক। তাজউদ্দীন তার সর্বস্ব দিয়ে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতেন আর যোন্তাক গোপনে এবং বিরুদ্ধে কাজ করতেন।’

আওয়ামী লীগ ছিল একটি বহুমুখী দল। যোন্তাক এবং তাজউদ্দীন এই দলটির মধ্যে পাকা দৃষ্টি উপরামের প্রতিনিধিত্ব করতেন। একদিকে তাজউদ্দীন ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং তিনি দেশে সমাজবাদী ব্যবস্থা কার্যম করতে চাইতেন, অন্যদিকে যোন্তাক ছিলেন সাম্প্রদায়িক এবং তিনি শুক্র বাণিজ্যিক উদ্যোগের পক্ষে ছিলেন।

অনেকেই মনে করেন আওয়ামী লীগের চেয়ে কোন একটি নামপত্তি দলে পাকালে তাজউদ্দীন হয়তো আরও শৃঙ্খলী পাকতেন। কিন্তু সত্ত্ব তালো তার দলের সহকর্মীবা তাকে ড্যাক্টর বামপুরী মনে করলেও তাজউদ্দীন মার্কসবাদী ছিলেন না।

তাজউদ্দীন তার একজন বকু শেব মুহূর্তে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়া থেকে বিরত হলে সেই বকুটির সিন্ধানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি ঐ বকুটিকে বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের ডুলনায় তোমার মধ্যে অনেক বেশি বৃক্ষজীবীসূলভ উপাঞ্চল রয়েছে, কিন্তু তুমি যাদ একটি সত্যকারের রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে চাও, তবে আওয়ামী লীগই তোমার জন্য একমাত্র গন্তব্য।'

তাজউদ্দীনের জন্য আওয়ামী লীগই একমাত্র রাজনৈতিক দল ছিল।

বাংলাদেশে মঙ্গোপজ্জনী আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি কমিটি'র সভাপতি ছিলেন তাজউদ্দীন। তবুও ১৯৭৪ এর শেষ চতুর্ভাগে কিছু কিছু সিপিবি নেতা তার উপর সম্প্রস্ত ছিলেন না। তারা বিশ্বাস করতেন মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি কট্টর ডানপাষ্ঠী এবং কট্টর বামপাষ্ঠীদের প্রতিরোধ করতে পারেন এবং তারা মুজিবের হাতকে শর্কিশালী করতে চাইছিলেন।

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে যখন তাজউদ্দীন পদত্যাগ করেন তখন অনেক সিপিবি নেতার মতে তিনি তড়িঘাড়ি করে দেশের একটি ত্বক্ষিকালে ডুল সিন্ধান নিয়েছিলেন। এই লেখককে একজন সিপিবি নেতা বলেছিলেন, 'তাজউদ্দীন একটি বেশি রকম ব্যক্তিগতভাবাদী। দেশের জন্য তুরুতর মুহূর্তে পদত্যাগ করে জটিলতা বাঢ়ানো তার মোটেও উচিত হয়নি, তার ব্যক্তিগত চিন্তা বা ক্ষেত্র যাই হোক না কেন। তিনি নিজেও জানেন না তিনি কি করে ফেলেছেন। তার এ কাজের ফলে কেবল স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র আর বিদেশী শক্তদেরই সুবিধা হবে।'

মুজিব না থাকলে তাজউদ্দীন কখনোই আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ে আসিন হতে পারতেন না। তবু খেকেই আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকা কট্টর ডানপাষ্ঠী নেতারা তাজউদ্দীনকে পছন্দ করতেন না। মুজিব তাকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলে এক সময় আওয়ামী লীগের মহাপরিচ করেছিলেন, মোস্তাক এবং অন্যান্য নেতাদের বিরোধিতা সন্তোষ।

কিন্তু এর ফলে তখু তাজউদ্দীন এককভাবে ফলভোগ করেছেন এমন নয়। তাজউদ্দীন অশ্বতেই রাগার্বিত হয়ে যাওয়া ব্যক্তি হলেও, সব সময় তিনি রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করতেন এবং যখনই রাজনৈতিক সিন্ধান নেয়ার প্রয় আসতো তিনি কোন রকম বিধায় ভুগতেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং ছোট খাটো ব্যাপারেও মনযোগী, সবসময়ই তিনি সুযোগ করে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে কাজে মনোনিবেশ করতেন।

তাজউদ্দীন মুজিবের মধ্যে এমন একজন সহযোগীকে দেখেছিলেন যে বিশ্বস্ততা আর দায়িত্বশীলতার সাথে তার উপর অর্পিত কর্তব্য পালন করতে পারবেন। পদ্ধতিগত ভাবে কাজ করতে সক্ষম এবং ধীরচিত্ত তাজউদ্দীন সাহসী মুজিবের

পরিপূরকের কাজ করতেন। যখন মুজিব ১৯৭১ এর ২ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন তখন তাজউদ্দীনই জনগণের কাছে দিক নির্দেশনা পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন এবং তিনি নিজে এসব দিক নির্দেশনা প্রস্তুত করতে ভূমিকা রেখেছিলেন। মুজিব যখন ১৯৭১ এ ইয়াহিয়া খানের সাথে সমঝোতা করছিলেন তখন তাজউদ্দীন তার সহযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ এর ২১ মার্চ মুজিব যখন ইয়াহিয়া খানের সাথে একটি অনিদ্রাবিত বৈঠকে বসেন তখন তিনি শুধু তাজউদ্দীনকেই সাথে নিয়েজিলেন। পাকিস্তানী সেনা বাঠী যদি হামলা করেই বাসে সে বিসয়ে আলাপ করার জন্য যে অল্প কায়েকজনের উপর মুজিব আহতাশীল ছিলেন তার মধ্যে তাজউদ্দীন অন্যতম ছিলেন।

মোদিন মুজিব ঢাকায় ফিরেছিলেন, সেই ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জনসভায় মুজিব কেবল মাত্র তাজউদ্দীনের কথাই আলাদা করে উদ্বেগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তাজউদ্দীনকে কাজ এগিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছিলাম।’

এই বিশেষভাবে উদ্বেগ তাজউদ্দীনের প্রাপাই ছিল, কিন্তু এর ফলে কিছু জেষ্টা আওয়ামী শীগ নেতা তাজউদ্দীনের প্রতি আরও বেশি ঈর্ষাখিত হয়ে পড়েন।

মুজিব ফিরে আসার পর তাজউদ্দীন তার স্থিতি প্রকাশ করেন। মুজিবের প্রতি তার আনুগত্য ছিল সম্বেদ্ধাতীত এবং তিনি কোন কারণেই তার প্রতি মুজিব অন্যায় করেছেন এমন ভাবার লোক নন। কিন্তু কেউই গুরুত্ব দাবাতে পচন্দ করেন না, অনুরূপ কথনো কথনো বিচিত্র হতে পারে। মধ্যে তাজউদ্দীন কোন ক্ষেত্রে দেখাননি, কিন্তু তিনি সাদি ভোবে পাকেন দীর্ঘ নয় মাস তিনি যে পরিষ্কার করেন। মুজিব তার যথেষ্ট প্রশংসা করেননি তাহলে তা হতো খুবই মানবিক আচরণ।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি যখন মুজিব তার রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হন, তার আগে পর্যন্ত তাজউদ্দীন ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং এর ফলে তার গুরুত্ব অনেকাংশে কমে আসে। নজরুল ইসলামের অবস্থান হয় মন্ত্রীসভায় তাজউদ্দীনের উপরে, অবশ্য এটি করা হয়েছিল জেষ্ট্যাতার চিন্তিতে। কিন্তু কেউ কেউ এটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাজউদ্দীনের পদাবলম্বন হিসেবে দেখেছিলেন।

তাজউদ্দীনের কিছু শক্ত আবার নতুন করে প্রচার করা শুরু করে যে, তাজউদ্দীন মুজিব ফিরে আসুন এটা চান নি। এই অপপ্রচারের জবাব দেয়া বা মুজিবের সাথে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়ে পাকলে তা যিটিয়ে ফেলার পরিবর্তে তাজউদ্দীন দরঃ কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে এটা ভেনে কিন্তু হয়ে ওঠেন। এর ফলে তার অবস্থান আরও নাঞ্জুক হয়ে ওঠে।

১৯৭২ সালের শুরুর দিকে তাজউদ্দীন এবং নজরুল ইসলাম এ দুজন জেষ্ট মন্ত্রীর মধ্যে একটি প্রকাশ্য বিতঙ্গ হয়। তাজউদ্দীন কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের পক্ষ ধরেই

বাংলাদেশকে গড়ে তোলা সম্বব বলে মনে করে বলেছিলেন, 'যদি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে গণতন্ত্র বাধা হয়ে দাঢ়ায় তাহলে আমাদের গণতন্ত্র বাদ দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।' জবাবে নজরুল ইসলাম কঠোর ভাষায় বলেন, 'যদি সমাজতন্ত্র দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঢ়ায় তাহলে আমাদের সমাজতন্ত্র বাদ দিয়েই এগোতে হবে।'

দেশের প্রধান চারটি আদর্শের মধ্যে দুটি ছিল গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র।

মুজিব এই তিটি নিয়ে কৌতুকবোধ করেছিলেন। তিনি এই তর্ক থামিয়েছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে এ নিয়ে অনেক দ্বিধা-স্বন্দ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

এক বছর পর মুজিব নিজেই একটি সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে কিভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় তা নিয়ে তার দৃষ্টিভাব কথা বলেছিলেন।

অর্ধমাস্তু হিসেবে তাজউদ্দীন নিজের প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিলেন, তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতেন এবং কর্মকর্তাদের মন জয় করে নিতে পেরেছিলেন। মাঝে মাঝেই তিনি ট্রেন ইউনিয়নের ফিক্সড গোষ্ঠীগুলোর সামনে বক্তব্য রাখতেন। তার বক্তব্যগুলো খুব জনপ্রিয় হতোনা। জনপ্রিয় হওয়ার জন্য যে নাটকীয়তা রাজনৈতিকদের মধ্যে থাকতে হয় সত্ত্বত তা তাজউদ্দীনের মধ্যে ছিল না। তিনি হয়তো জনপ্রিয় নেতা হতে যা প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক বেশি কাঠোয়া ছিলেন।

১৯৭৩ সালের ২ জানুয়ারি যখন সারা ঢাকায় সাধারণ ধর্মযাট ডাকা হয় তখন অধিকাংশ নেতাহ এত ভীত ছিলেন যে তারা এমন কিংবা বক্তুদের সাথেও দেখা করাচিলেন না, অথচ তাজউদ্দীনের বাড়ির প্রধান ফটক খোলাই ছিল এবং তাকে চিনেন এমন যে কেউ হেঁটে বাড়ির ভেতরে চুকে পড়তে পারতেন।

১৯৭৩ সালে লক্ষণ যাওয়ার পথে তাজউদ্দীন যখন নয়াদিল্লী পৌছান তখন তার সঙ্গীরা সবাই সুটি পরে ছিলেন, কিন্তু তাজউদ্দীন বরাবরের মতোই একটি বুশ শাট পরে ছিলেন। তখন নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. এ. আর. মর্টলক তাজউদ্দীনকে অগ্রত একটি হালকা জ্যাকেট পড়ে থাকতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা যখন লক্ষণ পৌছাবেন তখন সেখানে বেশ ঠাণ্ডা থাকবে।' তাজউদ্দীন কোন জবাব দেন নি। তাজউদ্দীন একজন বোধসম্পন্ন প্রাণবয়ক লোক হলেও সে সময় অবোধ শিতর মতো আচরণ করাচিলেন।

তাজউদ্দীনের একজন পড়াকাজকী তাকে বলেছিলেন, 'আপনি নিজের কথা না ভাবলেও দেশের কথা ভেবে হলেও আগন্তুর নিজের খেয়াল রাখা উচিত।' তাজউদ্দীনের জবাব ছিল, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই যদি আমি মারা যেতাম সেটাই সবচেয়ে ভালো হত।'

এটি কোন মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা নয়। অনেকেই বিজয়ের মুহূর্তে মারা যেতে চান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাওয়ার সময়টি ছিল তাজউদ্দীনের সেরা সময়।

তাজউদ্দীনের বিপক্ষ শক্তিগুলো তার সাথে মুজিবের ব্যবধান বাড়িয়ে তুলছিল। ১৯৭৪ এর ২২ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান যখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তার পর কিছু দুষ্ট লোক প্রচার করতে থাকে মুজিব তাজউদ্দীনকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দেবেন।

১৯৭৪ এর ২৬ অক্টোবর তাজউদ্দীনের বাধ্যতামূলক পদত্বাগ আকস্মিক ছিল না। এর মাঝে চারদিন আগে কিসিখারের সফর থেকেই বাংলাদেশ দীরে দীরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুকছে বলে অনেক পঞ্চিয়া এবং বাংলাদেশী সাংবাদিক ধারণা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ততোদিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য অনেকের সাথে তাজউদ্দীনেরও মন জয়ের চেষ্টা করছিল।

বেশ কিছু কাল ধরেই মুজিব মন্ত্রীসভা থেকে তাজউদ্দীন সহ আরও কয়েকজনকে সরিয়ে দেয়ার কথা তাবছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীন নিজের নিজের বিদ্যুৎের সময় ঠিক করেছিলেন। ৩৭ দিনের বিদ্যুৎ সফর শেষে তিনি গাথন ঢাকায় আসেন তখন বিমান বন্দরে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় তিনি কঠোর ভাস্য সংকারের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি ঐ দিনই এ কাজটি কেন করেছিলেন। তিনি হয়তো তখনই বুঝতে পেরেছিলেন আর কয়েকদিন পর এই সাক্ষাৎকারটি দিয়ে তা হয়তো এত ব্যাপক প্রচার পাবে না এবং ব্যাপক প্রভাবও রাখতে পারবে না।

তাজউদ্দীন মুজিবের পেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে পদত্বাগপত্র ছেন দেননি। মুজিব তাকে পদত্বাগ করার নির্দেশ দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন।

২৬ অক্টোবর ১৯৭৪ মুজিব যখন তাজউদ্দীনের পদত্বাগ পত্রের জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিলেন তখন তিনি বুব রাগান্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যেসব আওয়ামী লীগের তার কাছে তাজউদ্দীন সম্পর্কে আজে বাজে গঢ় করেছিলেন তাদের উপর ক্ষণে হয়েছিলেন।

মুজিব সব সময়ই তার ক্ষেত্রে স্বীকার হয়েছেন এমন বাকিদেরকে সাক্ষনা দেওয়ার জন্য পরে তাদের প্রতি দয়ালু হতেন। অনেক আওয়ামী লীগ দেতাকে হতাশ করে ২৬ অক্টোবরের পরেও কয়েকবার মুজিব তাজউদ্দীনের ঘৰস্ত হয়েছিলেন এবং তাকে মন্ত্রীসভায় ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করেছিলেন। তাজউদ্দীনের প্রস্তাবে মুজিব তার সাথে এমন একটি বৈঠকে চোপের পানি ফেলেছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীন এতটাই মর্মাহত হয়েছিলেন যে মুজিবের পাসের জলও তার মন গলাতে পারেনি।

মুজিব, মোস্তাক এবং নজরুল ইসলাম ছিলেন সমবয়সী। আর তাজউদ্দীন তাদের চেয়ে ধায় খাই পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন। এটি তাদের পুনর্বিপনকে আরও অসম্ভব করে তুলেছিল। মুজিব হেবেছিলেন তাজউদ্দীন তার প্রতি অকৃতজ্ঞ আচরণ করছিলেন, আর তাজউদ্দীন তাবছিলেন তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে।

তাজউদ্দীন তার অনুভূত গোপন করেন নি, কিন্তু যখন ১৯৭৫ এ দুজন ডারভীয় সাংবাদিক তার সাথে দেখা করেন তখন তিনি প্রকাশ্যে মুজিবের কোন সমালোচনা করেন নি, তিনি বলেছিলেন, ‘তিনিই আমার নেতা।’

তাজউদ্দীনের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন ঢাকার এমন একজন প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতার মতে ১৯৭৫ সালে কিছু মার্কিন ব্যক্তি তাজউদ্দীনের কাছে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাজউদ্দীন সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। ঐ আওয়ামী লীগ নেতা তার উভাকাঞ্জীদের বলেছিলেন, ‘তাজউদ্দীন এ খবর বঙ্গবন্ধুকে জানিয়েছিলেন এবং তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে।’

রাজনৌতির কবি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল মুজিবের মনে পূর্খে রাখা বহুদিনের অগ্রগতি। দেশ স্বাধীনতার অনেক আগেই মুজিব বাংলাদেশের কথা বলতেন, পূর্ব পাকিস্তান বা এমন কি পূর্ব বাংলার কথও না। পঞ্চাশের দশকে তিনি তাঁর কিছু বন্ধুকে বলেছিলেন, 'যদি ৫০০০ মানুষ প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে তাহলে আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পারবো।' জহর হসাইন চৌধুরী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার ভাকে সাড়া দিয়ে কভাজন প্রাণ দিতে পারে বলে আপনি মনে করছেন?' মুজিব কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিয়েছিলেন, 'পাঁচজন।'

১৯৬৯ সালে ঢাকা সেনানিবাসে যখন সেনাবাহিনী মুজিবকে আটকে রেখেছিল তখন হাজার হাজার মানুষ সেখানে আক্রমণ করে মুজিবকে ছাড়িয়ে আনতে প্রস্তুত ছিলেন।

ভূট্টো বলেন, 'তখন সারা বাংলা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তারা একজন নায়কের রোজে ছিল। পরিস্থিতি মুজিবকে সে নায়কের ভূমিকায় বাছাই করেছিল। তিনি একটি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ঘটনায় পরিগত হয়েছিলেন। সংগ্রামের আগুন জ্বালানো ব্যক্তি হিসেবে মুজিব সব সময়ই ছিলেন, কিন্তু জনগণের মহান নেতা মুজিব সৃষ্টি হয়েছিলেন পূর্ববর্তী দুটি সরকারের আমলে করা উপর্যুক্তি ভূল এবং আন্ত হিসাবের কারণে।'

পরিস্থিতির কারণেই কেবল একজন মানুষ জাতীয় নায়কে পরিণত হন না। মুজিবের সৎ সাহস ছিল অতুলনীয় এবং তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল নিউজিল্যান্ডে প্রতিকায় ছাপা হয়, 'গত মাসে মুজিব যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তখন তার সমালোচকরা বলেছিলেন যে তিনি এমন করেছেন কেবল তার চরমপক্ষী সমর্থকদের চাপে পড়ে, তিনি শুধু একটি বিশাল জনতার চেয়ের উপরে চড়তে চাইছিলেন যাতে তিনি এর নিচে চাপা পড়ে না যান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঙালী 'জাতি'র সংগ্রামী নেতা হিসেবে মুজিবের উচ্চে আসাটা ছিল তার সমগ্র জীবন বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে লড়াই করার বৌকিক ফলাফল। মুজিব একটি জনতার চলের চূড়ায় বসে থাকলেও, তিনি ঐ জাহাঙ্গার দুর্ঘটনাবশত যান নি।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সাথে মুজিব বেড়ে উঠেছিলেন। যখন অন্য নেতারা আইয়ুব খানকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন অথবা এমন কি তার সাথে আপোষণ করেছিলেন তখন মুজিব যা করা উচিত তা করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সেনা শাসন কাময়ের পরে আইয়ুব খান মুজিবকে সেনা বৈরোচারের প্রধান শফদের একজন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কোন বিচার ছাড়াই মুজিবকে টোক মাস আটকে রাখা হয়েছিল। মৃত্তি দেয়ার পর মুজিব পরবর্তী পাঁচ বছর কোন ধরণের রাজনীতিতে জড়াবেন না এমন মুচলেকা দিতে অসীকৃতি জানান। তাকে এ কারণে আরও ছয় মাস কারা বরণ করতে হয়।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পূর্ববঙ্গকে বিছিন্ন করে ফেলেছিল এবং এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় পাকিস্তানের দুই অংশ খুব বেশি দিন এক থাকতে পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলো যখন ১৯৬৬ সালের তাসবিদ চূক্তির বিরোধিতা করে আন্দোলন শুরু করে তখন পূর্ব বাংলা এ আন্দোলনকে আগত জানায়।

১৯৬৬ সালে মাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলনে মুজিব আওয়ামী লীগের ছয় দফা পেশ করেন।

এই ‘ছয় দফা’কে বলা হয়েছিল ‘পূর্ব বাংলার মানুষের বাঁচার দাবি।’ দাবিগুলো ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের প্রাদেশিক স্থায়ী শাসনের দাবি।

মাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে মুজিব এসব দাবি বাস্তবায়নের জন্য একটি জোরদার রাজনৈতিক প্রচারণা অভিযান শুরু করেন। তিনি যে ভাষা জনগণ সহজে বুঝতে পারে সে ভাষায় তাদের সাথে কথা বলতেন, এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের দাবির কথা তিনি দেশের সকল কোণায় ছড়িয়ে দেন।

আইয়ুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। একজন সেনা শাসক যে একটি মাত্র ভাষা বুঝেন তিনি সেটিই ব্যবহারের হ্যাকি দেন। তিনি ‘অঙ্গের ভাষা’ ব্যবহারের হ্যাকি দেন। তিনি হ্যাকি দিয়ে বলেন বাঙালীর যদি চেতনা না ফিরে তবে শিয়ই একটি ‘গৃহযুদ্ধ’ পরিস্থিতি তৈরি হবে।

১৯৬৬ সালের ৬ মে মুজিবকে ঘ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে একত্তে মামলা চালু করা হয়। একটি মামলায় তার জামিন হওয়া যাওয়াই তাকে অপর একটি মামলায় ঘ্রেফতার করা হচ্ছিল। তিনি জেলে চুক্তিলেন আর বের হচ্ছিলেন। এতে বিচলিত না হয়ে মুজিব যখনই অন্ত সময়ের জন্য মৃত্তি হাতেন তখনই জনগণের উদ্দেশে আবেগে ভরা ভাষণগুলোতে পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানের ঔপনিরোধিক প্রভৃতীর হাত থেকে জনতাকে মুক্ত করার কথা বলে যাচ্ছিলেন। তাকে যেন দেশের মানুষকে স্বাধীন করার ভূতে পেয়ে বসেছিল।

১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুজিবকে সেনা বাহিনীর জিম্মায় নেয়া হয়। এর কিছুদিন পর তাঁকে আগরতলা বড়বগ্ন মামলার প্রধান আসামী করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর কয়েকজন বাঙালী সদস্যকে সাথে নিয়ে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র করার চক্রান্তের অভিযোগ আনা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আ্যাকশন কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি গণ আন্দোলনের চাপে পড়ে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ঘড়িযন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রদের আ্যাকশন কমিটি মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়।

আইনুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় ১৯৬৪ সালে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় তখন মুজিব ছিলেন বাঙালীর অনেক নেতার মধ্যে একজন মাত্র। ১৯৬৬ সালে মুজিব যখন ছয় দফা দাবি পেশ করেন তখন তিনি বাঙালীর প্রধানতম নেতা, কিন্তু তখনো তাঁর নেতৃত্ব অবিসংবাদিত ছিল না। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ এ মুজিব বাঙালীর আশা আর আকস্তকার প্রতীক হয়ে ওঠেন।

এরকম একটি কথা চালু ছিল যে মুজিব বাঙালীর সশস্ত্র সংগ্রাম করার কোন নির্দেশ ১৯৭১ এর মার্চ দেরীন। মুজিব অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওসমানীকে বলেছিলেন যেন ওসমানী বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের যে কোন ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন, কিন্তু ওসমানী বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের কাছে খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে পাঠানো বার্তায় জানান তারা যেন পাকিস্তানীরা আঘাত হানার আগে কোন কিছুতে জড়িয়ে না পড়েন।

খুশবন্ত সিং এর কাছে সাক্ষাত্কারে বলেন, 'যদি পাকিস্তানিয়া শুধু নির্বাচিত কিছু রাজনৈতিক নেতার উপর হামলা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে হয়তো সেনা বাহিনীতে বাঙালী কর্মকর্তারা এবং পুলিশ বাহিনী নিরপেক্ষ থাকতো...'।

যখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কোন ক্ষেত্রেই বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের উপর বিশাস রাখতে পারেছিল না, তখন বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল না।

কেউ কেউ এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, মুক্তিদেহী ছাত্র নেতা এবং আরও কিছু লোক মুজিবকে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে বাধ্য করেছিলেন। এই মতবাদের সাথে বিরোধ পোষণ করে ডুট্টো বলেছিলেন, 'যে কোন গণ আন্দোলনে একজন নেতার যতটুকু নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে মুজিবেরও ততটুকু নিয়ন্ত্রণ ছিল। জনগণের উপর ব্যাপক প্রভাব আছে এমন একজন নেতার ক্ষেত্রেই অঞ্চল কয়েকজন ছাত্রনেতা এবং আওয়ামী লীগের পেছনের সারির চরমপক্ষীদের হাতের পুতুল হতে পারেন না। মুজিব তার কৌশলের অংশ হিসেবে প্রায়ই এমন ভাব করতেন যে তিনি একজন মধ্যমপক্ষী নেতা যার উপর চরমপক্ষীরা প্রবল চাপ গৃঠি করছে। কিন্তু এটি ছিল স্বেক্ষ তার চালাকী।'

মুজিবের বিরক্তে ১৯৭১ এ যখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার বিচার চলছিল তখন ডুট্টো তার বিরক্তে আনা অভিযোগগুলোর সত্যতা প্রমাণের জন্য এসব কথা বলেছিলেন,

কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই ভূট্টো এমন কথা বলে থাকুন না কেন, মুজিব চরমপন্থীদের ত্রৈডানক ছিলেন না বলে ভূট্টো যে দাবি করেছিলেন তা সঠিক ছিল।

৭ মার্চ ১৯৭১ এ মুজিব ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ তার বার্তাটি স্পষ্ট ছিল।

এ কথাগুলো বলে মুজিব তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার ৭ মার্চের ভাষণ সর্বকালের সেরাগুলোর মধ্যে একটি। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ ভাষণ অসংখ্যাবার বাজানো হয়েছিল এবং এটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭২ সালে সেনা বাহিনীর উপপ্রধান থাকা অবস্থায় ‘বার্ষ অফ এ নেশান’ শিরোনামের একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা পরবর্তীতে পুনর্মুক্তি হয়েছিল, সেখানে তিনি লিখেছিলেন, ‘ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিল আমাদের জন্য সবুজ সংকেত।’

এই ভাষণটি যে স্বাধীনতার আহ্বান ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এরপরও কেউ কেউ ৭ মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণে মুজিব স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন নি বলে তার সমালোচনা করে থাকেন।

জনসভার মাধ্যমে কখনো স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয় না। মুজিব সেদিনের জনসভায় প্রকাশ্য স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তা নিঃসন্দেহে আক্রমণের জন্য উদ্যোব হয়ে থাকা পাক সেনাবাহিনীর পক্ষেই যেত। মুজিব এমন কিছু বললে রেসকোর্স ময়দান এবং তার আশে পাশে জড়ো হওয়া লাখো জনতার ভাগ্যে কি হতো তা ডেবেই আতঙ্কিত হতে হয়।

ঐ ময়দানের উপরে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার ঘোরাঘুরি করছিল।

৭ মার্চ ১৯৭১ এর জনসভা শেষ করার পর মুজিব আশৃত লোদ করেছিলেন। সেদিন সকায় যারা তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্য মুজিব বলেছিলেন, ‘আমি এখন একজন মুক্ত মানুষ। আমি আমার দায়িত্ব করেছি।’

১৯৭১ এর মার্চ মাসে যখন মুজিব এবং ইয়াহিয়া খানের মধ্যে সংলাপ শুরু হয় তখন চীনপন্থী ঝোকের কারণে বিপ্লবী এমন একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, ‘মুজিব একজন কেরেনকি। মুজিব নিচয়ই ছয় দফা দাবির বিষয়ে আপোয় করবেন এবং ইয়াহিয়ার সাথে সমরোত্তায় চলে আসবেন।’ ঐ সাংবাদিক একজন লেনিনের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

যখন ঐ সাংবাদিক তত্ত্ব আওড়াচ্ছিলেন তখন মুজিব জনতার সুরেই কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবি নিয়েই কেন্দ্রীয় সংসদ এবং প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। ছয় দফা নিয়ে যে কোন আপোয় করা হলে তা

হতো প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের খপ নিয়ে জনগণ আওয়ামী লীগকে যে বিপুল সমর্থন দিয়েছিল তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ।

মুজিব যদি চাইতেন তাহলে এক বছর আগেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন । আইয়ুব খানের সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা জি. ডাক্টর চৌধুরী বলেছিলেন, ‘...আইয়ুব খান মুজিবের সাথে একটি সময়োত্তায় পৌছেছিলেন এবং তারা দুজনে একটি হিতাবস্থায় পৌছার বিষয়ে প্রায় একমত হয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু সেনা বাহিনীতে আইয়ুব বিরোধীরা তাকে ‘পেছনের দরজা’র পরিবর্তে ‘সামনের দরজা’ (অর্ধাং নির্বাচনের মাধ্যমে) দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার অল্লেখন দেখানোতে ঐ পরিকল্পনা ভেঙ্গে যায় । মুজিব সেনা বাহিনীকে তাকে বোকা বানানোর সুযোগ দিতেন কি না, তা যার যার দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে ।’

এটি অবশ্যই যার যার দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে । আইয়ুব খান নিজের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেছে বুঝতে পেরে মুজিবকে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার প্রত্বাব দিয়েছিলেন । মুজিব এ প্রত্বাবে রাজি হলে তাকে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর শর্তে চলতে হতো এবং তাকে ক্ষমতায় থাকতে হতো পাকিস্তানী জেনারেলদের সন্তুষ্ট করে ।

জি. ডাক্টর চৌধুরী, যিনি একজন বাঙালী ছিলেন এবং আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খান এ দুজনের সাথেই কাজ করেছেন, তিনি কেবল প্রাসাদ রাজনীতি আর পেছনের দরজার মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়াটাই বুঝতেন । মুজিব ছিলেন জনগণের নেতা । পেছনের দরজা দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ধারণাটিই তার কাছে ছিল চরম ঘৃণার ।

অনেকে বলে থাকেন মুজিব প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের চেয়ে বেশি কিছু চান নি এবং তারা তাদের বক্তব্যের পেছনের যুক্তি হিসেবে বলে থাকেন ১৯৭১ এর মার্চ আওয়ামী লীগ নেতারা প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ।

একথা সত্য যে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য এমন কি মানসিকভাবেও প্রস্তুত ছিলেন না । সত্য হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যখন ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনী হামলা চালায় । কিন্তু মুজিব স্বাধীনতার কথাই ভাবছিলেন । এমন কি যখন তিনি প্রকাশ্যে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন না তখনো ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তিনি নিউজিল্ডেইক পত্রিকার লরেন জেনকিনসকে বলেছিলেন, ‘এখন আর পুনরুদ্ধারের কোন আশা নেই । এ দেশটিকে আমরা দেভাবে চিনতাম তা শেষ হয়ে গেছে ।’

৫ এপ্রিল ১৯৭১ এ নিউজিল্ডেইকে ছাপা হয়েছিল, ‘তিনি (মুজিব) ছিলেন রাজনীতির কবি, অকোশলী নন, কিন্তু বাঙালীও যাত্রিকের চেয়ে বরং বেশি শৈল্পিকই, এবং এ কারণেই মুজিবের রাজনীতির ধরণটিই সর্বত্তরের এবং সকল মতের বাঙালীর ঐক্যবৃক্ষ করার জন্য সঠিক ছিল ।’

সকল জাতীয়তাবাদী নেতার মতোই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি বিভিন্নভাবে ধরা দিতেন। কামাল হোসেন বলেছিলেন, ‘মুজিবের জন্য বিশেষ সুবিধার বিষয় ছিল একদিকে তরুণ যুক্তিদেহীরা তাকে সর্বোপরী শুক্ষা করতো কারণ তিনি কখনোই ‘আপোষকারী’ ছিলেন না এবং ছিলেন অসম সাহসী, অন্যদিকে সমাজের উচ্চতরের বাসিন্দারা মুজিবকে তাদের ‘শেষ ডরসা’ মনে করতেন কারণ তিনি ‘মধ্যমপক্ষী’ ছিলেন আর একটি সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে খৎসাদুক পরিবর্তন প্রত্যাশী গোষ্ঠীগুলোর চাপও মোকাবেলা করতেন।’

যুক্তিদেহী তরুণরা কিছু কিছু আওয়ারী লীগ নেতা ইয়াহিয়া খানের সাথে সমরোতায় যাওয়ার জন্য যে ব্যাপক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তা ভুলতে পারেন নি এবং উচ্চত পরিষ্কৃতিতে তারা কি করতে পারেন তা ভেবে পাছিলেন না। কিন্তু তারা মুজিবের উপর আস্তা বেখেছিলেন কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন কেবল মুজিবের নেতৃত্বেই একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব। এবং মুজিবেরও এসব তরুণদের সহযোগের প্রয়োজন ছিল। আওয়ারী লীগের অনেক নেতা বিরোধিতা করার প্রও মুজিব পূর্ব পানিস্তানের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১ দফা দাবি গ্রহণ করেছিলেন।

এসব দাবির মধ্যে পঞ্চম দফাটি ছিল: ‘সকল ব্যাংক, বীমা কোম্পানী এবং অন্যান্য বৃহৎ শিল্প কারখানা জাতীয়করণ।’ ব্যাংক এবং বীমা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ারী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

যুক্তপক্ষী তরুণরা মার্চ ১৯৭১ এ নিশ্চিত হয়েছিলেন যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন সংস্কারনা নেই। এটি তরুণরাই যখন পাক নাহিনী বাংলার উপর ঝাপড়ে পড়ে তখন মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

কামাল হোসেন মনে করেন বাংলার উপর বর্তৰ পাকসেনাদের আক্রমণের ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন ‘দেশ স্বাধীন করার সংগ্রাম’ জৰুরীভূত হয়েছিল, তিনি বলেন, ‘তরুণ যুক্তপক্ষীরাই পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনীর প্রাণ ভোমরা হন। মুজিব কারাগারে থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানকারী মুজিবের সহযোগীদের সে সময় এসব তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে হয়েছিল। বাংলাদেশকে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী’ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রকেও সংগ্রামের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করতে হয়েছিল। সংগ্রামের এই পর্যায়ে বিপ্রবী অংশটি শক্তি অর্জন করেছিল, এবং এর চেয়েও উরুত্পূর্ণ বিষয় হলো, হাজারো যুক্তপক্ষী তরুণ এ সময় অন্ত চালনার প্রশিক্ষণ পেয়েছিল এবং পরে তাদের এ প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়েছিল। সেই নয় মাসে সংয়াদেশ যুক্তক্ষেত্রে পরিষ্কত হয়েছিল, প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছিল এবং সামরিক সরকারকে মানুষ বিদেশী দখলদার হিসেবে সন্তুষ্ট করেছিল; এর ফলে মনে হচ্ছিল পুরোনো সমাজ ভেঙ্গে

পড়বে এবং সেই খৎসন্তুপ থেকেই নতুন সামাজিক শক্তি একটি 'শোষণমুক্ত সমাজ' প্রতিষ্ঠা করবে—এটিই সে সময় হাজারো তরুণ মুক্তিযোদ্ধার প্রাণের দাবি ছিল।'

সহযোগীদের পরিবর্তে মুজিব নিজে এ যুক্ত সরাসরি নেতৃত্ব দিলেও ঘটনাগুলো এর চেয়ে বুর বেশি আলাদা হতোন। মুজিবও তরুণ যোুক্তদের নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সাম দিতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ অতি বিপ্লবী হলেও, অধিকাংশ ছিলেন আদর্শবাদী যারা বিশ্বাস করতেন স্বাধীন বাংলাদেশে সবকিছু অন্য রকম হবে।

১৯৬৮-৬৯ সালে যে জাগরণের কারণে শেষ পর্যন্ত আইনুব সরকার আগরতলা খড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে বাধা হয়েছিল, তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ছিল না এবং মুজিবের মুক্তির মাধ্যমেই এ আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। এর পেছনে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও সেগুলো নেতৃত্বের অভাবে সফল হয়নি।

নেতাদের তুলনায় জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল আরও অনেক বেশি এবং জনতা শুধু রাজনৈতিক স্বায়ত্ত্বাসন বা এমন কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েও সন্তুষ্ট হতে প্রস্তুত ছিল না। যদি না এর ফলে অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং সামাজিক অর্থনীতা থেকে মুক্ত না মেলে। মুজিব বিপ্লবী ছিলেন না, কিন্তু জনগণের ক্ষেত্রে বুরুে ফেলার জন্য যতোটা প্রয়োজন তিনি জনগণের তত্ত্বাবৃক্ষেই কাছের মানুষ ছিলেন। এ কারণেই পরবর্তীতে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে যে কোন সংঘাতের সময় তাকে জেষ্ট আওয়ামী লীগ নেতাদের উপর নয় বরং তরুণ, শ্রমিক ও কৃষকের উপর নির্ভর করতে হবে, তারা তার দলেরই হোক বা অন্য দলের।

একটি কেন্দ্রমুখী দল হলেও তরুণ থেকেই আওয়ামী লীগের জন্য কিছু প্রগতিশীল উদ্যোগ নেয়া সুবিধাজনক ছিল। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের প্রত্নাবিত ১২ দফার মধ্যে কেবল কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যস্থতাঙ্গী ব্যবস্থা বাতিল করণই ছিল না পাশাপাশি সকল ভূমির রাষ্ট্রায়নকরণও ছিল। ভূমি রাষ্ট্রায়নকরণের ফলে অনেক আওয়ামী লীগ নেতারও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তারা এটি নিয়ে বুর ভাবিত হন নি, কারণ এটি ছিল এমন এক প্রতিশ্রুতি যা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করার দাবি তাদের কাছে কেউ জানায়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে যদি আওয়ামী লীগ ভূমি রাষ্ট্রায়নকরণ অন্তর্ভুক্ত করতো তাহলে দলটি এর অনেক প্রবল সমর্থককে হারাতো।

দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রে নীতির অংশ করাটা কোন বিচ্যুতি ছিল না, বরং এটি ছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ। এক্ষেত্রে এখানে স্বরূপ করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে সেই ১৯৫০ এর ফেন্স্যুরাতে অনুষ্ঠিত মহা জাতীয়

সম্মেলনে দেশের সংবিধানের প্রধান নীতি প্রস্তাবনাতেও বলা হয়েছিল: “পাকিস্তানের যুক্তির উভয় গুলো হবে সার্বভৌম সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র”

জনগণের আশা পূরণের জন্য বাংলাদেশকে একটি সত্ত্বিকারের গণপ্রজাতন্ত্র হতে হতো। দুর্ভাগ্যজনক হলো, অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা এর অধৃত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রথম দিকে তো তারা ‘সমাজতন্ত্র’ শব্দটি ব্যবহার করতেই ধিধায় চুক্তিনৈতিক যখন তারা সমাজতন্ত্রের কথা নলতে পুরু করলেন এবং ‘জনগণের স্বাধীনতার সুফল তোগের’ কথা বলতে লাগলেন তাও তারা বলতেন না বুঝেই।

রবার্ট পেইন মুজিব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘তিনি ছিলেন একজন বইকেন্দ্রিক মানুষ।’ তিনি এ কথা বলেছিলেন প্রশংসনো সূচকভাবে, কিন্তু এ থেকে কেউ তুল বুঝতে পারে। মুজিব বই পড়তে পছন্দ করতেন, তার একটি সমৃদ্ধ প্রচাপ্যার ছিল এবং যখনই সময় পেতেন তিনি পরিবারের সদস্যদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অথবা বাঁটান্ড রাসেলের লেখা পড়ে শোনাতেন। (তিনি তার কনিষ্ঠতম পুত্রের নাম রেখেছিলেন দার্শনিক বাঁটান্ড রাসেলের নামানুসারে।)

কিন্তু তাই বলে কেউ যদি ভেবে বসে যে মুজিব ‘ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার পরিবর্তে কেবল বইয়ের জ্ঞানের উপর নির্ভর করতেন’ তাহলে সেটা তুল হবে।

মুজিব ইতিহাসের সেরা জাতীয় নেতাদের অন্যতম ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক তত্ত্বগুলোর উপর তার পূর্ণ দখল ছিল না। বুর অল্প জননেতাই রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ছিলেন।

যখন কেউ কেউ মুজিববাদ প্রচার করতে চাইছিলেন, তখন প্রথমে মুজিব তাদের কে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, ‘আমার মৃত্যুর পর তোমরা এ মতবাদ প্রচার করতে পারো।’ কিন্তু মুজিববাদের প্রবক্তারা তারপরও এগিয়ে গিয়েছিলেন।

মুজিবের রাজনৈতিক সহযোগীদের একজন মুজিব সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘তিনি সমাজবাদ আর পুরুষবাদের একটি বিশেষ সংশ্লেষণ, যা থেকে সারা বিশ্বই কিছু শিখতে পারে।’

তিনি জানতেন না আসলে তিনি কি বলেছিলেন।

১৯৭৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতি সমিতির সম্মেলনে যোগ দিতে আসা প্রতিনিধি দলের সদস্যরা যখন মুজিবের কাছে জানতে চান বাংলাদেশী সমাজতন্ত্র বলতে কি বোঝায়, মুজিবের উত্তরটি ছিল বেশ সহজ সরল, ‘বাংলাদেশে আমরা যে ধরণের সমাজতন্ত্র অনুশীলন করবো সেটিই হবে আমাদের ভাষায় সমাজতন্ত্র।’ সম্মেলনের পুরতে ই. এ. জি. রবিনসন যে সূচনা বক্তব্য রাখেন সেখানে মুজিবের এ উত্তর সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি এটি কঠিন প্রশ্নের চতুর উত্তর মাত্র নয়, বরং এটি বাংলাদেশ সরকার সমস্যা

মোকাবেলা করতে যে বাস্তব ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক কৌশল নিয়েছে তার একটি যথৰ্থ প্রতিফলন।'

মুজিব শুরুতে একজন সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি মার্ক্সবাদীও ছিলেন না, কিন্তু বাংলাদেশের উপর তার হিল ঝুলত আছা এবং বাংলাদেশে যে কোন পরিবর্তনই তার হাত ধরে আসতে হতো। কারণারে থাকা অবস্থায় একজন সাংবাদিকের সাথে তার সমাজতন্ত্র নিয়ে একটি তর্ক হয়েছিল। সে সময় কম্যুনিজম নিয়ে সামান্য আগ্রহই ছিল। সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি সমাজতন্ত্রের অর্থ বোঝেন?' মুজিবের জবাব ছিল, 'এ দেশে যদি কেউ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সেটি হবে শেখ মুজিবুর রহমান, আপনাদের কম্যুনিস্ট পার্টি নয়।'

রহমান সোবাহানের মতে প্রথম দিকে মুজিব তার সরকারের দার্শনিক ভিত্তিত ধরতে পারেন নি। সম্ভবত সে সময় মুজিব তা পারেন নি। তার বোন্মাপড়াগুলো দার্শনিকের চেয়ে বেশি ছিল ব্যবহারিক। সে সময়টিতে তিনি সব কিছু দীরে দীরে বুঝে নিছিলেন। কিন্তু তিনি দায়িত্ববান ছিলেন এবং জনগণকে ভালোবাসতেন। সমাজতন্ত্রের একটি মানবিক চেহারা তার মনের মধ্যে ছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ দস্তর বাড়িতে পঞ্চাশের দশকে একটি বৈঠকের বিরতিতে মুজিব ধূমপান করার জন্য বাইরে এসেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ দস্তর পুত্র সঞ্জীব তপন বাগানে ছিলেন, মুজিব তাকে জিজেস করেছিলেন, 'তুমি কি করচো?' উত্তরে সঞ্জীব বলেছিলেন, 'ফুলটির পাঁচটি পাপড়ি আছে' এবং এরপর সঞ্জীব উপকণায় ফুল আর সংস্থায় শুরু নিয়ে কথা বলেছিলেন। মুজিব অবিদর্শ হয়ে বলেছিলেন, 'দেশের মানুষ না খেয়ে আছে আর তুমি ফুলের পাপড়ি গণনা করছ। আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি দেশের সব ফুলের বাগানকে ধান ক্ষেত্রে পরিণত করতাম।'

ফুলের ব্যাপারে মুজিব অনগ্রহী ছিলেন এমন নয়, কিন্তু দুর্ঘোগের সময়গুলোতে মুজিব একনিষ্ঠভাবে সোনাকেই মনযোগ দিতেন এবং কোন বিষয়গুলো অগ্রগতি বিবেচনা করবেন তা তিনি নিজেই ঠিক করতেন। মুজিব বৃঞ্চিতেই পারজিলেন না যখন দেশের খাদ্য পরিস্থিতি এত ভয়াবহ তখন কেউ কিভাবে ফুলের দিকে মন দিতে পারে।

মুজিব হসেন শহীদ সোহরাওয়াদী এবং ফজলুল হকের ভক্ত ছিলেন। সোহরাওয়াদী ছিলেন মুজিবের রাজনৈতিক গুরু এবং মুজিব প্রায়ই সোহরাওয়াদীর প্রতি সম্মান দেখাতেন। কিন্তু এ দুজন মানুষের মধ্যে কোন মিল ছিল না। অক্সফোর্ডে পড়ালেখা করা সোহরাওয়াদী ছিলেন শহুরে এবং সম্বাদ, এবং এমনকি যখন ১৯৫৪ সালে যুক্তফুটের হয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তখানা সোহরাওয়াদী সাধারণ মানুষের বিষয়ে তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারতেন না। তিনি বিলাসী জীবন যাপন পছন্দ করতেন এবং করাচী যখন পাকিস্তানের রাজধানী

ছিল যখন তিনি প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় থাকার চেয়ে করাটীতে থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন।

মুজিব নিজ দেশের মানুষকে ভালোবাসতেন এবং বাংলাদেশে থাকতেই সবচেয়ে খালিদবোধ করতেন। সোহরাওয়ার্দীর চেয়ে ফজলুল হকের সাথেই বরং মুজিবের বেশি যিন খুঁজে পাওয়া যায়। মুজিব এবং ফজলুল হক দুজনই উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী এবং দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। ফজলুল হক একজন ভাষাবিদ ছিলেন এবং সবচেয়ে সম্ভাস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেও ঔজ্জ্বল্য ছড়াতে পারতেন। তিনি কোলকাতায় বসবাস করলেও মনের মধ্যে একজন বরিশালের সন্তানই থেকে গিয়েছিলেন।

মুজিব একজন বাঙালী ছিলেন এবং বাংলাদেশই তার জয়গা ছিল। তাকে ইসলামাবাদে বসে থাকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কল্পনা করাটাও কঠিন ছিল।

মুজিবের শক্তির দিক কি ছিল? মুজিবের জবাব ছিল, 'আমার জনতা আমাকে ভালোবাসে।' তার দুর্বল দিক কি ছিল? মুজিবের জবাব ছিল, 'আমি আমার জনতাকে অতিরিক্ত ভালোবাসি।' কামাল হোসেন বলেন, 'মুজিবের নিজেকে একজন 'মহান উভেচ্ছা দৃত' এবং 'জাতির পিতা' যিনি সবার ভালোবাসা চাইতেন এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখতেন, আর সম্ভবত এ কারণেই তিনি বৃহত্তর খার্ষে অঞ্চল কয়েকজনকে পরিভ্যাগের বেদনা নেয়ার মতো সিদ্ধান্তগুলো মূলতবি করে রাখতেন।'

যে মানুষ সবার ভালোবাসা চান তিনি খুবই নাজুক হয়ে থাকেন।

নিজ দেশের মানুষকে ভালোবাসাটাই হয়তো 'শুরুতে সব ছিল।' কিন্তু যখন তার শক্ত হওয়া দরকার ছিল তিনি অন্মেই নরম হিছিলেন। অনেক জেন্টে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে বিকল্পে তিনি কোন ব্যবস্থা নিতেন না, তিনি বলতেন 'তারা অনেক কষ্ট সহ্য করেছে।' মুজিব সময় জাতিকে পুনর্বার একিভূত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এ লক্ষ্যে মুজিব যে দয়া দেবিয়েছিলেন আধীনতা বিরোধী চক্র সৈটিকে তার দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে দেখিয়েছিল। মুজিব বুঝতে পারেন নি তারা পাকিস্তান ভাসার জন্য কোন দিনই তাকে ক্ষমা করবে না।

১৯৭৩ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয়ের পর গার্ডিয়ান পত্রিকার পিটার প্রেস্টন বলেছিলেন, 'তিনি (মুজিব) কি জনগণের ভালোবাসার জন্য এতেটাই কাঙ্গল যে বাংলাদেশ সরকার সম্ভা জনপ্রিয়তার দিকে ছুটবে, না কি আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার যে নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে তার ফলে অন্তত প্রধান প্রধান সংকট সমাধানের আগে পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রনায়কসূলভ আচরণ করবেন, এতে তার জনপ্রিয়তা একটু কমলেও?'

একটি বিশেষ সম্পর্ক

একজন আতীয় বা বহু একজন অপরিচিতের ভুলনায় বেশি আঘাত করতে পারেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক হিল বেশ নাঞ্জুক অবস্থায়। উভয় পক্ষই যতোটুকু তারা স্বীকার করছে তার চেয়ে বহুগণ বেশ প্রত্যাশা করছিল বলে পুরো বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। দুটি বহুভাবাপন্ন দেশের মধ্যেও অন্ত অনেক কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, যদি না একটি দেশ আরেকটি দেশের পদাবলত হয়ে থাকতে চায়। ভারত এবং বাংলাদেশ এটি স্বীকার করতে চাইছিল না, কিন্তু মাঝে মাঝেই দুই পক্ষই কুকুর হচ্ছিল। ফল স্বরূপ সামান্য মত পার্থক্যগুলো, যেগুলো প্রকাশ আলোচনার মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা সম্ভব হতো সেগুলোই এক সময় বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিগত হচ্ছিল।

ইন্দিরা গান্ধী টাইমস পত্রিকাকে দেয়া সাফার্কারে বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ তাদের নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নরকের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, কেন তারা সেটি বিসর্জন দিবে?’

অন্য বাঙালির থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্য বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের বাঙালী হিসেবে পরিচয় দিতেন।

এরপরও বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের স্বকীয় পরিচয় বজায় রাখার যে চেষ্টা করতেন, পঞ্চমবঙ্গের অনেকে সেটি পছন্দ করতেন না। তারা একক বাঙালী সংস্কৃতির উপর জোর দিতেন। যখন কোলকাতার একজন লেখক ঢাকায় জনসভায় তার বক্তব্যের শুরুতে বলেন, ‘এ পার বাংলা, ও পার বাংলা’ তখন সম্বৰ্তে জনতা ‘না! না!’ করে প্রতিবাদ জানান।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালীর সংবেদনশীলতার ধার বাড়িয়ে দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর তারা অল্পতেই আহত হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে এখন কি ভারতীয়দের সহায়তা করার উদ্যোগকেও ভারতীয়দের আধিপত্যবাদিতার নমুনা মনে করতো। তবে কিছু কিছু ভারতীয়ও খুব বেশি ঔদ্যোগিক আধৈর্য আচরণ করছিলেন। একজন ভারতীয় সাংবাদিক বাংলা বাংলাদেশের মুসলমানদের ভাষা নয় এসন্টি বলার নির্বৃক্ষিতাও দেখিয়েছিলেন। বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে তিনি বাজে কৌতুক করে বলেছিলেন, ‘তাদের কৃষি ছাড়া অন্য কোন সংস্কৃতি নেই।’ অল্প কয়েকজনই এতটা নির্বৃক্ষিতা দেখিয়েছিলেন, তবে অনেকেই বাংলাদেশের মানুষ যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তারপর তারা কোন অবস্থাতেই নিদেশীদের তাদের কথা বলার ধরণ ঠিক করতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এর অন্য একটি দিকও আছে।

বাংলাদেশ সফরৰত যে কোন ভাৱতীয় সামান্য সমস্যাতেও বিৰক্তি দেখাতেন, অন্য দেশৰ ক্ষেত্ৰে হলে হয়তো এ ধৰণেৰ সমস্যা তিনি আমলেই নিতেন না। একইভাৱে একজন বাঙালীও ভাৱতে এসে তাৰা প্ৰত্যাশা অনুসাৰে আতিথেয়তা না পেলে অসুখী হাইলেন। ১৯৭১ বা ১৯৭২ সালে ভাৱত সফৰ কৰে থাকলে তিনি সে সময়েৰ সাথে তুলনা কৰা আৱশ্য কৰে দিতেন। দুই দেশৰ মধ্যকাৰ বিশেষ সম্পর্কই এসব প্ৰত্যাশাৰ জনু দিত।

একজন বাঙালী সব সময় ভাৱতে নিজেকে বিদেশী মনে কৰতেন না। এই খেকচকে বাংলাদেশৰ একজন কৃটনীতিক বলেছিলেন, ‘দিল্লী থেকে বেিয়ে গিয়ে ভাৱতেৰ অন্য কোথাও গেলেই আমি যে একজন কৃটনীতিক তা ভুলে যাই। অন্য কোন দেশে এমনটি হয় না।’

দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সামান্য বিৰক্তিগুলোৱ কথা যেভাবে শোনা যায়, দুই দেশৰ জনগণেৰ মধ্যে যে ব্যাপক সৌহার্দ্য তা নিয়ে তেমন কথা বলা হয় না।

কেৱলাল একজন নাৰ্স ভাৱতীয় হওয়াৰ কাৰপে বাংলাদেশৰ গ্ৰামবাসীৰ কাছে যে বিশেষ সম্মান পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে ঢাকায় সাংবাদিকদেৱ বলেন, ‘নারীৱা আমাৰ কাছে ভাৱত সম্পৰ্কে জানতে চাইতেন। আমি ইন্দিৱা গাঁৰীৰ দেশ থেকে এসেছি এটিই তাদেৱ কাছে শুকৃতৃপূৰ্ণ ছিল। তাদেৱ সৱলতাৰ কাৰণে তাৰা আমাকে জিঞ্জাসা কৰছিলেন আমি ইন্দিৱা গাঁৰীৰ সাথে কথনো দেখা কৰেছি কি না।’

একজন সাংবাদিক ঐ নাৰ্সকে প্ৰশ্ন কৰেছিলেন, ‘আপনি কি তয় পান না?’ না বাংলাদেশে যে কয়েক মাস তিনি ছিলেন তাকে কোন সমস্যাৰ মুখোযুৰি হতে হয়নি।

যে এলাকায় তিনি কাজ কৰেছিলেন সেখানে কেউ তাকে অপছন্দ কৰতে পাৰে এৱকম ধাৰণাৰ কথা তনে তিনি হেসেছিলেন। বাংলায় তিনি তখন শাছন্দে কথা বলতে পাৱলেশ যখন তিনি কাজ শুৱ কৰেছিলেন তখন তিনি এ ভাৰাটি সম্পৰ্কে সামান্যই জানতেন। কিন্তু এমন কি এটিও বাংলাদেশে কাজ কৰাৰ পথে কোন প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰেনি। ঐ নাৰ্সৰ অভিজ্ঞতা অল্প কয়েকদিনেৰ জন্য ঢাকায় সফৰ কৰে যাওয়া সাংবাদিকদেৱ তুলনায়, যারা আবাৰ অধিকাংশ সময়ই অন্য সাংবাদিকদেৱ সাথেই বেশি সময় কাটাতেন, বেশি সঠিক ছিল। কিন্তু খুব অল্প সাংবাদিকই ঐ নাৰ্সৰ অভিজ্ঞতা এমন কি উল্লেখ কৰাৱও প্ৰয়োজন মনে কৰেন নি।

অনেক ভাৱতীয়ই মনে কৰেন দ্রুত বাংলাদেশ থেকে সেনা বাহিনী সিৱিয়ে নেয়াৰ সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাৱত ভুল কৰেছিল। এ বিষয়ে মেজৱ কে, ব্ৰহ্মা সিং বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে দ্রুত সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰায় ভাৱতেৰ একটি বৈঠিক বিজয় হলেও, এটিকে এক ধৰণেৰ কৃটনীতিক পৱাজয় বলা যেতে পাৰে।’ তাৰ মতে

‘যারা বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতার সময়ে ভারতীয় সেনা বাহিনীর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে চায় ভারতের এমন সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষেই কাজ করেছে’।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে ভারতের সংসদে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করার সময়েই ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন ‘প্রয়োজনের চেয়ে বেশি’ সময় ভারতীয় সেনা বাহিনী বাংলাদেশ থাকবে না। বাংলাদেশে আটকে থাকা সকল যুদ্ধবন্দীকে ভারতে সরিয়ে না দেয়া এবং ভারতে থাকা ১০ মিলিয়ন বাঙালী শরণার্থী দেশে ফেরত না আসা পর্যন্ত ভারতীয় সেনাদের ফিরে যাবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু এ দুটি কাজ সম্পাদন হয়ে যাবার পরও ভারতীয় সেনা বাহিনী বাংলাদেশে থেকে গেলে সেটি যারাত্মক সমস্যা তৈরি করতো।

সে সময় বাংলাদেশের এবং ভারতের নেতাদের প্রায়ই যে প্রশ্নের মুখোযুধি হতে হতো তা হল কবে নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হবে। ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (এনবিসি) কে সাক্ষাত্কার দেয়ার সময় ইন্দিরা গান্ধী এর জবাবে বলেছিলেন, ‘আমি আশা করবো যুব শিশুই এটি ঘটবে।’ এনবিসি তখন তাকে প্রশ্ন করেছিল, ‘ভারতীয় বাহিনীর অনিদিট কালের জন্য বাংলাদেশে অবস্থান করার কোন সম্ভাবনা আছে কি?’ ইন্দিরা জবাবে বলেছিলেন, ‘ওহ! নিশ্চয়ই না।’ পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, ‘বাংলাদেশের সরকার যদি অস্থিতিশীল প্রমাণিত হয় তখন কি ভারতীয় সেনাবাহিনী সেদেশে থেকে যাবে?’ ইন্দিরা কথনোই ভাবেননি বাংলাদেশ সরকার অস্থিতিশীল হবে। তিনি বলেছিলেন, ‘তারা সবাই ব্যাপক একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং তাদের সামনে রয়েছে বিশাল দায়িত্ব।’

ভারতীয় সেনা বাহিনী কোন না কোন অঙ্গুহাতে বাংলাদেশে থেকে যাবে বলে যারা গোপনে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ইন্দিরা তার দেশের সেনাবাহিনী দ্রুত বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের মিথ্যা প্রমাণ করেছিলেন।

ত্রিশা সিং বলেছিলেন, ‘এমন কি বাংলাদেশও বাহিরিশের কাছে দেশটি যে কোন বিদেশী প্রভাবমুক্ত ছিল প্রমাণ করে অন্যান্য রাষ্ট্র সমূহের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জালানোর সময় বুঝতে পারেনি যে তারা আসলে স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রকেই সাহায্য করছিল এবং তাদের কাজ সহজ করে দিচ্ছিল।’

সংগত কারণেই বাংলাদেশ যত দ্রুত যত বেশি সংখ্যক রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যায় সে চেষ্টা করছিল, এবং অনেক রাষ্ট্রই স্বীকৃতি দেয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে এদেশ থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলছিল। এরচেমেও উরুচূপূর্ণ হলো বাংলাদেশে ভারতীয় সেনার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান দেশের সার্বভৌমত্বের ক্ষতি সাধন করছিল।

বাঙালীর অনেকেই মনে করেন যে, মুজিব ফিরে না আসলে ভারতীয় বাহিনী হ্যাতো বাংলাদেশে থেকে যেতো। তারা ভুল করেন। ভারত তার সেনা সরিয়ে নিতে উদ্যোব ছিল এবং ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর মধ্যে অর্ধাং মুজিব দেশে ফেরার ১০ দিন আগে ভারতীয় সৈনিকদের প্রায় অর্ধেককেই সরিয়ে নিয়েছিল, তবে মুজিব সরকার দায়িত্ব বৃক্ষে না নিলে হ্যাতো ভারতের পক্ষে দেশ স্বাধীন হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সকল সেনা প্রত্যাহার করা সম্ভব হতো না।

মুক্তি বাহিনীর কিছু অংশ ঘোষণা করেছিল মুজিব ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা অন্ত সমর্পণ করবে না, এবং তাদের বিপরীতে তখনকার সরকারও ক্ষমতাহীন ছিল। কেবল মুজিবেরই তাদেরকে অন্ত সমর্পণ করানোর মতো ক্যারিশমা ছিল। হ্যাতো এমনকি অর্ধেক অন্ত ও সমর্পিত হয়নি, কিন্তু মুক্তিবাহিনীর সকল অংশই মুজিবের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল।

এস. এম. আলি তার 'আফটার দ্যা ডার্ক নাইট' নামক গ্রন্থে বলেছিলেন যে, মুজিব ফিরে না এসে ভারত হ্যাতো বাংলাদেশ সরকারকে এসব যোকাদের নিরঞ্জন করতে সহায়তা করতো। তখন চারিদিকে অনেক অন্ত ছিল। মুক্তিযোক্তাদের নিরঙ্গীকরণের যে কোন উদ্যোগের ফলে ব্যাপক সংঘর্ষ দেখা দিত এবং এর ফলে একটি বিপর্যয় ঘটতো। ভারত এই বিপদ সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতো।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ ও ভারতের বাহিনী প্রায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল, তবে কর্মকর্তা পর্যায়ের কেউ এসবে জড়িত ছিলেন না। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে না জড়ানোর জন্য ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাদের সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার আগেই দেশে ফিরতে পেরে ভারতীয় সেনারা সন্তুষ্ট ছিল।

মুজিব হত্যার প্রায় বছর খানেক পরে ১৯৭৬ সালের ২ আগস্ট এছনি য্যাসকার্নহাস লভনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন (আইটিভি) এ স্বাধীনত বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরিকল্পনাকারী লেফটেনেন্ট কর্নেল ফার্মক এবং মেজর রশিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেখানে য্যাসকার্নহাস তার মন্তব্যে বলেছিলেন মুজিব 'যা কিছু সামরিক' এমন সরকারই অপছন্দ করতেন, এ কারণে তিনি নিজের সেনাবাহিনীকেও বিখ্যাস করতেন না, আর নিজের দেশের নিরাপত্তার জন্য 'ভারতের ঘারফুল' হয়েছিলেন।

মুজিব যদি সেনাবাহিনীর লোকদের বিখ্যাস না করে থাকেন, তবে তা ছিল খুবই স্বাভাবিক। তিনি পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর উধান হতে দেখেছিলেন এবং পাকিস্তানি সামরিক জাত্তার হাতে নির্ধারিত হয়েছিলেন। কিন্তু 'তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তার নিজের দেশের সেনাবাহিনীকে উপেক্ষা করতেন' এবং নিজ দেশের নিরাপত্তার জন্য ভারতের ঘারফুল হতেন এমন বললে তা হবে নির্জলা মিথ্যাচার। তার দিক থেকে ঝটি ছিল তিনি অনেক সময়ই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না।

দেশ শারীন হওয়ার পর তাজউদ্দীন বলেছিলেন যে মুক্তি বাহিনীকে ধিরে একটি জনগণের আধাসামাজিক বাহিনী গড়ে তোলা হবে। জনগণ তখন একটি বিশাল সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল না; তারা ভেবেছিল, নিজেরাই সশস্ত্র সংহারের মাধ্যমে শারীন হওয়া দেশটির নিরাপত্তা বিধান করতে পারবেন।

মুজিব মনে করতেন একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রতিপালন করতে শিয়ে দেশের সীমিত সম্পদের অপচয় করা হবে। সাংঘর্ষিক নীতি গ্রহণের ফলেই পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এ কারণেই মুজিব চাইছিলেন বঙ্গভাবাপন্ন নীতি গ্রহণ করতে এবং সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ এ সংবাদ সংযোগে মুজিব যখন বাংলাদেশকে প্রাচোর সুইজারল্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন তখন তিনি এটিই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

এরপরও তরুণতে তিনি এমন যে কোন পদক্ষেপ নিতে অনয়াই ছিলেন যা তাকে কোন গোষ্ঠী থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে।

যথাযথ আনুগত্য প্রদর্শন না করার অভিযোগে মেজব জলিলকে দেশ শারীন হওয়ার অল্প পরেই কারাবন্দী করা হয়। জলিল দাবি করেছিলেন তিনি ভারতীয় বাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে যন্ত্রাদি পাচারে বাধা দেয়ায় তার বিরুদ্ধে যিথ্যাত্ত্ব অভিযোগ করা হয়েছে।

মুজিব তাকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার এ সিদ্ধান্ত হয়তো সঠিক ছিল না, কিন্তু এটি নিচয়ই 'নিজ দেশের নিরাপত্তার জন্য ভারতের দ্বারা হন' এমন কোন ব্যক্তির মতো সিদ্ধান্ত হয়নি।

মুজিব সেনা বাহিনীর কর্মকর্তাদের দ্রুত পদোন্নতি দিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তান থেকে শিরিয়ে নিয়ে আসা বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের নতুন করে বোঝানোর কোন প্রয়োজন মনে করেননি। তবে তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এতটাই গুরুতর ছিল যে তাদেরকে সেনাবাহিনী থেকে অবাহতি দিতে হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রায় সবাইকেই মুজিব বাহিনীতে পুনর্নিয়োগ দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান থেকে পুনর্বাসিতদের সম্পর্কে মুজিব বলেছিলেন, 'তারা বাঙালী এবং তাদেরকে বাংলাদেশের সেবা করার সুযোগ দেয়া উচিত।'

যোসলেমউদ্দীন নামে যে সেনা সদস্য মুজিবকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন, তিনিও এসব পুনর্বাসিত সেনা সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন।

বাংলাদেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় লেখক এবং সাংবাদিক আব্দুল গাফরার চৌধুরী বলেন, 'মুজিবের প্রধান সংকট ছিল যে তিনি সেনা বাহিনী এবং আগলাম্বন উপর বিশ্বাস করতে না পারলেও তাদেরকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারছিলেন না।'

নব্য স্বাধীন ইওয়া সব দেশের নেতাদেরই এমন সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে।

মুজিব যখন এই সংকট থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছিলেন ঠিক সে সময়ই তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

আব্দুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রাপ্তি করার একদিন পর ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ বলেছিলেন যে, ভারতের সাথে কোন বিশেষ মিত্রতার চুক্তি করার প্রয়োজন নেই। ৩১ ডিসেম্বরে ইন্দিরা গান্ধী কে যখন বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন নিরাপত্তা চুক্তি হতে পারে কি না এ সংক্রান্ত প্রশ্ন সংবাদ সম্মেলনে করা হয়েছিল, তখন তিনি সামাদ আজাদের এই বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'যদি সেরকম কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন আমরা তা ভেবে দেখবো।'

ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে অবস্থান করা কালিন এমন কোন নিরাপত্তা চুক্তি করা হলে তা বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে মনে করা হতো। কিন্তু ১৯৭২ এ মুজিব দেশে ফেরার পর এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনী ফিরে যাবার পর, কিছু ভারতীয় কর্মকর্তা মনে করেছিলেন যে বাংলাদেশ ও ভারতের বক্রতৃপূর্ণ সম্পর্কটিকে একটি আনুষ্ঠানিক আকার দেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে এই মৈত্রী চুক্তির বিষয়কে প্রতিবাদ হয়েছিল, তা ছিল খুবই হালকা, অন্তর্ভুক্ত শর্তের দিকে। যদি তাজউদ্দীন এমন কোন চুক্তি স্বাক্ষর করতেন তাহলে মন্ত্রীসভার ভেতর থেকেই এর প্রতিবাদ করা হতো এবং তাকে একটি ব্যাপক ঝড়ের মোকাবেলা করতে হতো।

মুজিবের কড়া সমালোচকদের মধ্যে অনেকে ১৯৭২ সালের ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিকে ভারতের প্রতি মুজিবের আনুগত্যের নির্দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেন, কিন্তু মুজিব হত্যার পর ঐ চুক্তিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের হানি হয় এমন গোপন ধারা ছিল বলে যে অভিযোগ তারা আগে করেছিলেন তা প্রমাণে ব্যর্থ হন।

১৯৭২ এ ভারতের একজন শীর্ষ স্থানীয় সাংবাদিক এস. এম. আলিকে বলেন, 'আমরা এখন আর বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে দেন দরবার করছি না যাকে যখন যেমন খুশি কি করলে তার দেশের ভালো বা মন্দ হবে তা নিয়ে উপদেশ দেয়া সত্ত্ব। এখন আমাদের সেনদেন হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে, তিনি তখনই আমাদের উপদেশ উন্বেন যখন তিনি আমাদের কাছে উপদেশ চাইবেন।'

এটা ১৯৭২ এর কথা বলা হচ্ছে, তখনো মুজিব ধীরে ধীরে সব বুঝে উঠেছিলেন। যতোই তার আত্মবিশ্বাস বাঢ়ছিল ততোই তিনি স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন, এবং এঙ্গিল ১৯৭৩ এর নির্বাচন ঘোষিতে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১ টিতে আওয়ামী

লীগ জয়লাভ করেছিল, তার পরে তিনি বেশ কর্তৃতপরায়ণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে আকর্মণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৭২ এ ভারতের নিজের খাদ্য পরিস্থিতি কঠিন হওয়া সম্বেদ তারা এক মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল। এর চেয়েও দরকারি বিষয় হলো চট্টগ্রাম সমূদ্র বন্দর অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকা কালে এবং রেল লাইনগুলো তখনে সংক্ষারাধীন থাকা কালে কেবল ভারতের পক্ষেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে পৌছা সম্ভব ছিল। এমন দক্ষতার সাথে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবহারযোগ্য সকল জাহাজ এবং রেলের ওয়াগন ব্যবহার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসে এ দেশে সরবরাহ নিশ্চিত করেছিল; যেমন দক্ষতা তারা এর আগে কখনো দেখায়নি। রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্তের কাজেও ভারত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছে।

যে সব শোকের রাজনীতির উদ্দেশ্যই ছিল কেবল ভারতের সমালোচনা করা মুজিব প্রায়ই তাদের ত্বরিকার করতেন। তিনি বার বার বলতেন, 'ভারতের নিম্না করা যেন একটি ফ্যাশন হয়ে দাঢ়িয়েছে।' তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে ভারতের নিঃবৰ্ধ সহায়তা ছাড়া স্বাধীনতার পর পর কঠিন সময়ে বাংলাদেশে হাজারো মানুষ না খেয়ে মারা যেতে।

তবে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলেও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে অন্য কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ তিনি মেনে নিতেন না।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর তার প্রথম জনসভায় মুজিব বাংলাদেশকে যাবতীয় সাহায্য করার জন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, কিন্তু বাংলাদেশ তার নিজের বিষয় দেখভাল করার মতো পরিপক্তা অর্জন করেছে এবং এ বিষয়ে বহিরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনা করে না বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'ভারত যদি আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে শেখ মুজিবুর রহমান জানেন কিভাবে তাদের মোকাবেলা করতে হবে।'

মুজিব সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দ্বিতীয় যে দেশটি সফর করেন তা হলো এই সোভিয়েত ইউনিয়ন। একই সঙ্গে তিনি চীনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্যও প্রচও চেষ্টা করতেন, মাঝে মাঝে একটু হয়তো বেশি চেষ্টা করতেন।

বাংলাদেশ এটা ভূলে যায়নি যে ভারত এবং ভূটানের পর পূর্ব জার্মানীই প্রথম দেশ যারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পূর্ব জার্মানীর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হলে পর্যবেক্ষণ ইউরোপীয় দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করতে পারে—পর্যবেক্ষণ জার্মানীর পক্ষ থেকে এমন প্রচলন হ্যাকি থাকার পরও বাংলাদেশ পূর্ব জার্মানীর সাথে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

অন্যদিকে বাংলাদেশও সমাজতান্ত্রিক ঝুকের বাইরের প্রথম দেশ যারা ভিয়েতনামের অঙ্গীয় বিপ্লবী সরকারকে শীকৃতি দিয়েছিল এমন সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করেনি।

কিন্তু মুজিব একটি শারীর পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে ছিলেন এবং সোভিয়েত বা অন্য যে কোন ঝুকের সাথে একজোট হওয়ার আগ্রহ তার ছিল না।

বাংলাদেশ ইসরায়েলের পক্ষ থেকে আসা কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে একদম তরমতেই। বাংলাদেশের সমর্থন ছিল প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের প্রতি এবং বাংলাদেশ এ বিষয়ে আরব দেশগুলোর সাথে সংহতি জানিয়েছিল এবং ১৯৭৩ সালের পশ্চিম এশীয় যুক্তে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বেছা সেবক পাঠানোর প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছিল।

পাকিস্তান বাংলাদেশকে শীকৃতি না দিলে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে আয়োজিত ইসলামিক সম্মেলনে যাবেন না বলে মুজিব দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমন কি পাকিস্তান এ শর্ত মেনে নেয়ার পরও মুজিবের মন্ত্রীসভার দুই একজন সহ অনেকেই ভাবছিলেন ঐ সম্মেলনে মুজিবের যোগ দেয়াটা সঠিক হবে কি না। এর ফলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো উৎসাহিত হবে এবং ভারতের পক্ষ থেকেও কেউ কেউ ভুল বুঝতে পারে।

মুজিবের একজন ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি যেন ঐ সম্মেলন থেকে ফেরার পথে দিল্লীতে একটি যাত্রা বিরতি করেন। এই পরামর্শ প্রত্যাখান করে মুজিব রাগত স্বরে বলেন, ‘আমার কাউকে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না, আমার দেশের জন্য আমি যা ভালো মনে করি করতে পারি।’

সম্মেলনে সৌন্দী আরবের বাদশাহ ফয়সাল যখন বাংলাদেশের সংবিধান থেকে অসাম্প্রদায়িকতা বাদ দিয়ে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তখন মুজিব স্ফুর্দ্ধ হয়েছিলেন। তবুও পরবর্তীতে বাংলাদেশ সৌন্দী আরবের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

হয়তো চীন বা সৌন্দী আরবের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেশটি তার নিজের মতো করে একটি শারীর পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের চেষ্টা করছিল।

মনে হতে পারে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে কোন পক্ষই পাকিস্তানের সাথে অপর পক্ষের সুসম্পর্ক ভালোভাবে নিতে পারেনি। অন্যকিছুর চেয়ে এটি বরং মূলত আবেগের বিষয়। কিন্তু আবেগ সংজ্ঞান বিষয়গুলো যদি বাদ দিয়ে দেয়া হয় তাহলে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের অনেক কিছুই ব্যাখ্যাতীত থেকে যাবে।

ভারতের সঙ্গে সিমলা চুক্তি শাক্তরের আগে তুঁটো ইন্দিরা গান্ধীকে যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল পাকিস্তান শিশ্রেই বাংলাদেশকে শীকৃতি দিবে।

কিন্তু অনেক বাঙালীই ভেবেছিলেন পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক হ্যাপনের জন্য উদ্দীপ্তির থাকায় ইলিমা হয়তো পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল কি না দিল তা নিয়ে অতো ভাবিত ছিলেন না। ঢাকার সংবাদপত্রগুলো সিমলা চুক্তিকে স্বাগত জানালেও তারা মত প্রকাশ করে এই উপমহাদেশে কোন চুক্তিই দীর্ঘ মেয়াদে শান্তি বজায় রাখতে পারবে না যদি না বাংলাদেশও এর একটি পক্ষ হয়।

১৯৭৪ এর জুন মাসে যখন ভূট্টো ঢাকায় আসেন সিমলা চুক্তির দুই বছর পর, তখন ভারতে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে ঢাকার সঙ্গে আবার পাকিস্তানের ব্যাপক স্থায় তৈরি হবে এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুতর পরিবর্তন আসবে।

ঢাকায় ভূট্টোর সরকারী সফরের একদিন আগে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার সুবিমল দণ্ড ঢাকা ত্যাগ করেন।

সুবিমল দণ্ড'র মতো একজন প্রাঞ্চ কর্মকর্তা কি করে এটি প্রকাশ করে ফেলেন যে তিনি ভূট্টোর মুখ দেখতে চান না এটি ভেবে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু সুবিমল দণ্ড বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক হওয়ায় বাংলাদেশের প্রতি তার একটি আলাদা মমত্ববোধ ছিল।

যে দেশে তিনি কূটনীতিক হিসেবে কাজ করছিলেন সে দেশটির প্রতি এমন মমত্ববোধ থাকা সঠিক কি না এ প্রশ্নটি সামনে চলে এসেছিল। কি কি কি তু থাকলে একজন ব্যক্তি ভালো কূটনীতিক হতে পারেন যে বিষয়ে চাইলে অনেক কথাই বলা যায়।

কিন্তু এ বিষয়েও সন্দেহ রয়েছে যে এমন কি পশ্চিমবঙ্গ থেকেও যদি কোন একজন কূটনীতিককে বাংলাদেশে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হতো তাকে দেশটির মানুষ সুবিমল দণ্ডকে যতোটো ভালোবাসেছিল এবং মর্যাদা দিয়েছিল তার অর্ধেক ভালোবাসা বা মর্যাদা দিত কি না।

সুবিমল দণ্ড ছিলেন বাংলাদেশে সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত কূটনীতিক। তিনি চাইলে যে কোন সময়েই মুজিবের সাথে দেখা করতে পারতেন। মুজিব কূটনীতিক শিটারের তোয়াক্তা না করে সুবিমল দণ্ডকে 'দাদা' বলে সম্মোধন করতেন। কিন্তু সুবিমল দণ্ড জানতেন মুজিবের সাথে যখন তিনি লেনদেন করছেন তখন তিনি এমন একজন মানুষের সাথে কথা বলছেন যিনি গর্বিত এবং দৃঢ়চেতা।

সুবিমল দণ্ড সম্পর্কে দুজন ভারতীয় বিপ্লবীকে মুজিব বলেছিলেন, 'আপনারা কি জানেন সুবিমল বাবু কি চমৎকার কাজ করেছেন? আমাদের কাছে তিনি কোন বিদেশী কূটনীতিক নন। তিনি আমাদেরই বড় ভাই। আমরা তাকে দাদা বলে সম্মোধন করে থাকি। আজ যখন তিনি চলে যাচ্ছেন, আমাদের উচিত তাকে বাংলাদেশের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দেয়া।'

১৯৭৫ এ মুজিব প্রায়ই বলতেন, ‘বাংলাদেশকে অবশ্যই ভারতের সাথে মিলিত করতে পারতে হবে। তবে এন্ন হলো: কোন ভারত?’ ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তি আর সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর মধ্যে মুজিব স্পষ্ট বিভাজন করতেন। ভারতে সাম্প্রদায়িক শক্তি উৎসাহিত হয় এমন কিছু করা বাংলাদেশের উচিত হবে না, কারণ ভারতে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটলে তা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হবে।

ভারতের সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশে বাংলাদেশের সমালোচনা করে লেখা সম্পাদকীয় এবং প্রবক্ত মুজিবকে ক্ষিণ করেছিল। ১৯৭৫ এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এই লেখককে মুজিব বলেছিলেন, ‘ভারতে আপনার বহুদের জানিয়ে দিবেন আমরা বাঙালীরা সাম্প্রদায়িক নই।’

রাজনৈতিক মধ্যস্বত্ত্বগীরা

সকল বিপ্লবের ফলেই ব্যাপক শক্তির স্ফূরণ ঘটে, এবং অন্তত শুরুর কয়েকদিনের অন্য মিতব্যায়িতা অথবা এমন কি কৃচ্ছ সাধনের ওপর ঝোর দেয়। ত্রেইন ট্রিন্টন বলেছিলেন, ‘ইনডিপেনডেন্টোরা, জ্যাকোবিনরা, বলশেভিকরা এরা সবাই সব ধরণের কর্মকাণ্ডকে একটি আদর্শ আকারে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এবং এই আদর্শ আকারের উৎস ছিল গভীর, তাদের আবেগের মধ্যে। এদের সবার কৃচ্ছত্বের প্রতি অগ্রহাতি বেশ কৌতুহলোদ্বীপকভাবে এক ধরণের, অথবা কেউ বলতে পারেন এরা নবাই আমাদের ভাষায় সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরুদের এ বিষয়ক মতামতকে চেপে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।’

বিপ্লবের পরের ত্রান্তিকালে ত্যাগ শীকার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে এটা মনে রাখতে হবে তখন বিপ্লবী সমাজেই কৃচ্ছতার অনুশীলন হয় এমন নয়। যুক্ত পরবর্তী ইংল্যান্ডে জনগণ কৃচ্ছতাকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া বিষয় মনে করেন নি, বরং এটি তাদের জাতিকে টিকিয়ে রাখার সম্মিলিত উদ্যোগ ছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মধ্যে যে হতাশাজনক বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছিল তা হলো রাজনীতিসহ সমাজের সর্বত্রই দ্রুত অনেক কিছু অর্জনের চেষ্টা। এমনকি তরুণ ‘বিপ্লবী’দের মধ্যেও একটি সাধারণ একনিষ্ঠতার অভাব দেখা যাচ্ছিল।

যে সব ছাত্র নেতা মুজিব ফিরে না আসা পর্যন্ত অস্ত্র সমর্পণ না করার ঘোষণা দিয়ে ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম চার জন ছিলেন আ. স. ম. আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, নূর-ই-আলম সিদ্দিকী এবং আব্দুল কুদুস মাখন। এই চারজনকে কৌতুক করে ‘চার খলিফা’ বলা হত।

মনে হচ্ছিল এই চারজন একজোট হয়েই থাকবেন। কিন্তু রব স্বাধীনতার পর পরই সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে ‘সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল থেকে প্রতিনিধি নিয়ে’ মুজিবের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করার দাবি জানিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ‘বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের’ কথা বলতেন এবং পূর্ণ সমাজতন্ত্রের নিচয়তা দেয় এমন একটি সংবিধান চাইতেন।

দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল বলতে যে সব রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন শ্রমিকলীগ এই দাবির সাথে একাত্তা জানিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল: আ.স.ম. আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজ ছিলেন একদিকে এবং অন্যদিকে ছিলেন নূর-ই-আলম সিদ্দিকী ও আব্দুল কুদুস মাখন।

রব-সিরাজের নেতৃত্বাধীন অংশটি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব' 'সমর্থন করতো। সিদ্ধিকী-মাখনের নেতৃত্বাধীন অংশটি মুজিববাদের সমর্থক ছিল এবং সকল বিদেশী মতবাদের বিপক্ষে ছিল।

কিছু সময় মুজিব কোন পক্ষই নেন নি, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে এ দুটি অংশ এক সময় নিজেদের দ্বন্দ্ব নিজেরাই ঘিটিয়ে নিয়ে আবার একজোট হয়ে যাবে। কিন্তু এসব মতপার্থক্য, যার পেছনের কারণগুলো ছিল অনেকাংশেই ব্যক্তিগত এগুলো এতটাই স্টীভ ছিল যে এদেরকে আর ট্রেকাবক করা সম্ভব হয়নি। এটি মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন যখন তিনি মাখন এবং সিদ্ধিকীর নেতৃত্বাধীন চাতুর্লীগের জাতীয় কনডেনশনে যোগ দিতে এসেছিলেন।

একটি জনসভায় রব বলেছিলেন, 'মুজিব, আপনি অঙ্গের কথা বলেন। কিন্তু আপনি কি জানেন কিভাবে অস্ত্র চালাতে হয়? আমরা অস্ত্র চালানার প্রশিক্ষণ পেয়েছি।' রবের এ বক্তব্য বিষয়ে একজন বিদেশী সাংবাদিক মুজিবকে মন্তব্য করতে বললে মুজিব বলেছিলেন, 'রব? ওর কথা বাদ দিন। সে তো আমার ছেলের মতোই।'

কিন্তু মুজিবের এই পুত্রীর তার সমালোচনায় ক্রমেই প্রথর হয়ে উঠেছিলেন।

চাতুর্লীগের রব-সিরাজ অংশটি একটি নতুন রাজনৈতিক দলের কেন্দ্র হয়ে উঠে-জাতীয় সমাজতাত্ত্বিক দল (জাসদ), এর কার্যক্রম শুরু হয় ৩০ অক্টোবর ১৯৭২ এ। ১৯৭৩ এর ১৪ জানুয়ারি এ দলটির যে ইশতেহার প্রকাশিত হয় তাতে লেখা হয়, 'জাতীয় সমাজতাত্ত্বিক দলের জন্য হয়েছে আগামী দিনে একটি 'যথার্থ শ্রেণী সংগঠনের নেতৃত্বে যে সামাজিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবে সে সময় একটি 'সহায়ক শক্তি' হিসেবে ত্বক্ষয়ীল হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কর্মসূচি নিয়ে।' জাতীয় সমাজতাত্ত্বিক দল (জাসদ) নিজেদের একটি পেটি বুর্জোয়া দলের চেয়ে বেশি কিছু দাবি করেনি, যারা এখনো জন্য হয়নি এমন একটি 'যথার্থ শ্রেণী সংগঠনের' পূর্বসূরি। এরপরও ঐ ইশতেহারে বলা হয়েছিল, 'আমাদের মূল লক্ষ্য হলো কৃষক, শ্রমিক এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দেয়া, যারা একটি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক, প্রলেতারিয়েত, কর্মজীবী মধ্যবিত্ত, প্রগতিশীল বৃক্ষজীবীদের এবং তরুণদের নতুন নেতৃত্ব তৈরি করবে এবং একটি শ্রেণীহীন ও শোষণযুক্ত কৃষক-শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের মাধ্যমে, এটিই সমাজতত্ত্ব।'

কৃষক-শ্রমিকের শাসন বলতে শ্রেণীহীন সমাজ বোঝায় না। কোন মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী তা সে যতই প্রগতিশীল আর মহৎ উদ্দেশ্য সমৃদ্ধ হোক না কেন, কখনোই মধ্যবিত্তজীবী হিসেবে কাজ করে প্রলেতারিয়েতের হাতে 'ক্ষমতা তুলে দেয়ার' কাজ করতে পারে না।

ঐ ইশতেহারটি ছিল আশাহত করার যত জটিপূর্ণ।

এন.এম. হার্লগ বলেছিলেন, ‘জাসদের পেটি বুর্জোয়ারা এর ফলে অবাস্তব সমাজতন্ত্রের স্বপ্নের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে।’ এই অবাস্তব স্বপ্ন জাসদকে আজ্ঞাধার্তা পথে নিয়ে গিয়েছিল।

জাসদ ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদকে বিলুণ ঘোষণা করার প্রস্তাৱ কৰলেও এ দলটি ১৯৭৩ সালে নিজেদের আৱাও ব্যাপকভাৱে পরিচিত কৰার লক্ষ্যে সাধাৰণ নিৰ্বাচনে অংশ নেয়। যদিও দলটি জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মাঝে একটিতেই জয় পেয়েছিল, তাৰা মোট ভোটেৱ শতকৰা ৮ ভাগ পাওয়াৰ দাবি কৰেছিল। একটি নবগঠিত দলেৱ তুলনায় এইন সমৰ্থন পাওয়াটা অবশ্যই প্ৰশংসনীয় ছিল।

১৯৭৩ সালে জাসদকে ভবিষ্যতেৱ দল মনে হচ্ছিল। কিন্তু জাসদ মেতাৱা অধৈৰ্য্য ছিলেন এবং এক সময় নিজেদেৱ রাজনৈতিক শব্দোধীতাৰ বলি হয়েছিলেন। দলটি ১৯৭৩ সালেৱ নিৰ্বাচনেৱ পৰ যখন তাদেৱ প্ৰথম জাতীয় সংশ্লেশন অনুষ্ঠিত হয় তখন হঠাৎ কৰেই তাদেৱ বিপুলী দায়িত্বেৱ কথা স্মাৰণ কৰে।

ঐ সংশ্লেশনে যে রাজনৈতিক প্ৰতিবেদন পেশ কৰা হয় সেখানে হমকি দিয়ে বলা হয়েছিল, ‘এদেশে যদি আৱেকটি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তা হবে শ্ৰমজীবী মানুষেৱ নিৰ্বাচন। সেটি কোন শোষণ নিৰ্ভৰ মিথ্যা গণতন্ত্ৰেৱ নিৰ্বাচন হবে না।’ প্ৰতিবেদনটিতে একটি গণ বাহিনীৰ কথা বলা হয়েছিল।

৩০ ডিসেম্বৰ ১৯৭৩ এ পটেন যয়দানে জাসদেৱ যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে জাসদ সুভাষিত এম.এ. জলিল উক্ত কষ্টে বলেছিলেন, ‘বিপুলবই এখন সবচেয়ে জুৰীৰী।’ আ. স. ম. আন্দুৰ রব সৱকাৰকে সতৰ্ক কৰে দিয়ে বলেছিলেন, ‘জনতাকে অন্তৰ হাতে তুলে নিতে বাধ্য কৰবেন না।’ সারাদেশ ব্যাপী জাসদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং ১৯৭৪ এৱং জানুৱাৰিতে জনসভা কৰেছিল। এসব কৰ্মসূচিতে যে জন সমৰ্থন পাওয়া গিয়েছিল তাতে আৱাও সাহসী হয়ে ১৯৭৪ সালেৱ ১৭ মাৰ্চ জাসদ সৱাট্ৰি মন্ত্ৰী এম. মনসুৱ আলীৰ বাসভবন ‘ঘৰোও’ কৰেছিল এবং সেটিৰ উপৰ হামলা কৰার হমকি দিয়েছিল। তখন পুলিশ জাসদ কৰ্মীদেৱ উপৰ গুলি চালিয়েছিল এবং এৱ এৱ ফলে অন্তত আট জন নিহত হয়েছিলেন এবং আৱাও অনেকে আহত হয়েছিলেন। আহতদেৱ মধ্যে রবও ছিলেন।

এই কাগজানহীন কৰ্মসূচি দিয়ে জাসদ কি অৰ্জন কৰতে চেয়েছিল? তাৰা নিশ্চয়ই ভাবেননি যে সৱাট্ৰি মন্ত্ৰীৰ বাসভবনে হামলা কৰে তাৰা সৱকাৰ উত্থাত কৰতে সমৰ্থ হবেন।

এটা ছিল কেবলই রাজনৈতিক রোমাঞ্চ প্ৰবণতা। জাসদে অনেক যুক্তিদেহী এবং একনিষ্ঠ তৰুণ কৰ্মী ছিল, কিন্তু জাসদ মেতাৱা এৱ পৱেৱ কোন কৰ্মসূচিৰ

পরিকল্পনাও করেননি। যখন পরীক্ষার সামনে পড়লেন, তখন এসব নেতাদের সকল বিপ্লবের কথা আর সশ্রম উদ্ঘানের প্রতিশ্রুতি ফাঁকা ঝুলি হিসেবে প্রমাণিত হলো।

এ রূক্ম অবিমৃত্যকারিতার কারণে জাসদ তাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এমন অনেকের সমর্থন হারিয়েছিল। ফলঘন্টিতে জাসদ নেতারা তখন ত সারাতেই ব্যক্ত ছিলেন, কিন্তু এ অভিজ্ঞতা থেকে তারা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন নি।

ধর্মের মতো রাজনীতির যদ্যনামেও বিভাজনের ফলে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক সতীর্থদের মধ্যে যখন বিভাজন সৃষ্টি হয় তখন তারা একে অপরের চরম শত্রুতে পরিণত হন। তবুও অনেকে মনে করেন যে জাসদ সব সময় 'বৈজ্ঞানিক সম্মাজতত্ত্বের' কথা বলে সে দলটি হয়তো শ্রেণী সংঘান্মের উপর জোড় দিবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছিল যে জাসদের প্রধান কাজ হলো মুজিবকে উৎখাত করা।

একদিকে জাসদ নেতারা প্রলেতারিয় রাজনীতি আর কৃষক-শ্রমিকের হাতে ক্ষমতা দেয়ার কথা বলতেন, অন্য দিকে তারা নিজেদের মধ্যবিত্ত অবস্থা থেকে আরও উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। এবং সম্ভবত তারা তাদের স্ববিরোধী আচরণও ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এটি আরও অনেক কম্যুনিস্টের জন্যও প্রযোজ্য।

১৯৭২ সালের প্রথমার্ধে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) এর মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যে আওয়ামী সীগের বিকল্প হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তারা আওয়ামী সীগকে সহায়তা করার নীতি এতে প্রবলভাবে প্রয়োগ করছিল যে অন্ত সময়ের মধ্যে তাদের নিজেদের আলাদা পরিচয় হারিয়ে যায়। হয়তো আওয়ামী সীগকে সহায়তা করার পেছনে দলটির যথেষ্ট দান্তিক কারণ ছিল, কিন্তু তাদের এ রাজনীতির ধারার কারণে দলটি এর অনেক তরুণ সমর্থককে হারিয়েছিল। দলটির বিরুদ্ধে 'টাইলিজম' এর অভিযোগ করা হচ্ছিল এবং পরবর্তীতে তাদের আওয়ামী সীগের বি টিম হিসেবে সনাক্ত করা হতো। মুজিব নিজেই একবার একটি জন সম্বরেশে ন্যাপ (মোজাফফর) দলের নেতৃবৃন্দকে তাদের সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলে আওয়ামী সীগে যোগ দান করতে বলেন।

বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সরকারের প্রথম দিককার নীতি পদপেক্ষগুলোকে স্বাগত জানিয়েছিল। এ দলটি তাদের স্থিতীয় কংগ্রেসে মনে করছিল 'প্রগতিশীল নীতিসমূহের কারণে দেশের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে একটি বিপ্লবী প্রক্রিয়া' শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারা মনে করতো দল হিসেবে আওয়ামী সীগ মধ্যবিত্তকে নিয়ে গড়া হলেও এই দলটির মধ্যে অনেক 'সামগ্রীয়, বুর্জোয়া এবং এমন কি সাম্রাজ্যবাদের পরে' উপাদান ছিল। তবুও তারা শাসক দলের বিশেষত মুজিবের ইতিবাচক ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিল।

যদিও ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলোকে ব্যাপক ব্যবধানে পরাজিত করেছিল, মুজিব দলগুলোর সাথে মিত্রতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। মুজিবের ডাকে ১৯৭৩ সালের অটোবরে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) এবং সিপিবিকে নিয়ে গণ এক্ষ জোট গঠিত হয়েছিল। গণ এক্ষ জোটের কমিটিতে ঘোট ১৯ জন সদস্য ছিলেন—আওয়ামী লীগ থেকে ১১ জন, ন্যাপ (মোজাফফর) থেকে ৫ জন এবং সিপিবি থেকে ৩ জন। কিন্তু এটি একটি অসম জোট ছিল, ন্যাপ (মোজাফফর) এবং সিপিবি'র পক্ষে কেবল আওয়ামী লীগের সহযোগীর ভূমিকাই পালন করা সম্ভব ছিল। এই জোটের নেতৃত্ব ছিল আওয়ামী লীগেরই।

জোট যে সব শক্ত 'দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে বাড়্যন্তমূলক ও অন্তর্যাতমূলক তৎপরতা চালাচ্ছে' তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত নেয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিল। জোটের ইশতেহারে বলা হয় কিছু কিছু রাজনৈতিক দল মুজিবকে উৎখাত করাতে এবং 'প্রগতিশীল গণতন্ত্র'কে ধৰ্ম করে কম্যুনিজিম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছিল।

এই জোটের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হলেও অনেক আওয়ামী লীগার এটিন দিমন্দে ছিলেন এবং এ জোটকে আর অঙ্গসর হতে দেন নি। সিপিবি এবং ন্যাপ (মোজাফফর) প্রগম দিকে জোটের বিষয়ে অগ্রহী হয়ে উঠলেও বৃহৎ শিখগিরাই তারা সকল আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং তারা যে সমস্ত পাঠ্যক্রম আয়োজন করছিল সেগুলো গুটিয়ে নেয়।

কিছু কিছু কষ্টের ডানপাশী আওয়ামী লীগ নেতৃ মুজিব তাদের দৃষ্টিতে যে সমাজবাদী পথ ধরে এগিছিলেন সে জন্য সিপিবি এবং ন্যাপ (মোজাফফর)কে দায়ী করতেন। এ দুটি দলই মঙ্কোপহৃষ্টী ছিল। মইনুল হোসেন বলেছিলেন, 'মঙ্কোপহৃষ্টীরা কেমন তা আমরা জানি। তারা আপাত দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগকে সমর্পন করছে মনে হলেও আসলে তারা তাদের নিজেদের স্বাপই রক্ষা করতে। এটাই তাদের রাজনীতির ধারা।' তার অত্যে ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্টদের কাছে সুরক্ষণ যা অবস্থান ছিল বাংলাদেশের কম্যুনিস্টদের চোখে মুজিবও তেমনটাই। তার মতে সিপিবির তত্ত্বাবধান প্রধান মণি সিংহ শেখ মুজিবের উপর বাজে প্রভাব ফেলেছিলেন।

সিপিবি সভাপতি মণি সিংহ ছিলেন একজন কিংবদন্তী রাজনীতিবিদ। তিনি জিপ বছরেরও বেশি সময় হয়ে কারাগারে নয়তো আত্মগোপনে কাটিয়েছিলেন। আবু হোসেইন সরকার যে সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন সে সময়টি বাদে, ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার কম্যুনিস্ট রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পর থেকে পুরোটা সময়ই মণি সিংহ হয়ে কারাগারে নয় তো আত্মগোপনে ছিলেন।

মণি সিংহের সাথে মুজিবের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কারাগারে থাকার সময়েই এবং মুজিব তাকে ব্যাপক শুক্রা করতেন। কিন্তু মুজিবের উপর মণি সিংহের পক্ষাবের কথা যেতাবে বলা হয়ে থাকে তা অতিরিক্ত।

ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই সকল দেশপ্রের্থীক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিপুলী কাউন্সিল গঠন করা হোক এমনটি চেয়েছিলেন। তার এই দাবি ছাত্রলীগের রব-সিরাজ অংশের দাবির সাথে মিলে গেলেও, মোজাফফর মার্কিনী হলেও তিনি ‘সমাজতন্ত্র’ চাইছিলেন না। তিনি ভুলে যান নি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ১১ ভাগেরও বেশি ভোটার জামায়াতে ইসলামীর মত ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করে এমন দলগুলোকে ভেট দিয়েছিলেন। তিনি অসাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দিয়েছিলেন। তার দলের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি ১৯৭৩ সালে বলেছিলেন, ‘আমরা দায়িত্বজননীনের মতো আচরণ করতে পারি না। আমরা এখনই দলীয় অর্জনের কথা তাৰছি না। কট পাওয়া স্বাধীনতাকে যজ্ঞবৃত্ত করতে হবে। অসাম্প্রদায়িকতা ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব নয়। শেখ মুজিবই একমাত্র জাতীয় নেতা, এবং আমাদের উচিত হবে সাম্প্রদায়িকতা ও রোমান্ত্রণগতার বিরুদ্ধে মুজিবের হাতকে শক্তিশালী করা।’

আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেয়ার পেছনে সিপিবি এবং ন্যাপ (মোজাফফর) এর নিচয়ই আলাদা আলাদা কারণ আছে, কিন্তু মুজিবই এ দুটি দলকে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছিলেন, এর উল্লেখ হয়নি।

বাংলাদেশের খবরের কাগজগুলো ঝুঁটিয়ে দেখলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ইন্ডেকাক ছিল অনেক প্রচার সংখ্যা বিশিষ্ট একটি প্রভাবশালী দৈনিক। মাওলানা তাসানী এ পত্রিকাটির সাংগ্রহিক হিসেবে প্রকাশ করতেন। পরবর্তীতে তোকাঞ্জিল হোসেন যিনি মানিক মিয়া নামে পরিচিত তিনি এর দায়িত্ব নেন এবং দৈনিক হিসেবে প্রকাশ করা শুরু করেন। তিনি ছিলেন সোহরাওয়াদীর একনিষ্ঠ ভক্ত এবং প্রচণ্ড রকম মার্কিনপন্থী। তিনি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছের লোক ছিলেন, কিন্তু বাংলার দাবি দাওয়া প্রকাশ করার কারণে তাদের রোবানলে পরেন, তাকে দ্রুত ছেড়ে দেয়া হলেও তার পত্রিকাটির উপর নির্বেধাঞ্জা তুলে নিতে নিতে ১৯৬৯ সাল চলে আসে। তবুও তিনি বিশ্বাস করতেন পাকিস্তানের দুই অংশ এক সাথে থাকা উচিত। নিজ দায়িত্বে পাকিস্তানকে তেঙ্গে গড়া থেকে রক্ষা করতে তিনি যে অভিযান শুরু করেন সেই অভিযানে থাকা অবস্থায় ১৯৬৯ সালের ৩০ মে তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

মানিক মিয়ার দুই পুত্র, মইনুল এবং মুজু তার ঐতিহ্য ধরে রাখেন। ইন্ডেকাক এরপরও ডানপন্থী বৌক বিশিষ্টই থাকে। পত্রিকাটি অসহযোগ আন্দোলনের সময় যুক্তদেহী ছাত্র নেতাদের বিপক্ষে ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে তাদের সমালোচনা করার সাহস পায়নি।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পিপলস, সংবাদ এবং ইন্ডেফাক পত্রিকার অফিস পাকিস্তানি বাহিনী ঝুলিয়ে দেয়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সহায়তায় কিছু সময় পরে ইন্ডেফাক আবার প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু সংবাদ আর পিপলস কেবল স্বাধীনতার পরই আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে।

পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫৭ ভাগ ছিল বাঙালী। তারপরও ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুসারে তারা জাতীয় সংসদে সম বটন মেনে নিয়েছিল। এই ভূলের জন্য পরে তাদের অনেক মাত্রা নিতে হয়েছিল। তারা এর বিরুদ্ধে পচারণা ও চালিয়েছিল। এর ফলে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এই ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা নিতে ইয়াহিয়া খান বাধ্য হয়েছিলেন। ১১ জানুয়ারি ১৯৭০ এ প্রটন যয়দানে মুঞ্জিব তার প্রথম নির্বাচনী সভায় বজ্রকল্পে বলেছিলেন এরপরও যদি কেউ আবার জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে সম বটনের কথা বলে তবে তিনি একটি প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করবেন।

অনেক পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাই মনে করতেন 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ব্যবস্থার ফলে পাকিস্তানিদের উপর বাঙালীর অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মইনুল হোসেন সিদ্দিক সালিককে বলেছিলেন যে তার বাবা মানিক মিয়া বেঁচে থাকলে বাঙালীকে ১৯৫৬ সালের সংবিধান মেনে নিতে বাধ্য করা সম্ভব হতো। সালিকের মতে প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই মনে করতেন যে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর মানিক মিয়াই ছিলেন মুঞ্জিবের উপর একমাত্র সুশীল প্রভাব।

১৯৬৮-৬৯ সালের গণ অভ্যর্থনার মাধ্যমে আইয়ুব খানকে উৎখাত করার পর কারও পক্ষেই বাঙালীকে ১৯৫৬ সালের সংবিধান মেনে নিতে রাজী করানো সম্ভব ছিল না।

চাকার অধিকাংশ সাংবাদিকই সালিককে ঘৃণা করতেন, তবে কেউ কেউ তার ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং সালিক তাদের কথা মনে রেখেছিলেন। সালিক তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' নামক এক্সে মইনুল হোসেনকে পিতার মোগা সন্তান হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ইন্ডেফাকের ভূমিকা ছিল অনেকটা চিলির ক্ষেত্রে এল মার্কুরিও পত্রিকা যে ভূমিকা পালন করেছিল তার মতোই।

১৯৭২ সালের কোন এক সময় বাংলাদেশ অবজার্ভার নামের একটি সরকারী মালিকানাধীন দৈনিকে মত প্রকাশ করা হয় যে বাংলাদেশ সরকারের একটি সাম্বিধানিক ভিত্তি থাকা দরকার। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা মনে করেছিলেন যে পত্রিকাটি হয়তো সরকারের ভিত্তিকেই প্রশ়্নার মুখে ফেলতে চাইছে। ঐ পত্রিকার সম্পাদক আব্দুস সালাম ঐ দিনই অবসর গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ অবজার্ভার আব্দুস সালামের ছবিসহ তার অবসরে যাওয়ার খবর ছেপেছিল।

আব্দুস সালামের মেয়ের জামাই এ.বি.এম. মুসা মর্নিং নিউজ নামে আরেকটি সরকারী মালিকানাধীন দৈনিক চালাতেন, মুজিব আব্দুস সালামকে ঐ পত্রিকায় নিয়মিত একটি কলাম লেখার সুযোগ করে দেন।

সালামের অবসর এছের কারণে কিছু পচিমা সংবাদপত্র নিম্ন জ্ঞাপন করে। সরকারের এ সিদ্ধান্তটির তীব্র সমালোচনা করে সভনের টাইমস পত্রিকা।

আট বছর পর ঐ সম্পাদকীয়টি পড়ে তাতে কোন দৃষ্টীয় কিছু পাওয়া যায়নি। এটি শুধু সম্ভবত সালামের একটি বৃক্ষিকৃতিক অনুশীলন ছিল, তার মধ্যে একটি শাখীনচেতা বা অনেকে যেভাবে বলে থাকেন বিরোধিতা করার অভ্যাস ছিল। কিন্তু ১৯৭২ এর মার্চে এ ধরণের একটি সম্পাদকীয়কে নিরাবেগ দৃষ্টিতে দেখা বেশ কঠিন কাজ ছিল।

সালাম এ সহয় ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য ছিলেন এবং ১৯৫৪ সালে কৃষক শ্রমিক পার্টির মনোনয়ন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি একজন গর্বিত বাঙালী ছিলেন এবং প্রাদেশিক শায়ত শাসনের পক্ষের লোক ছিলেন। রেগে গেলে তিনি যে কারও সামনেই কথা বলতে পারতেন। তার জোধের সামনে একবার আইয়ুব খানও বিব্রত হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চে যখন বাঙালী জাতিয়তাবাদী চেতনা এর শীর্ষে পৌছেছিল, তখন সালাম ‘জয় বাংলা!’ শিরোনামে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষক এর প্রতিবাদ জানান। কিন্তু পাকিস্তান অবজারভার (শাখীনতা পরবর্তী সময়ে এটিই বাংলাদেশ অবজারভার হয়েছিল) এই প্রতিবাদলিপিটি ছাপেন।

সরকারি মালিকানাধীন মর্নিং নিউজ এবং দৈনিক পাকিস্তানসহ ঢাকার সব প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ২০ মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তান সরকারের প্রতি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে একই ধরণের সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। অথচ পাকিস্তান অবজারভারে এমন সম্পাদকীয় ছাপা হয় একদিন পর। একই ভাবে সকল পত্রিকা ‘জয় বাংলা’ নামে অতিরিক্ত পাতা ছাপার একদিন পর ২৩ মার্চ ১৯৭১-এ অবজারভার তা ছাপায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক সালামের প্রতি বিরুদ্ধ ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বলেছিলেন, ‘সালামের ‘জয় বাংলা’ শীর্ষক প্রবন্ধের বিপরীতে যে সমস্ত শিক্ষক প্রতিবাদলিপি শাক্ত করেছিলেন তারা সবাই পাক সেনাবাহিনীর তালিকায় অন্তর্ভূত হয়েছেন।’ ঐ তালিকায় শুধু তারাই ছিলেন এমন নয়, এবং প্রতিবাদলিপিতে শাক্ত না করলেও তারা তালিকাভূক্ত হতেন। যে সব বাঙালী উদারপন্থী ছিলেন তাদের সকলকেই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অন্তর্ধাতমূলক তৎপরতায় জড়িত বলে সন্দেহ করত।

সালাম এতেটাই মার্কিনপন্থী ছিলেন যে মাঝে মাঝে তার আচরণে ঢাকার মার্কিন কূটনৈতিকরাও লজ্জা পেয়ে যেতেন।

বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো সংবাদপত্র আর জার্নাল গজিয়ে উঠছিল। একটি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে এমন ঘটবে এটিই শাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞাপন থেকে আয় অতি সামান্য এবং প্রচার সংখ্যাও খুব কম হওয়া সত্ত্বেও এসব প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসছিল তা ভাববাবর মত বিষয়। এসব পত্রিকার মধ্যে সংহতগাই একদম শুরু থেকে সরকার বিরোধী ছিল।

একজন আওয়ামী শীগ নেতা বলেছিলেন, ‘মাত্র ২৪ বছরের ব্যবধানে ঢাকা একটি জেলা শহর থেকে একটি দেশের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। আমরা দেশ চালাচ্ছি একটি প্রাদেশিক প্রশাসন দিয়ে।’ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা জরুরি হলেও, আগে নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল নতুন সরকারটি কি আগের সরকারের অনুগামী না কি একটি বিপুরী সরকার। রাজনৈতিক নেতারা কি চাচ্ছিলেন যে আমলারা তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তাদের হয়ে সরকার চালাক?’

কামাল হোসেন বলেন, ‘উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি ছিল খুবই দুর্বল, এর কারণ তখু এই নয় যে এই প্রশাসনের কাঠামোটি ‘প্রাদেশিক’ ছিল, যে কাঠামোর মধ্যে থেকে সরকার এ পর্যন্ত দেশ চালিয়েছে, বরং বিদ্যমান প্রশাসনের মধ্যেই অনেক রকম নিভাজনের অঙ্গিত্তও এ দুর্বলতার জন্য দায়ী। প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অনিচ্ছ্যতায় ডুগচে এবং রাজনৈতিক সরকার থেকে এক ধরণের দূরত্ত অনুভব করার কারণে অচলাবস্থা সৃষ্টির কৌশল বেছে নিয়েছে, পাশাপাশি ক্রমেই বেড়ে উঠতে পাকা বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে।’ যে বিশেষ আঁটান আওতায় আমলাদের দ্রুত পদচ্যুত করার সুযোগ ছিল সেটির কারণে তারা অনিচ্ছ্যতায় ভুগছিলেন, এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পুরো পরিস্থিতি বুন্দে নিয়ে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে তাদের খুব বেশি সময় লাগেনি।

সে সময়ে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার উপর অনেক বেশি জোর দেয়া হচ্ছিল এবং রাজনৈতিক মতাদর্শকে মোটেও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছিল না। এই পুরো প্রজন্মাটিটি ছিল জন্মিপূর্ণ। যদি উদ্ভূত সংকট সমাধানের প্রকৃত রাজনৈতিক ইচ্ছা পাকতো তাহলে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অভাব সামান্য প্রতিবন্ধকর্তাই তৈরি করতো। অনেক বিপুরী দলই প্রথমদিকে একটি ‘ব্যাপক বিশ্বব্ল অবস্থা’র সৃষ্টি করলেও তাদের রাজনৈতিক দিশা আর কর্তব্য সম্পাদনের ইচ্ছার কারণে সে সংকট কাটিয়ে উঠেছে।

মাওবাদী মাওলানা

বাংলাদেশের প্রথম পদ্ধতিগতির পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, 'আমাদের অসাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের প্রতি সৎ থেকে আমরা রাজনীতি থেকে সকল সাম্প্রদায়িক অপশঙ্কিকে দূর করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঐক্যবন্ধ হয়েছি। একজন ব্যক্তি আমাদের সামনে প্রমাণ করেছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে ধর্মীয় উন্নাদনার উর্ধ্বে ওঠা এবং গোত্র ও বর্ণের বিভিন্ন ভূলে যাওয়া সম্ভব, যার ফলশ্রুতিতে আমরা উপনির্বেশিক শোধকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুক্ত শুরু করেছিলাম। যদিও বহু বছরের পক্ষাদপন্দতা এবং ধর্মীয় উন্নততা এক দিনেই নিচিহ্ন করে দেয়া সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা যদি সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করি তবে এরকম প্রপক্ষ এদেশের মাটিতে বেড়ে উঠতে পারবে না।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই জামায়াতে ইসলামী এবং মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলো যেগুলো পাকিস্তানি সামরিক জাঞ্জাকে ব্যাপক সহায়তা ও সমর্পন দিয়ে আসছিল সেগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

অনরোধ থেকে বাঁচার জন্য এসব দলের নেতারা আত্মগোপন করেছিলেন।

রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেললে তার ফলে যে বিপদ ঘটে তা বাংলাদেশীরা তাদের তিঙ্গ অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলক্ষ্মি করার পর স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোন সুযোগই ছিল না।

সাত্য কখন হলো অনেকে বিশ্বাস করতেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ফলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে গিয়েছিল। ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ এ সোশালিস্ট ইন্ডিয়াতে ইকবাল সিং বলেছিলেন, 'একটি বাস্তববাদী অসাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের ফলে উপমহাদেশের সংক্ষার-বিরোধী অপশঙ্কিতগুলো নিচিতভাবেই একটি গুরুতর এবং খুব সম্ভবত ফলাফল নির্ধারণী পরাজয়ের মুখ দেখেছে এবং সংক্ষারের আন্দোলনও একটি নতুন প্রয়োদনা পেয়েছে।' তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, 'ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জনগণের জন্য এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে যার ফলে ভারত ও বাংলাদেশে এবং ব্যাং পাকিস্তানেও রাজনীতির জন্য একটি অসাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে।' ইকবাল সিং উভয় দেশের নেতাদের 'যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তার ধরণ বোঝা এবং সেই বোঝার ডিপ্তিতে তাদের নীতি ও কর্মসূচিসমূহ দাঁড় করাবার' উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারূপ করেন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'অন্যথায় এমন অপূর্ব সুযোগ হয়তো নষ্ট হবে।'

'এমন অপূর্ব সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে' এই সতর্ক বাণীর প্রতি মন দেয়ার অবস্থা ১৯৭২ সালে খুব কম লোকেরই ছিল। সংক্ষার-বিরোধী অপশঙ্কিতগুলো, যাদের

বহিঃক্ষণগুলো সহায়তা করবে, এদেরকে অধিকাংশ ব্যক্তি যথেষ্ট শুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এটি ছিল একটি বিশাল ভূল।

বাংলাদেশে খুব দ্রুতই সাম্প্রদায়িক অপশ্চিত্তগুলো মাথা ঢাঢ়া দিয়ে গঠে। মাওলানা ভাসানীই এদের উখানে সহায়তা করেছিলেন, তবে আওয়ামী লীগকেও এর কিছু দায় নিতে হবে। ভাসানী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি এতটাই সম্মানিত ছিলেন যে তার বিরক্তে ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবাই যেত না। সমস্ত মন্ত্রীই এক সময় যখন মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন তখন তার অধীনে কাজ করেছিলেন এবং সবাই তাকে শুক্রা করে 'জুর' বলে ডাকতেন। কিন্তু তাদের উচিং ছিল ভাসানীর সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারের মোকবেলা করা, রাজনৈতিকভাবে তার বিরক্তে লড়াই চালানো। কিন্তু তারা কিছুই করেন নি। এদের মধ্যে অল্পকিছু লোকেরই শপেটি রাজনৈতিক একনিষ্ঠতা বা এমন কি রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা ছিল। হয়তো এদের মধ্যে দুই একজন ভাসানীর সাম্প্রদায়িক প্রচারণা এবং ভারত-বিরোধী উদ্যোগের ফলে সম্ভটও হয়েছিলেন।

ভাসানী মুজিব সরকারের অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আঘাত করেছিলেন দেখে মুহিত মজুমদার হত্যাক এবং ব্যাখ্যি হয়েছিলেন। তবে ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের ঘোর প্র্যাচ সম্পর্কে যাদের জানা ছিল তারা স্থায়ীভাবে পরবর্তী সময়ে তার কর্মকাণ্ডে বিশিষ্ট হননি। মাঝে মাঝে ভাসানী প্রচার বিপ্রবী মোগান দিলেও, কখনো কখনো ধর্মোন্যাম মোঝাদের মতো পচাদপদতাও দেখাতেন।

কোন কিছুর তোয়াক্তা না করে ১৯৭২ সালে কেবল ভাসানীর পক্ষেই সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারে লিপ্ত হওয়া সত্ত্ব।

জনগণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসানীকে যেন তৈরিই করা হয়েছিল বিরোধী দলীয় নেতা হওয়ার জন্য। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তখন করে ১৯৫৮ সালে সেনা শাসন কায়েম হওয়ার আগে পর্যন্ত ভাসানীই ছিলেন পূর্ব বাংলার সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা।

তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনি যখন আওয়ামী লীগ ডেস্ট ১৯৫৭ সালে নাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন, তখন আওয়ামী লীগে থাকা অধিকাংশ বামপন্থী তার সাথে চলে যান। তাকে সবাই জানতো একজন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা হিসেবে যার কৃষক এবং শুমিকদের মধ্যে অনেকে ডক্ট-সমর্থক ছিল। পূর্ব বাংলায় বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে তার শুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সালের পরের সময়ে তার ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ অন্য একটি গল্প।

১৯৫৮ সালে আরও পাঁত পাঁত ব্যাকের সাথে তাকে আটক করা হয়েছিল। আটক থাকা অবস্থায় তার কিছু একটা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি আইযুব খানের সাথে একটি সমরোহায় পৌছেছিলেন। এই অভিযাগ সত্য বা মিথ্যা যাই হোক, ১৯৬৩ সালে আইযুব খান ভাসানীকে চীনে অঙ্গোবের উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য সরকারি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এতে তার দলের অনেকেই বিব্রত হলেও, ভাসানী ঘৃণিত সেনা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার মধ্যে ভূল কিছু দেখেননি।

চীন ভাসানীকে এমনভাবে স্বাগত জানায় যেন ভাসানী কোন ভ্রাতৃসূলভ দেশ থেকে আগত আন্তর্জাতিক ব্যার্ত সম্পন্ন নেতা। এতে ভাসানী খুব আবেগাক্ত হয়েছিলেন।

চাইনিজ নেতারা চীন ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত করতে ভাসানীকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, ভাসানীও এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

আগে পাকিস্তানে চীনের এক্সু হিসেবে পরিচিত হওয়াটা খুবই বিপদজনক হলেও, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর পুরো চিটাটিই বদলে গিয়েছিল। চীন ভারতের শক্তি ছিল, ফলে তারা ছিল পাকিস্তানের বক্তু। অনেক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিও একরাতের ব্যবধানে চীনপক্ষী বিপুর্বী হয়ে গিয়েছিলেন। বিপুর্বীপনা তাদের সাম্প্রদায়িকতা এবং ভারত-বিরোধিতা ঢেকে রাখার জন্য একটি সুবিধাজনক মুখোশ ছিল। এমনকি যে সমস্ত মোঢ়া কয়েকদিন আগেও চীনকে একটি খোদাইন দেশ হওয়ায় ঘৃণা করতে, তাদেরও হঠাতে মনে পড়ে গিয়েছিল নবী মোহাম্মদ (স.) বলেছিলেন, ‘জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীনে যাও।’

চীনপক্ষী কম্যুনিস্টরাও আইযুব খানকে সমর্থন কার শুরু করে। তারা হয়তো এটি তাদের নীতির কারণেও করে থাকতে পারে, কিন্তু এটাও সত্য যে তাদের অনেকের বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল পাক সরকার সেগুলো প্রত্যাহার করে নেয়।

ভাসানী পাকিস্তানী পররাষ্ট্রনীতির একজন কড়া সমালোচক ছিলেন, এবং অন্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে পাক সরকারের সামরিক চুক্তি ইস্যুকে কেন্দ্র করেই ১৯৫৭ সালে তিনি আওয়ামী মীগকে দুড়াগ করেছিলেন। ১৬ জুন ১৯৫৭ সালে ভাসানী বলেছিলেন, ‘মুজিব এটি বুঝতে পারছেন না যে যদি তাকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন নিশ্চিত করতে হয় তবে অবশ্যই তাকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি যার অর্থ হলো সামরিক চুক্তি, সেগুলোর মোকাবেলা করতে হবে। কেবল একজন অক্ষ ব্যক্তিই এটি দেখতে পাবেন না যে সমারিক চুক্তির আওতায় যে অন্ত পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কঠরোধেই ব্যবহৃত হবে।’ (জোর দেয়া হয়েছে)

সিইএনটিও এবং এসইএটিও তে পাকিস্তানের সদস্যাপদ নিয়ে চীনের কোন রকম আপত্তি ছিল না। চীন আইযুব খানের পক্ষে ছিল। যতোক্ষণ আইযুব খান চীনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলায় ব্যক্ত ছিলেন ততোক্ষণ ভাসানী এবং আরও কিছু বেইজিংপ্যাস্টি বাম নেতাদের আইযুবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না।

১৯৬৪ সালের শুরুর দিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে আগে, পাকিস্তান সরকার একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করবে এই শর্তে আইযুব খানের হাতকে শক্তিশালি করার আহবান জানিয়েছিলেন।

মুজিব সব সময়ই ভাসানীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তার অনুসারীদের মধ্যে কেউ মুজিবের এই প্রাক্তন নেতার বিরুদ্ধে কিছু বললে তিনি তাদের নিরুৎসাহিত করতেন। আপাত দৃষ্টিতে মুজিব এবং ভাসানীর মধ্যে উক্ত সম্পর্ক আছে বলে মনে হলেও, ভাসানীর মধ্যে মুজিবের প্রতি এক ধরণের বিবেষ ছিল। অন্য অনেকের মতোই ভাসানীও হয়তো মুজিবের জনপ্রিয়তার কারণে তাকে হিংসা করতেন, মুজিবের এত জনপ্রিয় হওয়ার কারণ তিনি ধরতে পারেন নি।

১৯৭০ সালে ভাসানী বলেছিলেন, ‘মুজিব যদি ক্ষমতায় যায়, তা হবে আমার লাশের ওপর দিয়ে।’ ভাসানী ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন যতভাবে সঁষ্ঠব বিলম্বিত করতে সঁচেট হয়েছিলেন।

সাদিক সালিক বলেছিলেন ১৯৭০ এ ঢাকার সরকারী বাসভবনের কিছু উজ্জ্বুক-উদ্রূতে তিনি যে বিশেষণটি ব্যবহার করেছিলেন তার শান্তিক অর্থ হলো ‘প্যাটা’-মাওলানা ভাসানী’র ন্যাপকে আওয়ামী জীবের বিকল্প হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। টাঙ্গাইলে যখন ভাসানী একটি কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন তখন সরকার টাঙ্গাইলগামী বিশেষ ট্রেন চালু রেখেছিল যাতে ঐ সম্মেলন সফল হয়। ঐ সম্মেলনের মূল বক্তব্য ছিল: ‘নির্বাচনের আগে বাদ্য।’

২১ মার্চ ১৯৭০ এ লাহোরে পৌছে ভাসানী বজ্রকচ্ছ ঘোষণা করেন সকল সম্পদের জাতীয়করণ করতে হবে। এর কয়েকদিন পর টো টেক সিং এ সভায় তিনি হমকি দেন যে সরকার যদি জনগণের উপর নির্বাচন চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে তবে তিনি গেরিলা যুদ্ধ শুরু করবেন, এ জন্য তার ৫০,০০০ সশস্ত্র যোদ্ধা রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছিলেন।

১৯৭০ সালেই সেপ্টেম্বর মাসে ভাসানী আকস্মিকভাবে পঞ্চম পাকিস্তান সফরে যান এবং ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করেন। এর আগে ভাসানী ও আইযুব খানের মধ্যকার গোপন সংলাপের কথা যারা জানতেন তারা এ ঘটনায় সন্দিক্ষণ হয়ে পড়েন।

১২/১৩ নভেম্বরে যে প্রলংকৃতী সাইক্লোন হয় সেটিকে অজ্ঞাত হিসেবে ব্যবহার করে ঐ মাসে ভাসানী ডিসেম্বরের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবি জানান।

পুরো সময়টিতেই গোয়েন্দা সংহাতলো ১৯৭০ এর নির্বাচনে মুজিবের দিক থেকে জনগণকে সরিয়ে আনতে পারেন এমন একজন নেতা হিসেবেই ভাসানীকে দেখিয়ে আসছিল।

এটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছাপ্রসূত কল্পনা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টিতেই বিশাল ব্যবধানে জয় পেয়েছিল।

ভাসানী পূর্ব বাংলার বাধীনতার কথা বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এরপরও তিনি পাকিস্তানী সামরিক জাঞ্জার বিরাগভাজন হন নি।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যখন বাঙালীর উপর হামলে পড়ে, তখন ভাসানী ভারতে পাড়ি জমান। তার দলের একজন শীর্ষ নেতা তাকে পূর্ব বাংলায় ফিরিয়ে আনতে গেলেও, ভাসানীর এতটুকু রাজনৈতিক প্রভাব ছিল যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ব বাংলা দখলদার বাহিনীর অধীনে থাকা অবস্থায় সেখানে ফিরে যাওয়াটা নিরাপদ হবে না।

ভারতে থাকা অবস্থায় ভাসানীকে একজন প্রবীণ রাজনীতিকের জন্য উপযুক্ত সম্মান দিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য ভারত সরকার যা করছিল তার জন্য ভারত সরকারকে একাধিকবার ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। দেশে ফেরার আগ পরেই তিনি ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির ভূমসী প্রশংসা করে ২৪ মার্চ ১৯৭২ এ তিনি বলেছিলেন, ‘‘বাধীনতা সংঘামের সময় প্রমাণিত হয়েছে ভারত বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু। আমি এটি কোন দিন ভুলব না।’’

দেশের সংকটগুলো সমাধান করার জন্য মুজিব সরকারকে দুই থেকে তিনি বছর সময় দেয়ার জন্য তিনি জনগননগকে অনুরোধ করেছিলেন।

অর্থাৎ, আগুন সময়ের মধ্যেই ভাসানী বলতে শুরু করেন যে ভারতে থাকা অবস্থায় তিনি কার্যত বন্দী ছিলেন। দেশে নিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রতিদিন ভারত থেকে যে হাজার হাজার মানুষ তাদের পূর্ব পুরষের ঘর বাড়ি দেখবার জন্য বাংলাদেশে আসছিলেন তাদের দায়ী করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ‘‘এদেশ যদি তাদের এত ভালই লাগে তবে কেন তারা এদেশের অংশ হয়নি?’’

মূলত ভারত ও বাংলাদেশকে বিব্রত করার জনাই তিনি বাংলাদেশ, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং তিপুরাকে নিয়ে বৃহত্তর বাংলার পুরোনো ধারণাটি আবার সামনে নিয়ে আসেন। এর আগে তাঁর আসামকে পাকিস্তানের অংশ করে নেয়ার দাবিতে কেউ কান দেয়ানি। কিন্তু বৃহত্তর বাংলা গঠনের চিন্তাটি ভয়ঙ্কর।

মাত্র দুই বছর আগেও এমন একটি প্রত্নাবকে ভাসানী সিআইএ'র চক্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি দাবি করেছিলেন যে সিআইএ পূর্ব বাংলা এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি কুপরিকল্পনা করছিল এবং ন্যাপ (ভাসানী) এর মহাসচিব মোহাম্মদ তোহার কাছে সে সংক্রান্ত একটি সিআইএ নথি ছিল এবং তোহাকে সেটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলার পরও তোহা সেটি করেননি বলে অভিযোগ করেছিলেন।

তোহা, যিনি ছিলেন একজন চীনপন্থী বাষ, ভাসানীর এ অভিযোগের জবাবে বলেছিলেন, ভাসানী যদি ঐ নথিটিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে থাকেন তবে তার উচিং ছিল নিজেই সেটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা।

তোহা নিজে হয়তো বৃহত্তর বাংলার ধারণাটি পছন্দই করেছিলেন। ১৯৭২ সালে বেইজিং-এ একটি কূটনৈতিক সংবর্ধনায় তখনো পাকিস্তানি দৃতাবাসে কাজ করছিলেন এমন একজন বাঙালী কূটনৈতিক চীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সমর্পন না দেয়ায় ভদ্রভাবে হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় কিংবা হয়ে একজন চাইনিজ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, ‘বেশ, তোহা আর তার বৃহত্তর বাংলার প্রত্নাবের কি হল? আমরা সেটি সমর্পন দিতে প্রস্তুত আছি।’

জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ঠেকানোর জন্য চীন ২১ আগস্ট ১৯৭২-এ প্রথমবারের মত নিরাপত্তা পরিষদে তার ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল। এই ভেটো যদিও অপ্রত্যাশিত ছিল না, তবুও এর ফলে এমন কি যেসব বাঙালী চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলা কালে পাকিস্তানি সামরিক জাহাজকে সহায়তা করেছিল এটি ভুলে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন তারাও হতাশ হয়েছিলেন। বাংলাদেশের নেতৃত্বে হঠাতে পেরেছিলেন যে চীন ‘ইছাকৃতভাবে এমন একটি নীতি নিয়েছে যার ফলে উপমহাদেশে উত্তেজনা এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়।’ পরবর্তী মঙ্গী আব্দুস সামাদ আজাদ, যিনি চীনকে অবৃশি না করতে উদ্যোগ হিলেন, তিনিও মত প্রকাশ করেন যে চীন বাংলাদেশের ‘সার্বভৌমত্বের’ শক্তির মতো আচরণ করছে। তবে হয়তো বেশি আক্রমণাত্মক অবস্থান নেয়া হয়ে যাচ্ছে মনে করে সামাদ আজাদ এর সঙ্গে যোগ করেছিলেন যে, বাংলাদেশ এরপরও চীনের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাঢ়িয়ে রাখবে।

চীনের এহেন কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশে যারা চীনের বিত্র তারা বিত্রতকর অবস্থায় পড়ে যান। এমন কি ভাসানীও বলেছিলেন, ‘আমি আমার অন্তর থেকে চীনের এই ভেটো দেয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’ কিংবা তার এই প্রতিবাদ তীব্রও ছিল না এবং এটি অন্তর থেকেও করা হয়নি, তিনি যদি বিত্রতও হয়ে থাকেন তাও হয়েছিলেন কেবল দূর্যোগের জন্যই।

চীনের এই ভেটোর মাত্র চার দিন পর, ২৫ আগস্টে তিনি ভারতকে বাংলাদেশের এক নব্য শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘প্রতিদিন প্রায় তিনি মিলিয়ন ভারতীয় বাংলাদেশে স্বল্প সময় ধাকার জন্য প্রবেশ করছে। এরকম যাতায়াতের ফলে দেশের সীমিত সম্পদের উপর ব্যাপক চাপ পড়ছে এবং সাম্প্রতিক কালে নিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির পেছনে এটি একটি প্রধান কারণ।’

প্রতিদিন তিনি মিলিয়ন বহিরাগত! তারা কোন বাহনে যাতায়াত করতো? এমনকি ভারত সরকারের বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের পাসপোর্টে বিশেষ এনডোসর্মেন্ট লাগবে এমন নিয়ম চালু করার আগেও এই পরিমাণে ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করেনি।

১৯৭২ সালের ২৫ আগস্টের মধ্যেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ডিসা ব্যবস্থা চালু হয়ে গিয়েছিল এবং বাংলাদেশে ভারতীয় অভ্যাগতের সংখ্যা আগের তুলনায় বহুলাখণ্ডে কমে এসেছিল। কিন্তু এতো সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ নিয়ে ভাসানী চিন্তিত ছিলেন না। তার পরিসংখ্যান ছিল তার নিজের তৈরি এবং এগুলো নিয়ে তিনি খেলেছিলেন। কোন পিধা ছাড়াই তিনি সবচেয়ে অন্তৃত পরিসংখ্যান ব্যবহার করতে পারতেন, যদি মনে করতেন যে এটি তার উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগী হবে।

তিনি বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারে অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে তৈরি সংবিধান চেয়েছিলেন এবং ইসলামী শিক্ষার উপর বিশেষ জোরাবেগ করেছিলেন। তিনি অন্তরের জন্য বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র করার দাবি করে বসেন নি।

তিনি ভারতের বিরুদ্ধে বিদেশ ছড়াচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভারত বাংলাদেশকে তার পৈঁচে যাওয়া দ্রব্য নিষ্কাশনের স্থানে পরিণত করেছিল। ভারতীয় দ্রব্য বর্জনের ভাব দিয়ে তিনি ভারতকে উচিত শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছিকও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশ ভারতের জন্য ভিয়েনাম হবে।

ভাসানী মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বাংলাদেশ নিজেকে ভারতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করতে না পারলে চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তীব্র বাধা সৃষ্টি করবে।

তিনি নিশ্চিত ছিলেন মুজিব তাকে সাথে নিয়ে বেইজিং সফরে গেলে তিনি সেখানকার কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশকে শীর্কৃতি দেয়ার ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম হবেন।

এর মাত্র এক মাস আগেই ভাসানী বলেছিলেন যে কেবল পাকিস্তান যদি বাংলাদেশকে শীর্কৃতি দেয় তখনই তিনি পাকিস্তান সফরের যে আহবান ডুটো তাকে জানিয়েছেন সেটি বিবেচনা করতে পারেন।

সে সময় লভন থেকে গল্পাডার স্টোন অপারেশনের পর মুজিব সুইজারল্যান্ড সরকারের আমন্ত্রণে জেনেভায় ছিলেন।

মাওলানা ভাসানীর মধ্যে একটি নিষ্ঠুরতার প্রবণতা ছিল। পঞ্জাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভাসানী একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হঠাতে বলেছিলেন, 'আপনি মারা গেলে অস্ত ৫০০ লোক শুশি হবেন।' 'আমি কি অপরাধ করেছি' ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করেছিলেন। 'কিছুই না' জবাবে ভাসানী বলেছিলেন, 'কিন্তু আপনি একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। এটিই যথেষ্ট।'

৯ মার্চ ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুর ডাকা অসহযোগ আন্দোলন চলা অবস্থায় ভাসানী টাঙ্গাইল থেকে ঢাকায় আসেন। অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন ভাসানী হয়তো সেদিন তার সভায় জনগণকে সংঘাতে উৎসাহিত করে পুরো আন্দোলনকে ডেন্তে দিবেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা মুজিবকে চেন না? সে আমার সাথে নয় বছর কাজ করেছে। সে কোন অবস্থাতেই জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। সে আমার কাছে 'পুরো' চেয়েও প্রিয়।'

মুজিব হত্যার পর ভাসানী মুজিব সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের সাহস দেখানোর জন্য মোন্টাকের প্রশংসা করে একটি টেলিগ্রাম মোন্টাকের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের আগস্ট মাসেই যখন মুজিব গল্পাডার স্টোন অপারেশনের জন্য লভনে গিয়েছিলেন তখনই মুজিব বিরোধী অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১১ আগস্ট ১৯৭২ এ হলিডে পত্রিকায় লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন লিখেছিলেন, 'সাধারণত, একটি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে যুক্তের পরের 'নতুন চেতনা' টিকে যায় এবং এটিই ধ্রুবস্তুপ থেকে দেশ গড়ার কাজে লাগে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটছে এর উল্টোটি।' মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবের কারাগারে থাকার দিকে ইঙ্গিত করে জিয়াউদ্দীন আরও লিখেছিলেন, 'আমরা তাকে ছাড়াই লড়াই করেছি এবং জয়লাভও করেছি। এবং এখন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা আবার লড়বো।'

মুজিব লভনের হাসপাতালে থাকা অবস্থায় এই নিবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। জিয়াউদ্দীন ছিলেন ঢাকা বিপ্লবের কমান্ডার।

এই নিবন্ধটি লেখার অপরাধে তার তৎক্ষণিকভাবে সেনা আদালতে বিচার হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সেনা সদর তার বিরক্তে কোন ব্যবস্থা নেয়ানি এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিধানিত।

মুজিব ঢাকায় ফিরে জিয়াউদ্দীনকে ডেকে পাঠান এবং তাকে নিশ্চয়তা দেন যে তিনি যদি ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে তার বিরক্তে কোন অভিযোগ আনা হবে না। এরপর জিয়াউদ্দীন আত্মগোপন করেন।

১৯৭২ এর শেষ দিকে জিয়াউদ্দীনকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়।

জিয়া উদ্দীনকে সমর্থন করতেন লে. কর্নেল আবু তাহের, তাকেও সেনা বাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরপরে ১৯৭৩ সালে আবু তাহেরকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন্য বিভাগে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল; কাকতালীয়ভবে এ মন্ত্রণালয়টি ছিল মোতাকের অধীনে।

জিয়া উদ্দীন সিরাজ শিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন। এই দলটির নামটি গুরুত্ববহু। শিকদার এবং তোহার মতে বাংলাদেশ তখনে পূর্ব পাকিস্তানই রয়ে গিয়েছিল। শিকদার মুজিব সরকারকে প্রধান শক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তার দল পুলিশ আউটপোস্টগুলোতে ধারাবাহিকভাবে হামলা চালিয়েছিল। দুর্বল অস্ত্র এবং অপ্রতুল প্রশিক্ষিত পুলিশ, আধুনিক অঙ্গে সংজ্ঞিত সর্বহারা পার্টির সামনে টিকতে পারেনি।

১৯৭১ সালে নোয়াখালী সেচ্চের পাকিস্তানি কম্যান্ডারের দায়িত্ব পালনকারী কর্নেল আশিক হোসেন ১৯৭৬ এর এপ্রিলে লরেস লিফটলজকে দেয়া সাক্ষাত্কারে দাবি করেছিলেন যে মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে তোহা পাকিস্তানী বাহিনীকে সহযোগিতা করবেন এমন একটি বৌঝাপড়ার সংস্কারনা নিয়ে তার সাথে তোহার আলাপ হয়েছিল।

একজন পাকিস্তানি কর্নেলের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না হয়তো। নোয়াখালী জেলায় তোহার নিজের গেরিলা ধাটি ছিল। কিন্তু তিনি মুক্তি বাহিনীকে পাক বাহিনীর চেয়েও বড় শক্ত মনে করতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তোহা আজগোপনেই গেকে যান। দেশ স্বাধীনতার অন্ত পরেই বাঙালীর মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে তা তিনি জানতেন, এবং যখনই ঢাকায় আসতেন তখন বাঙালীর পরিবর্তে তিনি বিহারীদের সাথে থাকতেন।

যে বাঙালী তখনে পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন বিহারীরা তাকে নিজেদেরই লোক মনে করতো। তিনি সবুর খানের মতো মুসলিম লীগার হলেও, আবার তোহার মতো চীনপক্ষী কম্যুনিস্টও।

এটি কোন কাকতালীয় ব্যাপার ছিল না যে, ঢাকায় থাকা বিহারীদের মধ্যে যাদের বামপক্ষী যোগাযোগ ছিল বা যারাই বাম রাজনীতির ছল করতো তারা সবাই চীনপক্ষী। তারা পাকিস্তানি সামরিক জাতাকে সাহায্যও করতো কিন্তু এরপরও নিজেদের প্রগতিশীল ভাবতো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংঘামে চীনের ভূমিকার কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, বিশেষত চীনপক্ষী বামপক্ষীরা ব্যাপক নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়ে যান। বদরুদ্দীন উমর সহ অনেকে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন ১৯৭১ সালে তারা যে স্বেচ্ছায়েহেন

তা আবার ফিরে পেতে বহু বছর লেগে যাবে। কিন্তু চীনের সাথে বকুত্তের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার উদ্ঘীর্ণ থাকায় এসব রাজনীতিক যতোদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে তারা ভেবেছিলেন তার অনেক আগেই দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

যত যাই হোক এটি শীকার করতে হবে যে প্রকৃত চীনপক্ষী বামদের রয়েছে ত্যাগ শীকার করার দীর্ঘ ইতিহাস। এদেরকে যে ছাত্রা সমর্থন করতো তারা ছিল যোক্তা প্রকৃতির এবং আদর্শবাদী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদানকে অবশ্যই শীকৃতি দিতে হবে।

১৯৭২ এর শেষ দিকে জিয়াউদ্দীনকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাত্ত করা হয়।

জিয়া উদ্দীনকে সমর্থন করতেন লে. কর্নেল আবু তাহের, তাকেও সেনা বাহিনী থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরপরে ১৯৭৩ সালে আবু তাহেরকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বনন বিভাগে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল; কাকতালীয়ভবে এ মন্ত্রণালয়টি ছিল মোতাকের অধীনে।

জিয়া উদ্দীন সিরাজ শিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন। এই দলটির নামটি গুরুত্ববহু। শিকদার এবং তোহার মতে বাংলাদেশ তখনো পূর্ব পাকিস্তানই রয়ে গিয়েছিল। শিকদার মুঁজিব সরকারকে প্রধান শক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তার দল পুলিশ আউটপোস্টগুলোতে ধারাবাহিকভাবে হাষলা চালিয়েছিল। দুর্বল অস্ত্র এবং অপ্রতুল প্রশিক্ষিত পুলিশ, আধুনিক অঙ্গে সজ্জিত সর্বহারা পার্টির সামনে টিকতে পারেনি।

১৯৭১ সালে নোয়াখালী সেক্টরে পাকিস্তানি কমান্ডারের দায়িত্ব পালনকারী কর্নেল আশিক হোসেন ১৯৭৬ এর এপ্রিলে লরেন্স লিফটলজকে দেয়া সাক্ষাত্কারে দাবি করেছিলেন যে মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে তোহা পাকিস্তানী বাহিনীকে সহযোগিতা করবেন এমন একটি বৌঝাপড়ার সম্ভাবনা নিয়ে তার সাথে তোহার আলাপ হয়েছিল।

একজন পাকিস্তানি কর্নেলের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না হ্যাতো। নোয়াখালী জেলায় তোহার নিজের গেরিলা ঘাঁটি ছিল। কিন্তু তিনি মুক্তি বাহিনীকে পাক বাহিনীর চেয়েও বড় শক্ত মনে করতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তোহা আত্মগোপনেই থেকে যান। দেশ স্বাধীনতার অফ পরেই বাঙালীর মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে তা তিনি জানতেন, এবং যখনই ঢাকায় আসতেন তখন বাঙালীর পরিবর্তে তিনি বিহারীদের সাথে থাকতেন।

যে বাঙালী তখনো পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন বিহারীরা তাকে নিজেদেরই লোক মনে করতো। তিনি সবুর খানের মতো মুসলিম লীগার হলেও, আবার তোহার মতো চীনপাহী কম্যুনিস্টও।

এটি কোন কাকতালীয় ব্যাপার ছিল না যে, ঢাকায় থাকা বিহারীদের মধ্যে যাদের বামপাহী যোগাযোগ ছিল বা যারাই বাম রাজনীতির ছল করতো তারা সবাই চীনপাহী। তারা পাকিস্তানি সামরিক জাতাকে সাহায্যও করতো কিন্তু এরপরও নিজেদের প্রগতিশীল ভাবতো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে চীনের ভূমিকার কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, বিশেষত চীনপাহী বামপাহীরা ব্যাপক নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়ে যান। বদরুদ্দীন উমর সহ অনেকে প্রকাশ্যে শীকার করেন ১৯৭১ সালে তারা থেকে হারিয়েছেন

তা আবার ফিরে পেতে বহু বছর লেগে যাবে। কিন্তু চীনের সাথে বক্রত্তের বিষয়ে
বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ ধাকায় এসব রাজনৈতিক যতোনিন অপেক্ষা করতে
হবে বলে তারা ভেবেছিলেন তার অনেক আগেই দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে
ওঠেন।

যত যাই হোক এটি শীকার করতে হবে যে প্রকৃত চীনপক্ষী বামদের রয়েছে ত্যাগ
শীকার করার দীর্ঘ ইতিহাস। এদেরকে যে ছাত্রা সমর্থন করতো তারা ছিল যোদ্ধা
প্রকৃতির এবং আদর্শবাদী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদানকে
অবশ্যই শীকৃতি দিতে হবে।

একটি নতুন বিশ্ব

২৬ মার্চ ১৯৭২ দেশের স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তিতে মুজিব জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেছিলেন: ‘আমাদের শপ্ত হলো একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা। আমরা একটি সফল সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের সকল নীতি ও উদ্দেশ্য নেয়া হবে এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য।’

ঐ তারিখে বাংলাদেশ সরকার পাটকল, তুলাকল, টেক্সটাইল মিল, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীকরণ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সকল পাকিস্তানি সম্পদের দায়িত্ব নেয়। যে ৫১১ টি পাকিস্তানী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানিরা এদেশে ছেড়ে যায়, তার মধ্যে ১১১ টি যেগুলোর প্রতিটির সম্পদের পরিমাণ ১.৫ মিলিয়ন টাকার বেশি সেগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। তবে ব্যাংক, বীমা ও চা শিল্পে মার্কিন ও ব্রিটিশ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ উদ্দোগের বাইরে রাখা হয়েছিল। চা শিল্পে প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলে ব্রিটিশ মালিকানাধীন ছিল এবং এ শিল্পটি ছিল কংগ্রেস। কিন্তু বিদেশী মালিকানাধীন শিল্পগুলোর জাতীয়করণ ছিল একটি দার্জানৈতিক সিদ্ধান্ত। পাকিস্তানিরা যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়েছিল সরকারের সেগুলোর মালিকানা নিয়ে পরিচালনা করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না, কিন্তু সরকার যদি ব্রিটিশ ও মার্কিন মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকেও জাতীয়করণ করতো তাহলে তারা বিশ্ব ব্যাংক ও অধিকাংশ রাষ্ট্রের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার অযোগ্য হয়ে যেত।

একটি ব্রিটিশ ব্যাংকে জমার পরিমাণ অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

বাঙালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা আশা করেছিলেন স্বাধীন দেশে তারা আগের চেয়েও বেশি লাইসেন্স ও পারামিট পাবেন এবং ব্যবসায় ও শিল্প আরও বেশি মাত্রায় যুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু তারা পাকিস্তানের ফেলে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা পালনি। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাঙালীর যেসব প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ১.৫ মিলিয়ন টাকার বেশি ছিল সেগুলোও সরকারের জাতীয়করণের উদ্দোগ থেকে বাদ পড়েনি।

অল্পকিছু বাঙালী পুঁজিপতি পাট ও তুলা শিল্পে ব্যবসায় জড়িত ছিলেন, এবং শেষ পাঁচ থেকে ছয় বছরে উন্নতি করেছেন এমন কিছু ‘পৃষ্ঠপোষকতা’ প্রাপ্ত শিল্পপতি ছিলেন। কোন শিল্পায়নের কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের উদার সরকারী সাহায্য প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এটি ছিল অচিন্তনীয়।

এতোগুলো শিল্প জাতীয়করণের ফলে সরকারের ওপর বিশাল ব্যবস্থাপনার বোঝা চেপে বসে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে অধিকাংশ উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন অবাঙালীরা। উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ে কাজ করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ বাঙালী ব্যবস্থাপকের অভাব ছিল। এমনকি দক্ষ শ্রমিকেরও অভাব

ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই সাবেক মালিক বা ব্যবস্থাপকদেরকেই জাতীয়করণ হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ফলে স্বভাবতই এসব ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যতটা সম্ভব সম্পদ পাচারের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এটি ছিল শেয়ালের কাছে মুরগী পাহাড়া দেয়ার দায়িত্বের মতো।

জাতীয়করণ হওয়া এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের কাজ তদারকি করার মতো কোন কর্তৃপক্ষ থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের এমনকি কোন সম্পদের তালিকাও তৈরি করা হয়নি।

মুজিব এসব ব্যবস্থাপকদের প্রতি ‘দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ, যারা এই জাতীয়করণ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন মালিক তাদের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করার সময় দেশপ্রেমের নমুনা দেখানোর’ আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কিন্তু এদের মধ্যে কারও কারও পক্ষে দ্রুত ধনী হওয়ার লোড এড়ানো সম্ভব হয়নি।

আওয়ামী লীগাররা দাবি করেছিলেন শিল্পসমূহের জাতীয়করণ ছিল সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটি পদক্ষেপ। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে এগিয়ে যাওয়া হিসেবে দেখা গেলেও এটি কোন ক্রমেই সমাজতন্ত্র নয়। এমন কি পুঁজিবাদী দেশ সম্মহেও রাষ্ট্র কোন বিশেষ শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতীয়করণ করে থাকে। যেমন, ১৯৪৯ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি সেদেশের ইস্পাত শিল্পকে জাতীয়করণ করেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বাণিজ্যের সুফল সাধারণ ভোকা পর্যন্ত পৌছায়নি। শাধীনতা পরবর্তী কালে সরবরাহের যে সংকট ছিল, ব্যবসায়ীরা ‘সেই সরবরাহ সংকট থেকে সর্বোচ্চ মূল্যায়’ করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) এ উল্লেখ ছিল: ‘রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো কোন সংকটকালীন উচ্চ মূল্য না রাখলেও, এর সুফল ভোগ করেছেন মধ্যস্থত্বভোগীরা।’

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা আছে ‘অনুপার্জিত আয়কে নিরুৎসাহিত করতে হবে।’ সরবরাহ, নির্মাণ এবং বিদেশি পণ্যের ইনডেক্টিং এর ক্ষেত্রে ‘অনুপার্জিত আয় ভোগ করার সুযোগ’ তখনো বিদ্যমান ছিল। কিছু বাঙালী আয় সময়ের মধ্যেই ধনী হয়ে গিয়েছিলেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা তাদের এই নতুন পাওয়া বিত্ত দেখাতেও পছন্দ করতেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও বলা ছিল, ‘প্রকট অভাবের সময় তাদের বিলাসীতাপূর্ণ জীবন-গাপন পক্ষতি সমাজে উত্তেজনা সঞ্চার করে এবং এর ফলে সমাজে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ‘প্রদর্শন প্রভাব’ ছড়িয়ে পড়ে।

ক্রান্ত ফেনো বলেছিলেন, ‘জাতীয় মধ্যবিত্ত তার ঐতিহাসিক ভূমিকা বুঝে নেয়-সেটি হলো মধ্যস্থত্বভোগীর ভূমিকা।’ একটি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার জন্য এটি বিশেষভাবে সত্য।

অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান একটি উপনিবেশ ছিল। প্রধান ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর মালিকানা ছিল প্রায় এককভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। এমনকি খাটের দশকে যখন বাঙালী যথেষ্টে পরিমাণে আমদানী লাইসেন্স পাছিলেন তখনে তারা এসব লাইসেন্স অধিকাংশ সময় পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছেই বিক্রি করে দিতে চাইতেন। এর ফল ছিল স্বাধীনতার পরে বুব অল্প কয়েকজন বাঙালী ছিলেন যারা ততোদিনে নিজেদের আমদানীকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। স্বাধীনতার পরে প্রতিটি থানায় দশ জন করে এই হিসেবে সারাদেশে বিপুল পরিমাণ আমদানী লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছিল, এসব লাইসেন্সের মূল্যমান ছিল ১,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা। এটি ছিল এক ধরণের রাজনৈতিক প্রগোদ্ধনা, কিন্তু যাদের লাইসেন্স কর্য মূল্যমানের ছিল তাদের পক্ষে কোন কিছু এক আমদানী করা সম্ভব ছিল না। এসব লাইসেন্স মধ্যস্থতৃতোগীদের মাধ্যমে হাত বদল হয়েছিল। এসবের ফলে আমদানী করার ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব হয়েছিল এবং এর ফলে মূল্য বৃক্ষি ঘটেছিল।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ছিলেন সে সময় পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, তিনি সহ কমিশনের অন্য তিনি সদস্য রেহমান সোবহান, মোশাররফ হেসেন এবং আনিসুর রহমান তারা সবাই ছিলেন প্রধ্যাত অর্থনৈতিকবিদ। শুধু দৌর্ঘম্যেয়াদী পরিকল্পনাই নয় তাদের সশঙ্ক সংগ্রামের মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের নিত্য দিনের সমস্যাও সমাধানের কথা ভাবতে হচ্ছিল। ডেপুটি চেয়ারম্যানের মর্যাদা যত্নী পর্যায়ের এবং সদস্যদের মর্যাদা প্রতিমন্ত্রীর পর্যায়ের হলেও আমলাদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে তারা নানা ধরণের সমস্যার মোকাবেলা করছিলেন।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম রাজনৈতিক অর্থনৈতি সংক্রান্ত তার চমৎকার গবেষণাপত্র ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ-এ লিখেছিলেন, ‘পরিকল্পনা কমিশনকে ব্যাপক দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আমলাতত্ত্ব পরিকল্পনা প্রতিক্রিয়ার উপর যথার্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল।’

পরিকল্পনা এমন একটি ক্ষেত্র যার সাথে বহু ধরণের বিষয় জড়িত থাকে। কিন্তু মুজিব চারজন অর্থনৈতিকদেরকেই এখানে শীর্ষ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন কারণ এরা সবাই মুক্তির সংগ্রাম চলাকালিন তার উপদেষ্টা ছিলেন।

যেহেতু সে সময় মুজিবের সিঙ্কান্তই চূড়ান্ত ছিল, তাই পরিকল্পনা কমিশন অন্য কোন মন্ত্রীর সাথে স্বাক্ষর গড়ে তোলার ব্যাপারে মনোনিবেশ করেনি। অধ্যাপক নুরুল ইসলামের মতে, ‘অন্যান্য মন্ত্রীদেরকে কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী মনে হয়নি, এবং তারা তাদের সকল রাজনৈতিক সিঙ্কান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখাপেক্ষী ছিলেন।’ কিন্তু এক সময় পরিকল্পনা কমিশন বুঝতে পেরেছিল যে মন্ত্রণালয়গুলো চাইলে প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্কান্তের বাস্তবায়ন বিলম্বিত করতে পারে, এমনকি

সিদ্ধান্তগুলোকে ফলাফলশূন্য করতে পারে। মুজিব নিজে বিপ্লবী পরামর্শসমূহকে স্বাগত জানালেও, তার দলের মধ্যে রক্ষণশীল অংশের উপরে নিজের কর্তৃত খাটাতে ঝুঁক উদ্যোগী ছিলেন না।

পরিকল্পনা করা 'যতটা না একটি অর্থনৈতিক কৌশল তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া।' পরিকল্পনাকারীরা এটা ধরে নিয়েই এগোছিলেন যে সরকার 'বিবর্তনশীল সমাজতন্ত্রে' বিশ্বাসী এবং মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে অন্তর্ভুক্তীকালের জন্মাই। কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্ত লোকই সমাজতন্ত্রের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন বা জানতেন তারা আসলে কি চান।

পরিকল্পনা কমিশনের সাথে মুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্ভবত আনিসুর রহমানক সবচেয়ে একনিষ্ঠ ছিলেন, তিনিই সবার আগে যোহমুক্ত হন। পরিকল্পনা কমিশনে যোগ দেয়ার এক বছরের মধ্যেই তিনি কমিশন ছেড়ে দিয়ে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। পরবর্তীতে ঘোশার রফ হোসেন এবং রেহমান সোবহানও পরিকল্পনা কমিশন ত্যাগ করেন।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এরপরও পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'একাডেমিক' যুগের অবসান হয়েছিল এখানেই।

শতাব্দীন সহায়তা হলো নির্জলা যিষ্যা। সহায়তাগুলো মূলত ঝণ; এবং ঝণ সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ প্রবাদ-ঝণ কৃষককে তিকিয়ে রাখে, গেভারে জল্লাদের দড়ি তিকিয়ে রাখে ফাঁসির আসামীকে। যে কোন মুহূর্তেই এট ফাঁসির দাঢ়ি গলায় ঠংটে বসতে পারে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল তা অধিকাংশ সহায়তা এহণকারী দেশের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

সহজ শর্তের ঝণ সহজে পাওয়া যায় না, এবং কঠিন ঝণের সুন্দর দ্রুত বাড়তে থাকে। বিদেশী সাহায্য পাওয়া দেশগুলো ঝণের হাত থেকে মুক্ত না হয়ে বরং আরও বেশি করে ঝণের জালে জড়িয়ে পরে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানে বিদেশী সাহায্য যে ভূমিকা রেখেছে তার দিকে ইঙ্গিত করে প্রথ্যাত ফরাসী অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ফর্নার ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'বিদেশী সাহায্য এবং উপদেষ্টা গ্রহণ করতে অবীকৃত জানালে তা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকারক হবে কি না।'

দেশ সাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ সরকার যেসব রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তাদের কাছ থেকে কোন ধরণের সাহায্য নেয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছিল। এর অর্থ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সহায়তা না নেয়া এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য সংকুচিত অর্প সরবরাহ। বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম সদস্যদের একজন আনিসুর

বহমান মনে করেন 'বৈদেশিক' 'সহায়তা সংক্রান্ত এই বৈপ্লবিক নীতি' অনুসরণ করা সম্ভব হলে 'দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো বদলে যেত এবং এর ফলে পুরো সমাজের চিত্তও পাল্টে যেত।'

শাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ একটি গুরুতর অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে ছিল। বঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য এমনকি আগ ও পুনর্বাসনের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন সে চাহিদাটুকুও ঘোটানোর জন্য অপ্রতুল ছিল। ওয়েন ডাইলকে বলেন, 'বাংলাদেশের শাধীনতার পর প্রথম বছরে ভারত দেশটিকে উদারভাবে যে সহায়তা দিয়েছিল তা গরীবের পক্ষ থেকে গরীবকে সহায়তা করার বিরল দৃষ্টান্ত ছিল।' এটি একটি অহঙ্কারী উক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৭১ সালেই ড. অর্জুন সেনগুপ্ত দেখিয়েছিলেন যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কটি 'ঝণ সহায্য দাতা বা উপদেষ্টার সম্পর্ক হতে পারে না। ১৯৭২ সালে মুজিব যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে যান তখন তাকে ব্যাপক সমাদর ও শুরু দেখানো হলেও তারা জানিয়ে দেয় বাংলাদেশের যে বিপুল সহায়তা দরকার তা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

১৯৭২ সালে বিশ্ব ব্যাংকের নেতৃত্বাধীন দাতাগোষ্ঠীর একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করে। পাকিস্তানের ঋণের দায়ের একটি অংশ যদি বাংলাদেশ বহন করতে রাজি না হয় তবে ঐ দাতা গোষ্ঠীর পক্ষে বাংলাদেশকে সহায়তা দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে বলে প্রতিনিধি দলটি জানিয়ে দেয়। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পদ ও দায়ের বিষয়ে কোন মীমাংসায় না পৌছে বাংলাদেশের পক্ষে তাদের ঋণের কোন অংশের দায় নেয়া সম্ভব ছিল না।

দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি দলটিকে মুজিব বলেছিলেন, 'আমি জানতে পেরেছি আপনারা আমাদের যে কোন সহায়তা করার জন্য কোন 'ঝণের দায়' নেয়ার শর্ত দিয়েছেন। সেটাই যদি আপনাদের শর্ত হয়, তাহলে আমরা আপনাদের সহায়তা নিতে পারছি না। আমাদের জনগণ রক্ত দিয়ে শাধীনতা অর্জন করেছে; এদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে, টিকে থাকতে হলে তা আমরা সেই শক্তির জোরেই পারবো। আপনাদের ঝণ সহায্য ছাড়াই আমরা তা করতে পারবো।

ড. কামাল হোসেন বাংলাদেশ ও দাতাগোষ্ঠীর মধ্যকার এই সংলাপে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি জানান, 'তিনি সন্তান পর বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষ থেকে চিঠি আসে যাতে জানানো হয় যে ব্যাংক তার অবস্থান পুনর্বিবেচনা করছে, কারণ কর্তৃপক্ষ মনে করছেন বাংলাদেশের অবস্থান অযোক্তিক নয়।' বিশ্ব ব্যাংক আসলে শুধু কালক্ষেপণ করছিল।

বাংলাদেশের শাধীনতা বহু মার্কিনীর অহমিকায় আঘাত হেনেছিল, কিন্তু অনেক মার্কিনীই মনে করছিলেন অর্থ ব্যয় করে প্রভাব বিস্তার করা যাবে। জোসেফ জ্যাফট কোন রাখচাক না করেই এমন বলেছেন। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ তিনি

ইন্টারন্যাশনাল হেরাকুল ট্রিবিউন পত্রিকায় লিখেছিলেন, ‘যদি নিম্নল তার ব্যক্তিগত অহমিকার উর্ধ্বে উঠতে পারেন, তবে মার্কিন অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা, পাকিস্তান ও ভারতের ক্ষমতাসীনদের সাথে আরও মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে। দীর্ঘ যোগাদের বিবেচনায় মার্কিন স্বার্থের বিরোধী শক্তিশালোর নাটকীয় কোন প্রক্রিয়ায় মতায় চলে আসা ঠেকানোর এটিই সবচেয়ে নিশ্চিত উপায়।’

তুমি যদি একজন ব্যক্তিকে একটি মাছ দাও, তবে তুমি তার একবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করলে।

তুমি যদি তাকে মাছ ধরা শিখিয়ে দাও, তবে সে সরায় জীবন খেতে পারবে।’

সাহায্য দানকারী দেশগুলো কখনো সাহায্য প্রদানকারী দেশগুলোর উন্নয়নের কথা ভেবে তাদের সহায়তা করে না। ওয়েন উইলকসনের কাছে দেয়া বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান তার সাক্ষাত্কারে এ বিষয়টি পরিকার করেছিলেন: ‘পশ্চিম আমাদের ক্ষুধার্ত রাখবে না, কিন্তু তাড়া কখনোই প্রকৃত অর্থে উন্নত হতে দেবে না।’

প্রথম দুই বছরে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে সর্বমোট দুই বিলিয়ন ডলার সহায়তার প্রতিক্রিয়া দেয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের জ্ঞান কার্যক্রম (ইউএনআরওবি) এর প্রধান ফ্র্যান্সিস লাকোস্টে ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ বলেছিলেন, বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকার মতো বিশাল ব্যক্তি সম্পর্ক। তার গবিন্দ হওয়া অবশ্যই যথোর্থ। কিন্তু সাহায্যের পরিমাণ বিশাল হলেও তা ছিল প্রধানত পণ্য সাহায্য, যার মধ্যে আবার খাদ্যশস্যাই প্রধান ছিল। ১৯৭৩ সালের ২০ ডিসেম্বর এ ইউএনআরওবি'র উপ প্রধান সূতৰ দন্ত মত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের ধূংসপ্রাণ অধিনীতি পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে এই সাহায্য সামান্যই ভূমিকা রাখতে পেরেছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন প্রায় ৫ মিলিয়ন মানুষ না খেয়ে মৃত্যু বরণ করবে। চট্টগ্রাম সমূদ্র বন্দর অবকল্প থাকা এবং পরিবহন ব্যবস্থা বাধায়ন্ত হওয়ার কারণে বাহু রাষ্ট্রগুলো দ্রুত খাদ্য পাঠালেও তা সঠিক সময়ে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৌছানে কঠিন হবে। যে দুর্ভিক্ষের ভয় সবাই করছিলেন তা ঠেকিয়ে দেয়া গিয়েছিল কেবল জাতিসংঘের জ্ঞান তৎপরতা আর ভারতীয় খাদ্য সাহায্যের কারণে। ১৯৭২- এর সেপ্টেম্বর নাগাদ সবচেয়ে খারাপ সময় শেষ হয়ে এসেছিল। মুজিব এ সময় আশাবাদী ছিলেন। তিনি তখন বাব বাব বলতেন, ‘বাংলাদেশ একটি চমৎকার জায়গা।’ তিনি নিশ্চিত ছিলেন বাংলাদেশের একটি স্বর্ণলী ভবিষ্যৎ রয়েছে।

১৯৭২-এর ১৯ সেপ্টেম্বর বিবিসিকে তথনকার অর্দমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের তুলনায় যুদ্ধ বিষয়ত বাংলাদেশ অতি অল্প সময়ে অনেক বেশি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

তাজউদ্দীন হয়তো কথার কথা হিসেবেই যুদ্ধ বিষয়ত বাংলাদেশের সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের তুলনা করেছিলেন। কিন্তু তার কথাটি একটুও অতিরিক্ত ছিল না।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২-এ লন্ডনের ফাইনালিয়াল টাইমস পত্রিকায় ছাপা হয়, 'বাংলাদেশের প্রধান রণানী পণ্য পাট আশাতীত দ্রুত গতিতে রণানী হচ্ছে। কারখানাগুলো কাজ করছে। একদম শূন্য অবস্থা থেকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ৭০ মিলিয়ন পাউন্ডে নিয়ে আসা হয়েছে।' বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের শতকরা ৯০ ভাগ এসেছিল বাণিজ্য থেকে আসা উভ্যত থেকে। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ নাগাদ দেশের পাটকলগুলো তাদের আগের উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং চট্টগ্রাম সিল মিল 'আগের উৎপাদনের রেকর্ড তেক্ষে দিয়েছিল।'

বাংলাদেশ রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে তেক্ষে পড়বে এবং এর ফলে একটি নেরাজ্য তৈরি হবে বলে যে সাধারণ আশঙ্কা ছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯৭৩-এর ২১ ডিসেম্বরে লন্ডনের নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'প্রসপেক্টস অফ বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে মাইকেল বার্নস বলেছিলেন, 'এই মুহূর্ত পর্যন্ত 'বঙ্গবন্ধু' নিজেই বাংলাদেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। শেখ মুজিবের গতিশীলতা এবং ক্যারিশমা এখনো বিদ্যমান, হয়তো দেশের সমস্যা জর্জরিত অবস্থার কারণে এগুলো কিঞ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারপরও এগুলোর কারণেই এখনো তার দেশের জনগণ ঐক্যবন্ধ আছে। সামনে যে বিপদজনক এবং কঠিন সময় আসছে সে সময়ে বাংলাদেশের মানুষের মুজিবের নেতৃত্ব খুবই দরকার হবে।'

সামনে সত্যিই কঠিন সময় অপেক্ষা করছিল।

অন্তর্জাতিক ছায়া

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ জন সোয়েইন সানডে টাইমস পত্রিকায় ছাপা লেখায় চিন্তিত হয়ে লিখেছিলেন, ‘বাংলাদেশ কি ভুল সময়ে জন্ম নিয়েছিল?’ সোয়েইন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেননি। তার লেখার শিরোনামটি ছিল তাকে দেয়া বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের বক্তব্য: ‘বিধ্বন্ত অর্থনীতিটি পুনরুদ্ধারের জন্য যে সময় ও সুযোগ দরকার ছিল তা বাংলাদেশ কখনো পায়নি। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কারণে দেশের উৎপাদন বিধ্বন্ত হয়ে গিয়েছিল এবং অবকাঠামোগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে খরা হয়েছিল এবং আগের বছর বিশ্ব বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যদ্বারা মূল্যবৃদ্ধি ছিল আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশ একটি ভুল সময়ে জন্ম নিয়েছিল।’

শাধীনতার পরের প্রথম তিন বছর যে বিপুল সংখ্যক সমস্যার মোকাবেলা বাংলাদেশকে করতে হয়েছিল এগুলো তার ক্ষিমদংশ যাত্র।

ভয়াবহ বন্যার কারণে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন সেপ্টেম্বর থেকে পিডিয়ে ডিসেম্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১৯৭০ সালে যে প্রলয়করী সাইক্রোন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হেনেছিল তার আঘাতে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন প্রাণহানি ঘটেছিল এবং এটি শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ ছিল। পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর তাওবনীলায় সারা বাংলাদেশ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী পাক বাহিনী বাংলাদেশের ১১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছিল। এই হিসাবে অবশাই ‘গুণগত ক্ষয়ক্ষতি হিসেব করা যায়নি এবং উৎপাদন আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যবর্তী সময়ে যে ক্ষতি হয়েছে সেটিও হিসাব করা হয়নি।’ শাধীনতার পরে দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি খাতের ছিল বেহাল অবস্থা। সে সময় কৃষিতে ব্যবহৃত পত্র, সার, সেচ পাস্প এবং এমন কি বীজেরও অভাব ছিল এবং দেশের মুদ্রা তহবিলও ছিল শূন্য।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানবিক দিকটি: তখন এমন একটি পরিবার খুঁজে পাওয়াও কঠিন ছিল যুক্তে যারা কিছু হারায়নি।

বাংলাদেশের প্রধান দুটি ফসল ‘আউশ’ ও ‘আমন’ এর ফলন বাধাগ্রান্ত হয়েছিল ১৯৭২/৭৩ সালের উপর্যুক্তির খরা এবং বন্যার ফলে। এসবই ঘটেছিল দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কৃষিকাত যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তা কাটিয়ে ওঠার আগেই। কিছু সাংবাদিক সে সময় বাংলাদেশকে দুর্যোগে অভ্যন্ত দেশ বলেছিলেন। বাঙালী তাদের প্রবল ইচ্ছাক্ষেত্রে জোরে অনেক দুর্যোগ মোকাবেলা করেতে এটি সত্তা, কিন্তু একটি দেশ কখনোই দুর্যোগে অভ্যন্ত হয়ে যায় না। প্রতিটি দুর্যোগই তাদের দুর্বলতর করে এবং পুনরুদ্ধার আগের চেয়েও কঠিনতর হয়ে যায়। প্রাকৃতিক বা

মানবসৃষ্ট দুর্যোগের হাত থেকে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সাল সময়কালে বাংলাদেশ একটুও বিশ্রাম পায়নি। এই সব কিছুর উপরে ১৯৭৪ সালে এদেশকে আবার বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর মুদ্রাক্ষৰ্ণিতির মোকাবেলা করতে হয়েছিল। এসব অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

১৯৭২ সালে জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যকার সম্পর্ক যা এর আগের ২০ বছর যাবত 'আবাক করার মতো স্থিতিশীল ছিল' সেটি বিশ্ব ব্যাপী খাদ্য সংকটের কারণে অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। কোয়েস্টিন এম. ওয়েস্ট এর মতে দুটি কারণে এ সংকট ঘনিষ্ঠুত হয়েছিল: 'জ্বালানী সংকট এবং মানুষের ব্যচেলতা। ওয়েস্টের মতে, 'জ্বালানী সংকট অতি সাম্প্রতিক বিষয় হলেও, বিশ্ব জুড়ে আয় বৃক্ষির সংকট বহুদিন ধরেই ঘনিষ্ঠুত হচ্ছিল।' ১৯৭৩ সালে খাদ্য উৎপাদন বাড়লেও উচ্চ চাহিদা আর নিম্ন সরবরাহের কারণে তখনো খাদ্যের উচ্চ মূল্যই বহাল ছিল। ওয়েস্ট খারণা করছিলেন কিছু কিছু দেশের খাদ্য পরিস্থিতির উপর এই জ্বালানী ও সারের সংকটের সম্ভাব্য প্রভাব হবে ভয়াবহ। 'কিন্তু' তিনি বলেছিলেন, 'এগুলো এবং অন্যান্য সমস্যার ফলে একটি ব্যাপক খাদ্য দুর্যোগ ঘটার সম্ভাবনা নেই। কৃষিক্ষেত্রে কোন মহাপ্রলয় ঘটতে যাচ্ছে না। বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে...'।

১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বিশ্বে কোন খাদ্য ঘটিতি ছিল না, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছিল না এবং বাজারে খাদ্যের সরবরাহ ছিল না; আর পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এসব দেশেই বাস করত। বিশ্বের প্রধান খাদ্য রপ্তানীকারকরা জ্ঞান যে তাদের কাছে যথেষ্ট খাদ্যশস্য আছে এবং তারা খাদ্যের জরুরী চাহিদা আছে এমন ৩২ টি দেশে ৭.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য পাঠাতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এই ৭.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্যের দাম পড়বে ১৮,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থ কোথা থেকে আসবে?

১৯৭৪ সালে ক্ষুধার কারণে এক মিলিয়নেরও বেশি লোকের মৃত্যু হতে পারে বলে প্রাক্তন করা হয়েছিল, কিন্তু বিশ্ব খাদ্য সম্পদে 'জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যে আন্তঃদেশীয় প্রতিষ্ঠান গুলো ছিল সেগুলোকে মজবুত করার জন্য মাত্র ৫,০০,০০০ টন খাদ্য একটি আন্তর্জাতিক খাদ্য মজবুত গুভেচ্ছা হিসেবে দেয়ার প্রস্তাবও নাকচ করে দেয়।

মুক্ত বাজারের নৈরাজ্যকর অবস্থায় দন্তিম দেশগুলোই ভুক্তভোগী হয়েছিল।

এফএও-এর মহাপরিচালক ড. আন্দেকে বোয়েরমা ১৯৭৪ সালে বলেছিলেন, 'বিশ্ব খাদ্য সম্পদের যে সমস্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্ব কৃষি বাজারে অস্থিতিশীলতা এবং তাদের কৃষি রপ্তানি পণ্যের উপর বিস্তৃত রকম ট্যারিফ ও নল-ট্যারিফ বাধা থাকার কারণে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন

হচ্ছে। যেহেতু এসব দেশ তাদের নিজেদের খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য আমদানী করতে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য কৃষি রপ্তানি আয়ের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, তাই বিশ্বের বর্তমান খাদ্য সংকটের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে বলতে হবে।'

একদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো আগের চেয়ে দুই থেকে তিনগুণ দাম দিয়ে তাদের মৌলিক আমদানীগুলো করছিল, অন্যদিকে তাদের রপ্তানীকৃত পণ্যের দাম সেভাবে বৃক্ষ পায়ানি এবং ক্ষেত্র বিশেষে করেছিল।

বাংলাদেশের প্রথম পদ্ধতিবাচিকী পরিকল্পনার প্রথম অর্থবছরে, অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশটির রপ্তানী আয় ধীরে ধীরে বাঢ়ছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য শস্য, ভোজ্যতেল, সার, পেট্রোলিয়াম ও কিটনাশকের মতো প্রয়োজনীয় আমদানী পণ্যগুলোর দাম খুব দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। অশোধিত তেলের দাম রাতারাতি ব্যারেল প্রতি ২.৩৪ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১১.০০ মার্কিন ডলার হয়েছিল এবং খাদ্যশস্যের দাম টন প্রতি ৭৮২ টাকা থেকে ১৬০০ টাকা হয়েছিল। পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত বেড়েছিল।

সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের 'পণ্যসমূহের দ্রুত মূল্য বৃক্ষির বা অপ্রাপ্যতার প্রভাব মোকাবেলা করার মত' কোন খাদ্য মজ্জুদ বা বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈশ্বিক মুদ্রাক্ষীতি এবং প্রতিকূল ভারসাম্যের সম্প্রিলিত প্রভাব ছিল মারাত্মক।

জেরাল্ড এ. পোলক ১৯৭৪ সালে তার 'দি ইকোনোমিক কনসিকোয়েন্সেস অফ দ্য এনার্জি ক্রাইসিস' প্রবন্ধে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'এই দেশগুলোকে তেল আমদানীর জন্য যে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হচ্ছে সে অর্থ আসছে তাদের মূলধনী যত্নাদি কেনার অর্থ থেকে, এর ফলে ভবিষ্যতের প্রবৃক্ষের সম্ভাবনা ত্যাগ করতে হচ্ছে, এবং অতিরিক্ত মূল্যের কারণে তারা যতেওঠুকু তেল আমদানী থেকে বিরত থাকছে তার ফলে তাদের বর্তমান জাতীয় আয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই অক্ষকার মহাদেশটির পূর্বভাগ আরও বেশি অক্ষকারে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে এবং উপমহাদেশের দেশগুলোকে আর 'উঠে আসতে থাকা' বলে বিশেষায়িত করা যাবে না।'

বাংলাদেশ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভাজনে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং ক্রমেই নৈরাজ্যের মধ্যে পতিত হবে বলে যে সাধারণ আশঙ্কা ছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

'দেশটির স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী যখন এগিয়ে আসছে' বোস্টন থেকে প্রকাশিত ক্লিনিয়ান সাইল্স মনিটর পত্রিকায় ১৮ অক্টোবর ১৯৭২ এ ছাপা হয়েছিল, 'যে সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে বাংলাদেশ একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে টিকতে পারবে না, তারা ক্রমেই স্বল্প প্রমাণিত হচ্ছেন।' আইন শৃঙ্খলা

পরিষ্কৃতি ভেঙে পড়েন। ফ্র্যাক্ষুটের ডাই ওয়েল্ট পরিকার একজন প্রতিনিধি ৮ ডিসেম্বর ১৯৭২-এ তার প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, ‘যে কেউ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার রাস্তায় নির্বিপ্রে হাঁটতে পারেন, এমন কি রাতের বেলায় ফ্র্যাক্ষুটের রাস্তায় হাঁটতে গেলে যতোটা ডয় কাজ করে এখানে তার চেয়ে বেশি নয়, এবং নিউইয়র্ক শহরের অনেক এলাকার থেকেও এসব শহর তুলনামূলক নিরাপদ।’ এই প্রতিবেদক আরও লিখেছিলেন, ‘এই আশ্চর্য ঘটনার সবচেয়ে বাস্তব ব্যাখ্যা নিচয়ই মুজিব। এই রাষ্ট্রটিকে তিনিই ধরে রেখেছেন।’

দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যেই যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল সেটি ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেলের বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। কিছু কিছু বামপন্থী গোষ্ঠী এই সংসদীয় গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া ধারণা বলে প্রত্যাখান করেছিল। কিন্তু তাদের এই প্রত্যাখানের মধ্যে রাজনৈতিক একনিষ্ঠতার চেয়ে রাজনৈতিক কৌশলই বেশি ছিল, কারণ মুজিব সুব দ্রুতই যে নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেখানে এসব গোষ্ঠীর ভালো ফল করার সম্ভাবনা ছিল বুবই ক্ষীণ।

মুজিব সব সময়ই তার কথা রাখতেন। নতুন সংবিধানের আওতায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ তারিখে, এটি ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার ১৫ মাসের মধ্যে এবং ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ এই ঐতিহাসিক ভাষণ মুজিব যেদিন দিয়েছিলেন তার ঠিক দুই বছর পর।

কিছু বিরোধী দল দাবী করতে থাকে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কেবল প্রাদেশিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল এবং এর ফলে স্বাধীন দেশে আওয়ামী লীগের সরকারকে তারা প্রশ্ন সাপেক্ষ বলে মনে করছিলেন। মুজিবও দেশবাসীর কাছ থেকে নতুনভাবে মনোনীত হতেই আগ্রহী ছিলেন। তিনিই প্রথমে কিছু আসন বিরোধী দলগুলোর জন্য ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন কিছু বিরোধী গোষ্ঠী তার সমালোচনায় আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে তখন তিনি একটি ঝড়ো নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন ১৯৭০ সালে। যেখানেই মুজিব যেতেন সেখানেই প্রচুর মানুষের ডিঙ্গ জয়ে যেত। জনগণের উপর তার যাদুকরী ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাজ করছিল এবং তিনিও তাই চাঞ্চলেন।

৭ মার্চ ১৯৭৩ সালে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিষ্কৃতি নিয়ে লিখেছিল, ‘আগামীকাল বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন নিয়ে যে একটি মাত্র বিষয় নিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ভাবিত হতে পারেন তা হলো তার দল আওয়ামী লীগ হয়তো ৩০০ টি সংসদীয় আসনেই সহজ জয় পেয়ে যেতে পারে।’ আরও লেখা হয়েছিল, ‘মুজিব হয়তো এ রকম ঘটলে এক ভাবে বুশি হতে পারেন যে এর ফলে প্রমাণিত হবে তার দেশের মানুষ তাকে

তত্ত্বাত্মকভাবে যতোটা তিনি নিজে তাদের ভালোবাসেন (যেমনটি তিনি নিজে প্রায়ই বলে থাকেন)।

প্রতিটি নির্বাচনী পোস্টারেই মুজিবের একটি বড় ফটোগ্রাফের সাথে সংসদীয় আসনের প্রাথীর ছোট একটি ফটোগ্রাফ ছিল।

জাতীয় সংসদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯১ টিতে অঞ্চল করেছিল। মুজিবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই নির্বাচনের নির্ধারক বিষয় ছিল। এমনকি অনেক অজনপ্রিয় আওয়ামী লীগের প্রাথীও জয় পেয়েছিলেন। মুজিবের যাদুকরী ব্যক্তিগত জনগণ ঐ সব প্রাথীর ক্ষেত্রগুলোর বিষয়ে অক্ষ করে দিয়েছিল। ঠিক ১৯৭০ সালের মতই তারা মুজিবকেই ভোট দিয়েছিলেন। এটি ছিল মুজিবের জন্য একটি ব্যক্তিগত বিজয়, তার প্রতি জনগণের আস্থা পূর্ণব্যক্ত হয়েছিল। মুজিব-বিরোধী শক্তি, যারা মুজিবকে ছোট করতে চাইছিল তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল।

কিন্তু, আওয়ামী লীগের জন্য হয়তো এ বিজয়টি একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর করতে হলে অন্তত একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা বাছনীয়। কিন্তু সংসদে কোন বিরোধী গোষ্ঠী পর্যন্ত তখন অনুপস্থিত ছিল। আওয়ামী লীগ নেতারা তখন আগের চেয়েও বেশি আত্মতৃষ্ণিতে ভুগতে শুরু করেন।

জনগণ মুজিবকে ব্যাপক সমর্থন দিয়েছিল। এরপর কি?

সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত সানডে মেইল পত্রিকায় ১১ মার্চ ১৯৭৩ এ ছাপা হয়েছিল, ‘শেখ নিজে একজন সাহসী এবং বৃক্ষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তি হিসেবে তাকে যথেষ্ট জন সমর্থন দেয়া হয়েছে, এর জোরে তার এখন বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন করতে পারা উচিত। এমন কি এজন্য তাকে নিজের দলকে নাড়িয়ে দিয়ে হলেও।

তিনি কি তাই করতে যাচ্ছিলেন?

মুজিব রাজনীতির কবি ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে কি একজন কৌশলী প্রশাসক যিনি প্রয়োজনে কঠোর হতে পারেন এমন গুণগুণ ছিল? তিনি অনেক সাহসী ছিলেন সদ্বেহ নেই, কিন্তু নিজের জনপ্রিয়তা কমিয়ে দিতে পারে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো কি তার মানসিক শক্তি ছিল?

যাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের সহায়তা করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল এবং যারা এ সদ্বেহে আটক ছিলেন তাদের সবাইকে দেশের দ্বিতীয় বিজয় দিবসের দিন ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর মৃত্যু দেয়া হয়েছিল। মুজিব বলেছিলেন বাংলাদেশের সরকার প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।

জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম শীগের মতো সাম্প্রদায়িক দলগুলোর উপর নির্বেদাজ্ঞা তখনো বহাল ছিল। কিন্তু সবুর খান, খাজা খায়েরউদ্দীন এবং অন্য যে সব নেতা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ মৃত্যি পেয়েছিলেন তারা আবার সজ্জিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে ৩১৮৬ টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম শীগ ও আরও কিছু দল ফেরত আসে। যদিও এসব দলগুলো ১০ থেকে ১৫ ভাগের বেশি আসনে জয় পায়নি, তবুও স্বাধীনতার মাত্র দুই বছর পরই তাদের উচ্চান চিন্তার উদ্বেক করার মতো ছিল।

ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনের একটি সাত সদস্য বিশিষ্ট দল ১৯৭৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে ২২ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত ব্য ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে রাজি করানো এবং ‘বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে এক্যাকে উৎসাহিত করা’।

মুজিব জোর দিয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ‘একে অপরকে স্বীকৃতি দিয়েছে’। এরপরও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টির উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। পাকিস্তান যেদিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ঢাকায় সেদিন উল্লাস কর হয়েছিল। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ অবজারভারে লেখা হয়েছিল, ‘কৌশলগত বিবেচনায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ স্বীকৃতি পাওয়ায় এখন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দৃঢ়তর হয়েছে।’

স্বাধীন হওয়ার দুই বছর পরে এবং একশোটিরও বেশি দেশের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পরও পত্রিকাটির মনে হয়েছিল কেবল পাবিত্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পরই বাংলাদেশের অবস্থানটি নিরাপদ হয়েছে। এটি ছিল খুবই হতাশাজনক।

খুব ছোট একটি গোষ্ঠী মনে করতো যে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি বিলিহিত হলে সেটি ‘বাংলাদেশের মতাদর্শিক ভিত্তি দৃঢ়তর’ হওয়ার জন্য সহায়ক হবে। লক্ষণ থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ নিউজলেটার এই মত সমর্থন করছিল, তাদের মতে এই স্বীকৃতি পাওয়ার ‘প্রথম ও অনিবার্য’ ফল হবে ‘ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক রেষারেবির বাঁধ খুলে দেয়া।’ এরকম আশঙ্কা করার মতো কারণ ছিল। কিন্তু পত্রিকাটিতে যখন লেখা হয়, ‘আমরা আশা করি মুজিবের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিরোধীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তার প্রবল সমর্থকে রূপান্তরিত হবেন’ তখন তারা ভুল করেছিল। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিগুলো পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি থেকে নিজেদের শক্তি পেয়েছিল এবং ১৯৭৪-এর এপ্রিলে ঢাকায় ভূষ্ণে যে অফলপ্রস্তু সফর করেছিলেন তার পর তাদের মুজিব বিরোধিতা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

মুজিব গুরুতর ত্রুটিয়াল ইনফেকশনে ভুগছিলেন, এবং এ কারণে ১৯ মার্চ ১৯৭৪-এ আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো ও চিকিৎসা গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ সোভিয়েত বিমানে ঢেকে মক্কোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ব্রাকাইটিসে তিনি অনেকদিন ধরেই ভুগছিলেন। এর এক বছর আগে ওটাওয়াতে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে অংশগ্রহণের সময় তিনি ত্রুটিয়াল ইনফেকশনে ভুগেছিলেন।

কিছু কিছু পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল মুজিবের ক্যাপ্টার হয়েছে। সাংবাদিকরা 'মুজিবের পর কে?' এমন প্রশ্ন করছিলেন। মুজিবের সহকর্মীদের এবং সহযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ মুজিবের মৃত্যুর পর আসন্ন ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ের প্রত্নতি নিছিলেন।

যখন ডাঙ্কারী পরীক্ষার ফলে জানা গেল যে মুজিবের স্থায়গত সমস্যার মূলে ব্রাকাইটিস ও অতিপরিশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, তখন অনেকে ধারণা করেছিলেন মুজিব হয়তো রাজনৈতিক পরামর্শের জন্যই মক্কো গিয়েছিলেন। 'তা না হলে তিনি কেনই বা মক্কো গিয়েছিলেন?' অনেকেই এমন প্রশ্ন করছিলেন। মুজিবের মক্কোকে চিকিৎসার জন্য বেছে নেয়ার পেছনে দৃটি সহজ কারণ ছিল। এর আগে মুজিবের যখন পিণ্ড ধলির অপারেশন হয়েছিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে সেখানে যেতে আমন্ত্রণ জানালেও ততোদিনে লভনে চিকিৎসা করার সব ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছিল। ত্রিটনে অপারেশনের পরে এবং সুইজারল্যান্ডে বিশ্রামের সময় তাকে প্রচুর বাঙালী দর্শনার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল, এদের অনেকে ঢাকা থেকে তার সাথে দেবো করতে সেখানে গিয়েছিলেন। দেশে অথবা ব্রিটেনে তিনি শাস্তিতে থাকতে পারতেন না। কোন কারণে মুজিবের ধারণা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা সেবার মান উন্নততর, সেখানে আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে রোগীকে বিবেচনা করা হয় না। যাই হোক, সবচেয়ে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল এটাই যে সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি ঠিক মতো বিশ্রাম নিতে পারবেন, যা তার খুব প্রয়োজন ছিল।

মক্কো থেকে ফেরার পথে ১০ এপ্রিল ১৯৭৪, মুজিব দিল্লীতে ১৬ ঘণ্টার জন্য যাত্রা বিরতি করেছিলেন। সেখানে তিনি এর একদিন আগে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে যে ত্রিপীয় চূড়ি হয়েছিল সেটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই চূড়ির প্রতি সম্মান দেখিয়ে বাংলাদেশ সেদেশে বন্দী ১৯৫ পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে না নেয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল।

১৯৭৪ সালের মে মাসে মুজিবের পাঁচ দিনের ভারত সফরে ভারত বাংলাদেশের মৈত্রীর সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৭ মে ১৯৭৪-এ দেয়া একটি যৌথ বিবৃতিতে বলা হয় ফারাক্কা প্রকল্প শর হওয়ার আগে তক্ষ মৌসুমে যখন গঙ্গা নদীতে খুব ক্ষীণ প্রবাহ থাকে সে সময় পানির সুব্যবস্থা ব্যবস্থা উভয় দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌছানো হবে।

ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা চিহ্নিতকরণ বিষয়েও একটি প্রকল্পগুর্ণ সিঙ্কান্স এ সময় নেয়া হয়েছিল। দক্ষিণ বেরবাড়ি ইউনিয়নের দক্ষিণ অংশ ভারতের আওতাধীন রাখার সিঙ্কান্স হয়, বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছিল দহস্থাম ও আঙ্গরপোতা এলাকার অধিকার।

মিসেস গান্ধী ও শেখ মুজিব একে অপরের প্রতি 'একটি পুরো প্রজন্ম যে সমস্যার সমাধান নিয়ে হিমশিম খেয়েছে সেটি সমাধান করতে পেরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন।' তাদের কৃতজ্ঞ বোধ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তারা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন দুটি দেশের মধ্যে যে কোন বিষয়েই উভয়ের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌছানো সম্ভব যদি এ জন্য প্রয়োজনীয় সহনশীলতা দেখানো হয়।

কিন্তু ঐ দিন্তী সফরে মুজিবের সঙ্গে থাকা মোতাবক এই চুক্তিতে অবুশি হয়েছিলেন। চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করতে এক থেকে দুই ঘন্টা দেরি হয়েছিল।

একজন সাংবাদিক মুজিবকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'দিন্তী থেকে আপনার ফিরে আসতে কি কারণে বিলম্ব হয়েছে?' মুজিব কৌতুক করে জবাব দিয়েছিলে, 'আমি দিন্তীতে থাকতে পছন্দ করি।'

মাওলানা ভাসানী বেরবাড়ি ইউনিয়ন ভাস্তবে ভারত বাধ্য করেছে এমন অভিযোগ আনেন। তিনি ভারতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যেদিন ভারত এমন কাজ করবে সেদিন তাকে কঠিন ফল ভোগ করতে হবে। দহস্থাম ও আঙ্গরপোতার কথা তিনি সুবিধাজনকভাবে ভূলে গিয়েছিলেন।

২৩ জুন ১৯৭৫, ভূট্টো ঢাকায় যে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তা দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। ১৯৭১-এর মার্চে ঢাকার রাস্তায় জনতা বার বার ঝোগান দিয়েছিল :

শেখ মুজিব, শেখ মুজিব,
ভূট্টোর মুখে লাধি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

এটি দেশে অবাক লাগছিল সেই ঢাকাতেই ভূট্টোকে তিন বছর পর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। হাজারো মানুষ শুধু কৌতুহলের বসেই সেদিন সমবেত হয়েছিল। ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে যখন মুজিব লাহোর সফরে গিয়েছিলেন তখন সেখানেও এমন ভিড় জমে গিয়েছিল।

তবে ভূট্টোকে দেয়া অভ্যর্থনার পুরোটাই স্বতঃকৃত ছিল এমন বলা যাবে না। পাকিস্তান বাংলাদেশকে শীর্কৃতি দেয়ার পর থেকেই স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র ভূট্টোর বাংলাদেশে সফরের প্রস্তুতি নিছিল।

২৪ জুন ১৯৭৫ ভূট্টোর সম্মানে বঙ্গভবনে যে নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ ও তার প্রতিবেশী ভারতের মধ্যে অশান্তির বীজ বপন করতে চায় নলে পাকিস্তান সম্পর্কে অভিযোগ

করা হয়ে থাকে। আমি জনিনা কারা এমন অভিযোগ করে থাকেন। তারা কি জানেন না পাকিস্তান চাইলেও এমন কিছু করতে সক্ষম হতে পারবে না? গত আড়াই বছরে কি আমরা আপনাদের সাথে কোন রকম দেখা সাক্ষাৎ করতে পেরেছি? আমরা কি বাংলাদেশের দৃশ্যপটে অনুপস্থিত ছিলাম না?’

তিনি চোবে পড়ার মতো বেশি বেশি প্রতিবাদ করছিলেন।

তার সাথে সফরকারী দলের সদস্যরা অধিকাংশ সময়েই ভারতের উপস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করছিলেন।

ভুট্টোর সাথে সফর করছিলেন এমন পাকিস্তানি সাংবাদিকদের অনেকের প্রতিবেদনের লেখাই ছিল প্রত্যাশিতভাবে ভারত-বিরোধী। ওয়াজিদ শামসুল হাসান বাংলাদেশ সরকারের ‘প্রতিটি বিভাগেই’ ডি. পি. ধরের লোক আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু যখন সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি পাওয়া সাংবাদিকরাও পাকিস্তানি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সুযোগ পান নি, তখনও এর আগে পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করার ইতিহাস রয়েছে এমন ব্যক্তিরা যখন পাকিস্তানিদের সাথে ভাত্সুলভ দেখা-সাক্ষাৎ করছিলেন তখন গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা সেদিক থেকে নজর সরিয়ে রাখছিলেন।

চীনপঙ্খী বামপন্থীরা হাসানকে বলেছিলেন যে পাকিস্তানের বাংলাদেশকে ছেড়ে কথা বলার দরকার নেই।

পাকিস্তান তখন যত দ্রুত সুরক্ষ বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে অগ্রহী ছিল। ভুট্টো এমনকি তার সাথে করে বাংলাদেশে পাকিস্তানের হবু রাষ্ট্রদূত মাহমুদ হারুনকেও নিয়ে এসেছিলেন, অংশ সম্পদ ও দায়ের বন্ধন প্রসঙ্গে কোন কথা বলতে তিনি অগ্রহী ছিলেন না। তিনি বলেন, ‘আমি আমার সাথে ব্যাংকের চেক বই নিয়ে আসিনি।’

ভুট্টোর সফরের খবর সংগ্রহ করতে ঢাকায় আসা একজন পশ্চিমা সাংবাদিক এ বিষয়ে বলেছিলেন, ‘ভুট্টো কোনকিছু না দিয়েই তার বিনিময়ে কিছু চাইছিলেন।’

১৯৭৩ সালে ভোগ্য পণ্ডের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার ওয়েজ আর্নার্স স্কীম চালু করেছিল। এই স্কীমের আওতায় যে সমস্ত বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে অর্থ উপার্জন করছিলেন তারা দেশে কিছু তালিকাভুক্ত পণ্য বিদেশ থেকে পাঠানোর সুযোগ পেতেন, কিন্তু এ স্কীমের সুযোগ নিয়ে প্রসাধনী এবং দামী সিগারেটের মতো বিলাস সামগ্রীই দেশে চুক্তি। এগুলো কারা পাঠাচ্ছিলেন এ নিয়ে কোন খোজ খবর করা হয়নি। এটি আসলে সবাই জানতো যে কিছু সংখ্যক আমদানীকারক এই স্কীমের সুযোগ নিয়ে পণ্যগুলো দেশে চুক্তিলেন এবং ডলার ও পাউন্ড বিদেশে পাচার করছিলেন। অর্থনৈতিক উপর এই স্কীমের কারণে কি ধরণের নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে কাউকেই ভাবিত মনে হয়নি।

সাংবাদিকরা বলসার নাখরিতেন পত্রিকার ষ্টুডিও করে প্রচার করলেও এ বিষয়ে ড. উম্প্রিট্রে দায়িত্বশীল প্রতিবাদটি নিয়ে কথা বলেন নি।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছিল। চীন নিরাপত্তা পরিষদের সভায় তেটো না দিলে দুই বছর আগেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ পেতে।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ মুজিব জাতিসংঘে ভাষণ দেন। তার বক্তব্যের মূল কথা ছিল 'একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অধিনেতৃত্ব ব্যবস্থার' জন্মের প্রয়োজন। তিনি বলেছিলেন, 'বিমাট সব অধিনেতৃত্ব ধারাগুলো সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বেকে নাড়িয়ে দেয়ার পরে সবারই এমন একটি অধিনেতৃত্ব ব্যবস্থার বিষয়ে একমত হওয়া প্রয়োজন।'

এ বিষয়টিই সম্ভবত তার মনে সবার আগে এসেছিল। বাংলাদেশ একটি মারাত্মক অধিনেতৃত্ব সংকট মোকাবেলা করছিল। একদিকে বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় বেড়ে চলেছিল, অন্যদিকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রঙাণী করেও যথেষ্ট দাম পাওয়া যাচ্ছিল না।

মুজিব সব উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কথাই যেন বলেছিলেন, কারণ সবকটি উন্নয়নশীল দেশই ১৯৭৪ সালে তাদের আমদানী ব্যয় নির্বাহ করতে পিয়ে হিমশির থাচ্ছিল।

মুওরাত্তি থাকা অবস্থায় মুজিব রাষ্ট্রপতি ফোর্ডের সাথে একটি বৈঠক করেছিলেন, কিন্তু সেটি সংক্ষিপ্ত ও অফলিপ্সু ছিল। তিনি ফেরার পথে ইরাক সফর করেছিলেন। মুজিব ইরাক সফর নিয়ে সম্প্রতি ছিলেন।

ঢাকায় ফিরে ৭ অক্টোবর ১৯৭৪-এ মুজিব বলেছিলেন, 'এই অধিনেতৃত্ব সংকট খেলখায়ী, বাংলাদেশ টিকে থাকার জন্যই জন্মেছে।'

এর ছয় দিন পর ৩৭ দিন ব্যাপী বিদেশ সফর শেষ করে ঢাকায় এসে তাজউদ্দীনের মনে হয়েছিল এই সংকট অত্যান্ত ভয়াবহ। ১৩ অক্টোবর ১৯৭৪-এ তাজউদ্দীন বলেছিলেন, 'বর্তমান অবস্থা চলমান থাকতে পারে না। আমরা আর বালিতে নিজেদের মাথা লুকিয়ে রাখতে পারি না।' তিনি খাদ্যকে রাজনৈতিক উর্ধ্বে রাখতে চেয়েছিলেন। তার প্রস্তাবনা ছিল একটি সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করা। যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা বন্দী ছিলেন তাদের মুক্ত করে দেয়া এবং এমন কি আত্মগোপন করে থাকা নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা করার আহবান জানানোর পক্ষে ছিল তাজউদ্দীনের মত।

বিদেশ সফর শেষে ঢাকায় ফিরেই তাজউদ্দীন এমন প্রস্তাবনা রাখায় অনেকেই উৎসুক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার ৩৭ দিনের সফর কালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বুলগেরিয়া সফর করেছিলেন, ওটাওয়াতে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন, ওয়াশিংটনে আইএমএফ-এর সাথে বৈঠক করেছিলেন এবং চৌকিতে জাপানী নেতাদের সাথেও বৈঠক করেছিলেন।

শেখ ফজলুল হক মণি আওয়ামী লীগ ও এর সকল অঙ্গ সংগঠনের সাথে তার সম্পর্ক ছিল করেছিলেন। অষ্টোবরে তিনি আওয়ামী যুব শীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের জন্য যে পদত্যাগপত্র দিয়েছিলেন সেটি ফিরিয়ে নিতে রাজি করানো হয়। দেশব্যাপী একটি ঝটিকা সফরের সময় তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একাংশ ‘সম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে হাত মিলিয়ে’ কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বিভিন্ন করে দিতে চাইছেন বলে অভিযোগ আনেন। যে সব বাকি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মত পরিস্কিত মিত্রদের সাথে বাংলাদেশের দূরত্ব তৈরি করতে চাইছেন তাদের তীব্র নিন্দা করেন।

হেমরি কিসিঙ্গার ৩০ অষ্টোবরে ঢাকা সফর করেন, তিনি বাংলাদেশ খাদ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গত ধরণের সংকটের মুখ্য ডিল সেগুলো মোকাবেলায় সব ধরণের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি জানান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে অভিযিক্ত ১ লাখ টন গম সরবরাহ করবে।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান যখন ধারণা করেছিলেন পর্কিয়া বিশ্ব বাংলাদেশের মানুষকে না খেয়ে মরতে দিবে না তখন তিনি মানুষের দয়ানোদেব উপর অনেক বেশি আস্তু রেখে ফেলেছিলেন। যত গাই হোক, যাদের বেঁচে পাকার সঞ্চাবনা কর তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার এই সংক্ষিপ্ত কো নতুন ছিল না। যাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই অনেক পর্কিয়া লেখক দার্শন করে আসছিলেন দরিদ্র দেশগুলোর মানুষকে না খেয়ে মরতে দেয়া উচিত তাদের যুক্তি ছিল এসব দেশ বিশ্বের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করাচ্ছা; এবের প্রচেষ্টা করা করা যানে অনিবার্যকে বিলম্বিত করার শাফিল এবং এতে এসব বেদনাকে দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে।

অধ্যাপক গ্যারেট হার্ভিনের মতে, মার্কিনিয়া দরিদ্র দেশগুলোতে খাদ্য না পাস্তিয়ে আসলে সেসব দেশের মানুষের এক ধরণের উপকারাই করবে।

বেভারেন্ট নিহাউস বল্লোডিলেন, ‘এই মুহূর্তে সর্বেন্দুমন্দের বেভে নিয়ে বাকিদের খাদ্য দেয়ার যুক্তি এবং প্রয়োজনীয়... আমেরিকার নেতৃত্বে ধনীদের দলে যোগ দান করে আমাদেরকে জগতের কর্দমাদের বিকান্দে লড়তে হবে, তাদের হয় আমাদের শর্ত মেনে টিকতে হবে নতুন তাদের কর্দমতা নিয়ে মরতে হবে।’

১৯৭৪ সালে খাদ্য পরিষিক্তির বিবেচনা করে সিআইএর বাজারনৈতিক গবেষণা কার্যালয় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ‘বিশ্বের রণানীয়গোষ্ঠী খাদ্য সম্পদের সিংহভাগের মালিক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠিক দ্বিতীয় নিশ্চয়দের প্রবন্ধী সময়ের মাত্রাই সময় বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে।’

খাদ্য মানেই ক্ষমতা- জীবন ও মৃত্যু নির্ধারণের ক্ষমতা, এই ক্ষমতা ছিল গত উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর, ‘একদম হতদরিদ্র দেশগুলো পেকে কেবল রণানীকারক দেশগুলো পর্যন্ত যারা সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্য আমদানী করতো।’

জানুয়ার ১৯৭৬-এ এমা রচনাশুভ তার 'ফুড পলিসিজ' শিরোনামের প্রবক্ষে বলেন
‘বাদাকে ঝমতা হিসেবে দেখার মতবাদটি অনেকগুলো কারণেই ভ্রান্ত।’ তিনি
সিআইএ যে সিঙ্কাণ্ডে উপনীত হয়েছিল তার সাথে একমত ছিলেন না, এবং
সতর্কতার সাথে লক্ষ করেন যে যারা ‘বর্তমানে ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে এমন লোকদের
অবিষ্যত ক্ষুধার কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের বর্তমান ক্ষুধাকাতর অবস্থাকে
উপেক্ষা করার’ পরামর্শ যারা দিয়েছিলেন মার্কিন প্রশাসন তাদের সেই পরামর্শ
গ্রহণ করেন।

তিনি বলেছিলেন, ‘এই মতবাদ উপেক্ষার মাধ্যমে হত্যাকে জায়েজ করতে চায়-
সমসাম্যাক বাস্তুর উদাহরণের ভিত্তিতে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে নেতৃত্ব বিচারের
যুক্তিতে: একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যত কৃষি ও পুষ্টি সংক্রান্ত ভবিষ্যত
পরিষ্কারির প্রক্ষেপনের মাধ্যমে (যেমন: বাংলাদেশের মানুষ ১৯৯০ সালে ক্ষুধায়
ঘাকবে); হিতৌয়ত, ভবিষ্যতের নেতৃত্বকাবোধেরও প্রক্ষেপনের মাধ্যমে, যেমন:
১৯৯০ সালে মার্কিনিরা বাংলাদেশের মানুষকে ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষা করার ইচ্ছা
পোষণ করবে না, অঙ্গত নিজেদের দেশে খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বিনিময়ে নয়।’

উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের কথাই তার প্রথমে মনে এসেছিল, এবং ১৯৭৪ সালে
বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেটিকে তিনি ‘বাজার অর্থনীতিতে
আবন্ধকারিতার মাধ্যমে খাদ্য নীতি প্রয়ন্তের ফলে সৃষ্টি নৈরাজ্যের ফলাফল’
হিসেবে প্রদর্শন করেছিলেন।

বাণিজ্যিক বাজার থেকেই ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
কাছ থেকে খাদ্যস্ব কিনেছিল। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের শুরুর দিকে কানাডা,
অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তখনকার বাজার মূল্যে খাদ্যস্ব
কেনার চূড়া করেছিল। ১৯৭৪-এর শ্রীশ্বে চূড়ি অনুসারে খাদ্য স্ব কেনার জন্য
বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় অপের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মার্কিন স্ব কোম্পানীর কাছ থেকে হেমতে আসার কথা এমন দুটি খাদ্যস্বের চালান বাতিল
হয়েছিল। এমা রচফিল্ড বলেছিলেন, ‘ইতিমধ্যে পিএল-৪৮০ কর্মসূচির আওতায়
সাহায্য হিসেবে খাদ্য আসার বিষয়ে যে চূড়ি ছিল সে অনুসারে খাদ্য আসা ও
বিলম্বিত হয়েছিল, এর প্রধান কারণ ছিল তখন কর্মকর্তারা গোপনে আলোচনা
করছিলেন সে বছরেরই শুরুর দিকে কিউবার কাছে পাট বিক্রি করার কারণে
সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে কি না সে বিষয়টি নিয়ে। ১৯৭৪-এর ডিসেম্বর
মাস বাংলাদেশে মার্কিন খাদ্য পৌছানোর আগেই হেমতের দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে
গিয়েছিল।’

এবং হাজারো মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

কিছু পচিমা সাংবাদিক শেষ মুজিব হত্যার আগে বলতেন পরাশক্তিগুলোকে আকৃষ্ট করার মত প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলাদেশের ছিল না এবং বাংলাদেশের যদি কোন কৌশলগত গুরুত্ব থেকে থাকে তা কেবল ভারতের কারণে।

ফাইবারসিয়াল টাইমস-এর এশিয়া প্রতিনিধি ১৯৭৪-এর ৩০ অক্টোবর বলেছিলেন, ‘মার্কিনরা পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে জড়ানোর বিষয়ে তাদের অনিচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে। বাঙালিরা যেমনটি মনে করে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কৌশলগত দিক থেকে তত্ত্বাবধান কর্তৃপূর্ণ নয়।’

বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি পুরোপুরি হতাহার চিত্র ফুটিয়ে তুলে ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের একজন সংবাদ প্রতিনিধি ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে লিখেছিলেন, ‘বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলোর একটি হলো বিশ্ব পরাশক্তির কোনটির কাছে বাংলাদেশের আলাদা কোন গুরুত্ব নেই। এর অবস্থান ছিল ভারতের পিভিনা অংশের মধ্যে, যার ফলে ভারত ছাড়া আর কারও কাছে দেশটি কৌশলগত তাদের গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। দেশটিতে এমন কোন ব্যবিজ্ঞ সম্পদ ছিল না যা কারও প্রয়োজন ছিল। কাউকেই এখানে একটি ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী মনে হচ্ছে না।’

১৯৭১ সালেই মার্কিন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ঘাটি গড়ার সুবিধা দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরে কিছু পচিমা সাংবাদিক দাবি করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন চট্টগ্রামে নৌ ঘাটি তৈরি করতে চায়।

তেহরানের কায়হান ইন্টারন্যাশনালে ১১ এপ্রিল ১৯৭৪ ঢাকায় কর্মরত একজন জাপানী কৃটনীতিকের বকার নিয়ে ছাপা হয়েছিল ‘বাংলাদেশের কন্ত একটি তেল সমৃদ্ধ সময় অপেক্ষা করছিল, যা হয়তে কুয়েতের শেখবের তেল সমৃদ্ধ সময়ের চেয়েও ব্যাপকতর হতে পারে।’

কায়হানে ছাপা হয়েছিল, ‘বঙ্গপোসাগরের তেলের মজুদ পারসা উপসাগরের তেলের মজুদের চেয়ে বৃহত্তর হতে পারে। এখানে গে বিপুল পরিমাণ তেল পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তা দিয়ে বৃহৎ শিল্প পরাশক্তি জাপানের তেলের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।’ আরও বলা হয়েছিল, ‘কিন্তু ওয়ার্ল্ড এন্ড টেকনিও মধ্যে গোপন চূক্তি না হলে ঢাকা ও টোকিওর মধ্যে কোন নিয়মতা আশা করা যায় না।’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই চূড়ান্ত।

বঙ্গপোসাগরের ২৫ হাজার বর্গমাইল এলাকায় তেল অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে ছয়টি বিদেশী কোম্পানী বাংলাদেশের সাথে চূক্তি করেছিল ১৯৭৪ সালে ঢাকা কোন তেলের সন্ধান পায়নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চাহিদা তৈরি হলে সেখানে তেল পাওয়া যেতেও পারে।

বাংলাদেশে ৬ ট্রালয়ন ঘনফুট গ্যাসের প্রমাণিত গ্যাসের মজুদ আছে। এটি কোন বিশাল পরিমাণ নয় হয়তো। কিন্তু শতকরা ৯৪ ভাগেরও বেশ হাইড্রোকার্বন উপাদান সমৃক্ষ গ্যাস অতি উন্নত মানের।

বাংলাদেশকে সঙ্গবনাইন মনে করতেন না এমন হাতে গোণা কয়েকজন পচিমা সাংবাদিকের একজন ছিলেন গার্ডিয়ান পত্রিকার ওয়াল্টার শোয়ার্জ। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি বলেছিলেন, ‘তবে কি বাংলাদেশের বিষয়ে সকল আশা বাদ দিয়ে তাকে বৈদেশিক সহায়তার তলা বিহীন ঝুঁড়ি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে? দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সমস্যাগুলোর কথা ভালো করেই জানেন। তিনি স্মাধানের জন্য ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং আরও পদক্ষেপ নিচ্ছেন। অবশ্যে বাংলাদেশ রেড ক্রস গ্রহণযোগ্য মাত্রায় ভালো কাজ করছে, আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে রেডক্রসের প্রধানকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মুজিব আরও কর্তৃতপ্রায়ণ সরকার গঠনের কথা ভাবছেন বলে মনে হচ্ছে। এটা হয়তো গণতন্ত্রের জন্য দুষ্টসংবাদ- কিন্তু স্থানীয় রাজনীতিক ও এর্মাণিদের ক্ষমতার উপর এর ফলে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হতে যাচ্ছে যেগুলো অনেক সময়ই দুর্নীতিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।’

মুজিব সমস্যা সম্পর্কে পরিকার ধারণা রাখতেন এবং অবশ্যে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ নিতে তরু করেছিলেন।

১৯৭৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে অনেকেই ধারণা করছিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দিকে যাচ্ছে। এজন্য মার্কিন, ফরাসী ও তানজানিয়ান সংবিধান খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। ঢাকা সফররত একজন বিদেশী সংবাদকর্মী জানান যে তিনি দিয়ু ধাকা অবস্থায় তানজানিয়ান সংবিধানের একটি কপি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলাদেশ টাইমস নামে মুজিবের ভাষ্ণে শেখ ফজলুল হক মণি'র মালিকানাধীন একটি পত্রিকা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পক্ষে কথা বলতে ওরু করে। অষ্টোবরের শেষ সপ্তাহ নাগাদ মনে হচ্ছিল সংবিধান সংশোধনের বা কারো কারো মতে ‘দ্বিতীয় দফা বিপ্লবের’ জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে পিয়েছিল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক নভেম্বরে যখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয় তখন আজ্ঞাবিশ্বাসের সাথে সংবিধানে আসন্ন পরিবর্তনের কথা ছাপে এবং এমন কি এটাও ছাপে যে নতুন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রীসভায় এই মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। মুজিব নিজেই রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছিলেন। উপরাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে কোন বিধা ছিল না- সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি হচ্ছিলেন।

১৭ নভেম্বরে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন এবং পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমূল সংকার দাবি করেছিল। সিপিবি'র সভাপতি

মণি সিংহ মত প্রকাশ করেন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে এবং তিনি আরেকটি বিপ্লবের দাবি জানান।

নতুনবনে গণভবনে সংবিধানে প্রত্নাবিত পরিবর্তনসমূহ নিয়ে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল তিনি দিন ব্যাপী আলোচনা শুরু করে। দলের দশ জন সদস্য এ প্রত্নাবের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং আলোচনার ইতীয় দিনে ওবায়দুর রহমান নামে একজন প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে বৈঠক করেন। তারা ১৯ দফা দাবী প্রত্নত করেন এবং নূর-এ আলম সিদ্ধিকীকে তাদের মুখ্যপাত্র নির্বাচন করেন।

মুজিব বলেছিলেন যদি তিনি যে প্রত্নাব উত্তোলন করেছিলেন দলের ভিতরে তা নিয়ে কোন বিরোধ থাকলে তিনি নতুন নির্বাচন আহবান করবেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন জনগণ তার প্রত্নাবেই সমর্থন দিবে। ইমত প্রকাশকারী দশজন সদস্য তখন চৃপ করে যান। মুজিব বিহীন তাদের নির্বাচনের ফলাফল কঢ়ানাটি খুন ভালো হতো না।

আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকের পর পাঁচদিন ব্যাপী সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাশিত সাংবিধানিক পরিবর্তন হয়নি। একজন কলামিস্ট ১৯৭৪ সালের ১ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাংগীতিক কাউটার পয়েন্ট এ লিখেছিলেন, 'এখনো এমন কিছু সরল সোজা ব্যক্তি আচ্ছন্ন যাবা বিশ্বাস করেন আওয়ামী জানুয়ারিতে যখন সংসদ অধিবেশন শুরু হবে তখন প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসবে।' তিনি জানান যে এমন কোন নিশ্চয়তাই নেই যে জানুয়ারিতে আবার সংসদ অধিবেশন বসতে পারে। এর আগে অনেক কিছুট গাটে যেতে পারে। এই কলামিস্টের কথা হাস্যকরভাবে তুল প্রয়োগিত হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের সময় ঘোড়াশাল সার কারখানার কন্ট্রোল ক্লেই বিক্ষেপণের পাশাপাশি আরও অনেক অগ্রিম সংযোগ ও অন্যান্য অস্ত্রাত্মক কর্মকাণ্ড ঘটানা হয়েছিল। ট্রেন, লক্ষ ও বাসে ঢামলা করা হয়েছিল, রেল লাইন উপরে ফেলা হয়েছিল, গার ফলে জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। শত শত আওয়ামী লীগারকে হত্যা করা হয়েছিল। এসব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কিছু নিশ্চয়তা ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে ঘটেছিল, কিন্তু এই সজ্ঞাসী কর্মকাণ্ডের একটি ধারা লক্ষ করা যাচ্ছিল এবং এগুলোকে শুধু যুদ্ধ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপো করা আর সম্ভব ছিল না।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ গোলাম কিবরিয়া নামে একজন এমপি এবং একজন ইউপি চেয়ারম্যানকে দুটি ইন্দোর আমাতে নামায আদায়রত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

সিদ্ধের নামায আদায়রত থাকা অবস্থায় কাউকে হত্যা করার কথা এর আগে শোনা যাবান। মুজিব শুরুকর পেশ গিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, ‘আমাকে এর শেষ দেখতে হবে।’

২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে মুজিব সারাদেশে জরুরী অবস্থা জারি করেন।

জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত প্রেসনোটে বলা হয়েছিল, ‘একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল এবং সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করতে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্ট করেছিলেন তারা ওর থেকেই নানাবিধ অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় যেতে পারেন নি এমন অনেকে এই গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়েছেন।’

মুজিব সমগ্র জাতিকে পুনঃএকত্বকরণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু পাকিস্তানীদের যারা সহযোগিতা করেছিল তাদের খাধ্যে অধিকাংশই কোন অবস্থাতেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের সাথে ঐক্যবন্ধ হতে প্রস্তুত ছিলেন না।

পাক বাহিনী যে ধর্মসংঘজ্ঞ চালিয়েছিল তা নিয়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পূর্বদেশ নামের একটি দৈর্ঘ্যকে যে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তার শিরোনাম ছিল ‘কেউ ভুলে যাবে, কেউ ভুলবেনা।’

পাকিস্তানীদের চালানো ধর্মসংঘজ্ঞ ভুলে যাওয়াটাও ছিল একটি অপরাধ।

২৬ মার্চ ১৯৭৫ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি জনসভায় মুজিব বলেছিলেন তিনি চোটা করেও একটি প্রতিশ্রূতি রক্ষা করতে পারেন নি। ‘আমি প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলাম যে যুক্তাপরাধীদের বিচারের মুৰোমুখি করবো। আমি সে প্রতিশ্রূতি শঙ্খ করেছি। আমি তাদের বিচারের মুৰোমুখি করিনি। আমি তাদের ছেড়ে দিয়েছি, কারণ আমি এশিয়ায় এবং বিশ্বে বক্স তৈরি করতে চেয়েছি’ এ কথা বলে তিনি ২৫ হয়ে থান, দেন এ বিষয়টি তার জন্য প্রচণ্ড বেদনদায়ক ছিল।

মুজিব বার বার নিশ্চিত করেছিলেন, ‘যদি শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকেন তাহলে এই বাংলাদেশের মাটিতেই যুক্তাপরাধীদের বিচার হবে।’ তিনি শীকার করেছিলেন এটি তধু বাংলাদেশের মানুষের কাছে তার ঝণ নয় বরং মানবতার কাছেও তাই এবং পৃথিবীর কোন শক্তি এটি করা থেকে তাকে বিরত করতে পারবে না। ২৫ এপ্রিল ১৯৭২ যখন মুড়িতে পাক-ভারত আলোচনা ওর হয় তখন মুজিব কুলনীপ নায়ারকে বলেছিলেন বাংলাদেশের সাথে ঐক্যমত্য ছাড়া ভারত যুদ্ধ বন্দীদের বিষয়ে কোন ধরণের সমরোতায় আসতে পারে না। তিনি এটা কোন ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন না কিন্তু যারা বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে তারা কোন সাজাতোগ না পেয়ে থাকতে পারে। তিনি বলেছিলেন, ‘পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমরা কি জবাব দেব? বুল, ধর্ষণ ও লুটপটকারীদের আমরা বিনা শান্তিতে ছেড়ে দিলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আমাদের ক্ষমা করবে না।’

কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল—
অন্তত কিছু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল।

আমুমানি ১৯৭৩ এ ওয়াশিংটন পোস্টের লুইস এম. সাইমনস প্রতিবেদনে
লিখেছিলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মুজিবকে উপদেশ দিয়েছে ৭৩ হাজার
সামরিক অথবা ২০ হাজার বেসামরিক ব্যক্তিত্বের যুদ্ধাপরাধের’ বিচারের মুখ্যমুখ্য
করা হলে তা ভূট্টোকে তার দেশ পাকিস্তানের হতাশা আক্রান্ত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ
করার ক্ষেত্রে বিপদে ফেলে দিবে এবং এর ফলে উপর্যুক্ত শাস্তি আলোচনা
মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।’

বাংলাদেশের উপর যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ
রয়েছে তার ইঙ্গিত রয়েছে এমন সংবাদ প্রতিবেদন এটিই প্রথম ছিল না এবং
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ছাড়াও আরও অনেক দেশ এই বিচার না করার পরামর্শ
বাংলাদেশকে দিয়েছিল। যেসব মুসলিম দেশ ১৯৭১-এ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী
বাংলাদেশে খন্সযজ্ঞ চালানো এবং ভয়ঙ্কর সব অপরাধ সংগঠনের সময়ে দুর্বল
কঢ়েও প্রতিবাদ করেনি, সেই দেশ গুলোই বাংলাদেশে আটক ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর
ভাগ্য নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পাকিস্তানে
আটকে থাকা বাঙালীদের ভাগ্যও এসব যুদ্ধবন্দীদের সাথে জড়িয়ে ছিল। ১৯৭২
সালে ভূট্টো বলেছিলেন কয়েক শত যুদ্ধবন্দীর বিচার বাংলাদেশে হলে সে বিষয়ে
তার কোন আপত্তি থাকবে না, যদি অবশিষ্টদের মুক্তি দেয়া হয়। ওয়াশিংটন
পোস্টের ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২-এর খবর অনুযায়ী সংখ্যাটি ১০ হাজার। কিন্তু
১৯৭৩ সালেই ভূট্টো তার অবস্থান বদলে ফেলেন, এবং ত্রুটি দেন প্রতিক্রিয়া
স্কুল পাকিস্তানও সেখানে আটকে থাকা বাঙালীদের বিচার করবে।

ভারত যুদ্ধবন্দীদের আটকে রেখে উপর্যুক্ত পৌছানোর
চেষ্টা করছে বলে পাকিস্তান অভিযোগ করে। যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে বাংলাদেশের
মতামতের গুরুত্ব রয়েছে এটি মানতে পাকিস্তান কখনো প্রস্তুত ছিল না।
পাকিস্তানের বক্তব্য ছিল তার সেনাবাহিনী ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।
ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী নজরুল ইসলাম এটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে
পাকিস্তানী সেনা বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, এবং
বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপগ্রহণ এয়ার কমডোর
খন্দকার আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন। ব্যাখ্যায় তিনি বলেন
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল ওসমানী তখন বিশেষ কাজে সিলেটে
ছিলেন।

ভারত বাংলাদেশকে মানবিক ইস্যুগুলোকে রাজনৈতিক ইস্যু থেকে আলাদা করে
দেখতে রাজি করাতে পেরেছিল এবং এর ফলে ১৯৭৩-এর এপ্রিলে ভারত-

বাংলাদেশ বৌধ ঘোষণা আসে, যার ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত ১০ মে ১৯৭৪ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রিপীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

দিল্লীর একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেছিলেন, ‘যুদ্ধবন্দীরা যে রকম খাবার পেতেন তা পেলে অনেক ভারতীয় নাগরিক ধন্য হয়ে যেতেন।’ ভারতে অনেকেই এভাবে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের আটকে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে একটি প্রচারাভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুই একজন সাংবাদিক এমনও লিখেছিলেন আরও আগে এসব যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়ে ভারত পাকিস্তানের বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারতো।

১৯৭৩ সালে দিল্লী সফর করছিলেন এমন একজন ঢাকার সাংবাদিক বলেছিলেন, ‘এই যুদ্ধবন্দীরা ভারতের ওপর একটি বোৰা হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতীয়রা দ্রুত এদের হাত থেকে রেহাই চাইছিলেন। আমরা যদি এসব যুদ্ধবন্দীদের বিচার করতে চাই তাহলে তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয়ার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।’

যখন ভারতের নিজেরই অনেক সমস্যা ছিল, সে অবস্থায় এসব যুদ্ধবন্দীরা সত্যিই ভারতের ওপর বোৰা হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৭২ সালের ভয়ঙ্কর খরার কারণে ভারতে ১৫ প্রিলিয়ন টন খরিপ শস্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল এবং ঝালানী সংকটের কারণে উৎপাদনও অনেক কমে এসেছিল। বিশ্ব বাজারে তেসের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির কারণে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই ভারতও একটি ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দ মোকাবেলা করেছিল।

১৫ হাজার যুদ্ধবন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলেও, বাংলাদেশ পরবর্তীতে সংখ্যাটি কমিয়ে ১৯৫-এ নিয়ে আসে এবং বলা হয় ১৯৭৩-এর মে মাস নাগাদ তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। বাংলাদেশের একটি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে রিচার করা হবে না বলে যে প্রচারণা চালু ছিল তার পেছনে ছিল ভারতে ডুটোপন্তী লবি। ঢাকার সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশ ১৯৭৩ সালে এমন খবর প্রচার করে যে ভারত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ রয়েছে এমন যুদ্ধবন্দীদের হত্তাত্ত্ব করতে অস্বীকার করছে। এই প্রতিবেদনটিকে কর্তৃপক্ষ প্রত্যাখান করেছিল।

হলিডে নামের একটি চীনপন্থী সাঙ্গাহিকে ছাপা হয়, ‘যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি একদম শুরু থেকেই ভারতের পরামর্শক্রমে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।’ অন্যদিকে কিছু বাঙালী অভিযোগ করতে ধাকেন পাকিস্তানি স্বীকৃতি পাওয়াকে ভারত বাধ্যত্ব করছে।

বাংলাদেশ যদি সত্ত্বেই বিচার করতে চেয়ে থাকে তবে তাদের তা অনেক আগেই করা উচিত ছিল। পাকিস্তানীদের চালানো ধর্মসংজ্ঞের স্মৃতি যখন মানুষের মনে

তখনো সদ্য অতীত সে সময় খুব অল্প দেশই বাংলাদেশকে এই বিচার না করার পরামর্শ দিত। হয়তো ঐ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হলেও, রায় কার্যকর করা সম্ভব হতো না। অনেক বাঙালীর মতে জেনারেল টিক্কা খান ছিলেন প্রধান আসামী, কিন্তু তিনি ছিলেন পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে ক্ষমা করতে হলেও তাদের কৃত ঘৃণ্য অপকর্ম সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারতো। সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারতো যা জানার অধিকার তাদের ছিল।

বাংলাদেশের উচিত ছিল অন্তত যুদ্ধাপরাধের একটি খেতপত্র প্রকাশ করা।

এমন কি হতে পারে উচ্চ পদে থাকা বাঙালীয়া ডয় পাছিলেন বিচার প্রক্রিয়া অগ্রসর হলে তাদের ভূমিকাও জনগণের সামনে চলে আসতে পারে, আর সে কারণেই তারা বিচার প্রক্রিয়া বাধায্যত করছিলেন? ঢাকার একজন হতাশ হয়ে লক্ষ করছিলেন তার ভাইয়ের হত্যার সাথে জড়িত দুজন পাকবাহিনীর সহায়তাকারীর প্রতি কিছু কর্মকর্তা সমব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘মনে হচ্ছিল যেন আমিই অপরাধী।’

দ্বিতীয় বিপ্লব

সবচেয়ে সফল বিপ্লবও অসমান্ত থেকে যায়, কারণ বাস্তবতা খুব বড় জোর স্বপ্নের কাছাকাছি হয়। বিপ্লবীরা কখনোই তারা যা করবে বলে শুরু করে ধাকে তার সব অর্জন করতে সক্ষম হন না।

২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংবিধানে বহু প্রতিক্ষীত সংশোধন আনা হয়; বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবহাৰ প্ৰবৰ্তিত হয়। সংবিধানের এই সংশোধনীতে মুজিবকে পাঁচ বছৰ মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি কৰা হয়েছিল: সংসদের মেয়াদ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে পাঁচ বছৰ পৰ্যন্ত কৰা হয়- দুই বছৰের বৰ্ধিত মেয়াদ পায় নিৰ্বাচিত সংসদ।

সংসদে মুজিবের শেষ ভাষণটি ছিল কঠোৱ। তিনি দুর্নীতি, সাম্প্ৰদায়িকতা ও দেশ-বিবোধী অপশক্তিগুলোৱ সমালোচনা কৰেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দেশ স্বাধীন হওয়াৰ পৰ বাংলাদেশ অস্তৰ্জাতিক চৰ্চাত্তেৰ জন্য উৰ্বৰ তৃতীয় হয়ে উঠেছে। এদেশে টাকা ভেসে আসছে এবং মানুষকে সে টাকার অস্তাৰ দেয়া হচ্ছে।' একটি বিশেষ দলেৰ সদস্যৱা এদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে প্ৰক্ৰিয়াজ চালিয়েছে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰেননি এবং এখনও বাংলাদেশকে অন্য নামে ডেকে থাকেন। যারা বাংলাদেশে কখনো বিশ্বাস কৰেননি, এদেশে থাকাৰ কোন অধিকাৰ তাৰে নেই। মুজিব বলেছিলেন, 'বাংলাদেশেৰ মাতিতে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজগুলোকে বেড়ে উঠতে দেয়া হবে না।' তিনি দুর্নীতিকে সমূলে উৎপাটন কৰতে চেয়েছিলেন। তাই বলেছিলেন, 'আমোৱা পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্নীতিশৰ্ক্ষণ দেশ।' প্ৰকৃতপক্ষে শিক্ষিতবাই দুর্নীতিৰ সাথে জড়িয়ে ছিলেন, তাৰা খুব বেশি হচ্ছে তল মোট জনসংখ্যাৰ শতকৰা পাঁচ ভাগ ছিলেন; কিন্তু তাৰাই ছিলেন নষ্টেৰ গোড়া। জনগণ সৎ ছিল। এৱ চেয়ে চমৎকাৰ জনতা পৃথিবীৰ আৱ কোথাও ছিল না।

১৯৭২ সালেৰ ১২ জানুয়াৰি মুজিব ঢাকায় ফেৱাৰ দুই দিন পৰই তাৰ রাষ্ট্রপতিৰ পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং প্ৰধানমন্ত্ৰী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সে সময় লক্ষনেৰ টাইমস পত্ৰিকা পৰামৰ্শ দিয়েছিল বাংলাদেশে 'নিৰ্বাচিত সময়েৰ জন্য নিৰ্বাচিত যথেষ্ট ক্ষমতা সম্পূৰ্ণ রাষ্ট্রপতিৰ শাসন লক্ষণতাৰ, যাকে সংসদ চাইলৈই বৰখাস্ত কৰতে পাৰবে না।' আওয়ামী লীগেৰ ছাত্ৰ সংগঠন ছাত্ৰলীগেৰ উৎপন্নী অংশটি মুজিবেৰ নেতৃত্বে সকল দেশপ্ৰেমিক রাজনৈতিক দল থেকে প্ৰতিনিধি নিয়ে একটি বিপ্লবী কাউন্সিলোৱ মাধ্যমে দেশ পৱিচালনাৰ দাবি কৰেছিল। মুজিব এসব দাবিৰ প্ৰতি কৰ্ণপাত কৰেন নি।

কিন্তু তাহলে তিন বছৰ পৰ কেন মুজিব রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাৰেৰ দিকে গেলেন? এৱ উত্তৰ পাওয়া যাবে ১৯৭৪ সালেৰ শেষভাগে বাংলাদেশ যে দুর্ঘোগে পতিত হয়েছিল সেটিৰ দিকে দেখলে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর, 'বিশ্ব বাজারে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ হওয়া এবং কালেক্টডে নিজেদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার' সম্ভাবনা থাকে খুবই ক্ষীণ। এই ক্ষীণ সম্ভাবনার কারণেই, জন ডান বলেন, 'বিপ্লব পরবর্তী কর্তৃপক্ষগুলোর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং তত্ত্বাধিক দৃঢ় মনোবলের দরকার হয়ে পড়ে।'

অনেকেই মুজিবের মধ্যে বৈরশাসকসূলত প্রবণতা দেখেছিলেন। কিন্তু চাইলেও মুজিব একজন বৈরশাসক হতে পারতেন না; বৈরশাসক হতে হলে যতোটা নৃশংস হওয়া প্রয়োজন তা তার মধ্যে ছিল না। তিনি তার দেশের মানুষের ভালোবাসা পেতে আবুল হয়ে থাকতেন এবং এজন্য তাকে তাদের সাথে মিশে যেতে হতো। তিনি একটি জাতীয় ঐক্য চাইতেন, এবং মাঝে মাঝে এটি অর্জনের জন্য অতিরিক্ত উদ্যোগ নিয়ে ফেলতেন। প্রায়ই যখন কঠোর হওয়া দরকার সে সময় তিনি নরম হয়ে যেতেন; এবং তার জাতিকে পুনঃএকত্বকরণের নীতিকে স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র তার দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করেছিল।

যতোটুকু ক্ষমতা তিনি চাইতে পারতেন তার সবই মুজিবের ছিল। তার কথাই দেশের জন্য এক রকম আইন হিসেবে বিবেচিত ছিল। কিন্তু দেশ ধর্মসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং এটি ঠেকাতে তাকে কিছু করতেই হতো। দেশের একটি পরিবর্তন দরকার ছিল। 'প্রথম বিপ্লব' তার ভরবেগ হারিয়ে ফেলেছিল। তিনি একটি 'হিতীয় বিপ্লব' সূচিত করতে চাইছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জনতা তার নতুন আনন্দোলনে সাড়া দিবে। 'এখন নতুন জীবন আর নতুন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। জনগণকে সজাগ করতে হবে।' ১৯৭৫ এর ২৫ জানুয়ারি এ কথাই মুজিব বলেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ সময়ের মধ্যে একটি কক্ষে দুই বা তিনজন লোককে সাথে নিয়েই তিনি একটি গণআনন্দলন পরিচালনা করেছিলেন। তখন খেচাসেবকরা তার সাথে কাজ করছিলেন এবং একটিও ভাকাতির ঘটনা ঘটেনি সে সময়ে। তাই তার প্রশ্ন ছিল 'তাহলে এখন আমরা কেন আবার সেটা করতে পারবো না?'

তখন সবার একটি সাধারণ শক্তি ছিল- পাকিস্তানি সামরিক জাহান; কিন্তু ১৯৭৫ এ সহজে চিহ্নিত কর্য যায় এমন কোন শক্তি ছিল না। ১৯৭১ সালের চেতনাকে আবার জাগিয়ে তোলা খুবই কঠিন কাজ ছিল।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ বাংলাদেশ ক্ষমক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হয়েছিল। মুজিব বাকশালের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি ও ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির নাম ঘোষণা করেছিলেন।

বাকশালের প্রধান সংগঠন নির্বাহী কমিটিতে ছিলেন সভাপতি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিজে, তার সাথে ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীরা এবং শেখ ফজলুল হক মণি।

এই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন সেনা, মৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানরা, ছিলেন আধাসামরিক বাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর প্রধানসচিবও।

পার্টির পাঁচটি ফ্রন্ট ছিল— কৃষক, শ্রমিক, নারী, যুব ও ছাত্র।

আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকাকেই বাকশালের প্রতীক হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছিল। এর পতাকার দুই-ত্রুটীয়াংশ সবুজ ও একত্রুটীয়াংশ লাল ছিল, এবং সবুজ অংশের উপর ছিল চারটি তারকা।

তখন দেশে একমাত্র দল ছিল বাকশাল। অন্যান্য পার্টির কার্যক্রম বক্ষ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বাকশালের সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের আর সংসদ সদস্য থাকার কোন সুযোগ ছিল না। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী এবং মইনুল হোসেন তাদের সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

একদলীয় ব্যবস্থায় ক্লাপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ছিল মসৃণ। অন্তত বাইরে থেকে তেমন কোন বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়নি।

কেউ কেউ বলে থাকেন মুজিব ১৯৭৪ সালে টিকিংসার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে একদলীয় শাসনবাবস্থার কথা তার ভাবনায় আসে। আবার অন্য অনেকে বলে থাকেন যার্কিন মুজুরাট্টি সফরে খুশি হতে না পেরেই তিনি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। কিন্তু এগুলো সবই কেবল ধারণাই ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ত হিসেবে নিযুক্ত ‘শামসুর রহমান মুজিবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কোথা থেকে আপনার মাথায় একদলীয় শাসন ব্যবস্থার কথা এলো?’ জবাবে মুজিব বলেছিলেন, ‘কোন রাশিয়ান কি এর বিপক্ষে?’ শামসুর রহমান তখন বলেছিলেন, ‘সেটা আমি জানি না?’

সমাজবাদের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে রাজনৈতিক ক্যাডারদের যে উকুত্তপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটির উপর প্রথম পক্ষবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৪ এ বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল। সরকারী দণ্ডনের লোকদের পক্ষে ‘নতুন কিছু করার যতো লোক হওয়া বা সমাজে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে প্রভাবক কোনটিই হওয়া সম্ভব নয়’। পরিকল্পনাটিতে বলা হয়েছিল, ‘জনগণের সাথে গভীর যোগাযোগ রয়েছে এবং নতুন আদর্শে উদ্বৃক্ষ এবং জনগণের পাশে থাকতে ও তাদের সাথে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী এমন রাজনৈতিক ক্যাডারদের জনগণকে সক্রিয় করে তুলে তাদের ধ্যান ধারণায় পরিবর্তন আনা সম্ভব।’ রাজনৈতিক ক্যাডারদের ‘সমাজের বিপ্রী পরিবর্তনের অপরিহার্য উপাদান’ হিসেবে চিহ্নিত করে পরিকল্পনাটিতে ‘উন্নয়নের উদ্দোগের প্রথম ধাপেই রাজনৈতিক ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের জন্য’ কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রস্তাৱ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনাটিতে সমাজবাদ এবং ক্যাডারদের উপর যে জোর দেয়া হয়েছিল তা দেখে অনেক বিদেশী সংবাদকমী ধারণা

করেছিলেন যে পরিকল্পনা কমিশন একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পক্ষে। কিন্তু, পরিকল্পনাটিতে বলা হয়েছিল, ‘বাংলাদেশের সংবিধানে আগে থেকেই একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। একটি বহুদলীয় রাষ্ট্র প্রশাসনের কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকে এটি নিজেকে শাসক দল থেকে আলাদা করে রাখবে যাতে পার্টি ক্যাডাররা সমস্ত কার্যক্রমের তদারকি প্রক্রিয়াতে স্থান্ত্রিয়ভাবে ঢুকে পড়তে না পারে।’

মুজিব একদলীয় ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছিলেন অন্তত ১৯৭৩ সালের শুরুর সময় থেকে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিশাল বিজয় লাভ করার পর ১৭ মার্চ ১৯৭৩ লক্ষনের গাউড়িয়ান পত্রিকায় ওয়াল্টার শোয়ার্জ লিখেছিলেন, ‘হয়তো মুজিব মনে করছেন বাংলাদেশের জন্য একটি এক দলীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা দরকার। নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মুজিবের একজন ঝোঁঠ উপদেষ্টা তাকে এমন উপদেশই একটি ব্রহ্মনিষ্ঠ গবেষণা পত্রে দিয়েছিলেন।’

ওটাওয়াতে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে ২ আগস্ট ১৯৭৩ মুজিব বলেছিলেন: সাড়ে সাত কোটির বিশাল জনসংখ্যা নিয়ে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, রোগ-ব্যাধি এবং বেকারত্ত মোকাবেলা করতে আমাদের যে সব প্রতিবন্ধক অতিক্রম করতে হবে সেগুলো বিশাল তা আমরা জানি। একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে মোকাবেলা করতে হলে এই চ্যালেঞ্জ আরো কঠিনতর হবে, কারণ সেক্ষেত্রে মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিস্তৃত না করে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে অর্থনৈতিক প্রবৃক্ষ ঘটাতে হবে।’

১৯৭৪ সালের শেষ নাগাদ এসব সংকট প্রায় অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল। সিপিবি নেতারা বাকশাল নিয়ে এতটাই খুশি ছিলেন যে তাদের মনে হচ্ছিল এই একদলীয় ব্যবস্থার ধারণাটি যেন তাদেরই। কিন্তু তারা ছিলেন কেবল মুজিবের আদর্শিক সহযোগী মাত্র। সিপিবি বা ন্যাপ (মোজাফফর) থেকে এমন কি একজনকেও বাকশালের নির্বাহী কমিটিতে রাখা হয়নি এবং ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতেও এই দুটি দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুব সামান্য। সত্য হল, বাকশালে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদেই আওয়ামী লীগাররা ছিলেন। কিন্তু যেহেতু আওয়ামী লীগ কোন ক্যাডার নির্ভর দল ছিল না, আশা করা হয়েছিল সিপিবি ও ন্যাপ (মোজাফফর) বহুবৈ সমবায় সমিতিশূলোর জন্য ক্যাডার সরবরাহ করবে। ক্যাডার সরবরাহের জন্য বাকশালকে সিপিবি'র উপর নির্ভর করতে হবে বলেই সম্ভবত সিপিবি আশা করেছিল সকল গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে আওয়ামী লীগাররা থাকা সত্ত্বে বাকশালের শ্রেণী চারিত্ব আওয়ামী লীগের চেয়ে আলাদা হবে। কিন্তু দুটি দলেরই তরুণ সদস্যরা বাকশালে যথেষ্ট পদ না পাওয়া নিয়ে ক্ষুক ছিলেন।

নতুন দলের নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল অন্যান্য দলগুলো এখানে আওয়ামী লীগের সহযোগীর ভূমিকাটুকুই পালন করবে শুধু। ফজলুল হক যখন ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে লড়াই করার জন্য দল গঠন করেছিলেন তখন সেটির নাম ছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি। মুজিব সেই 'কৃষক শ্রমিক' নিয়ে তা আওয়ামী লীগের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। এবং ফলে দাঢ়িয়েছিল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগ একটি বহু মতবিশিষ্ট রাজনৈতিক দল ছিল, যেটিকে মুজিব ধরে রেখেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়ভাকারী অনেক ব্যক্তি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগের মনোনয়নে এমপি হয়েছিলেন। বাক্ষালের সদস্যপদ স্বার জন্য খোলা ছিল। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে আসা এবং পারস্পরিক বিপরীতমুখী রাজনৈতিক মতান্দর্শের লোকদের কারণে একটি প্রচও গোলমেলে পরিষ্কৃতি তৈরি হয়েছিল। দলে কাদের ভূমিকা প্রদান হয়ে দাঁড়ায় তার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছিল।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার প্রথম সংবাদ সম্মেলনে ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২ মুজিব বলেছিলেন, একটি 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি'র পরিকল্পনা করার জন্ম 'কৃষি, শিল্প এবং আর্থিক খাতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রয়োজন হবে।' এই সংবাদ সম্মেলনেই মুজিব প্রথম সমরায় সমিতির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

প্রথম পঞ্চবর্ষিকী পরিকল্পনায় জোর দিয়ে বলা হয়েছিল, 'কৃষিকাজের সামাজিকীকরণ ছাড়া যে অর্থনীতির ৮০ ভাগেরও বেশি কর্মকাণ্ড কৃষি নির্ভর সেখানে সমাজসত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা যায় না।' এতে বলা হয় যে সমাজকে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, বিশেষত 'জমির মালিকানা' সংক্রান্ত বিষয়ে। এই পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ জমির মালিকানার সীমা কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছিল।

বাংলাদেশে হয়তো জমির বন্টন অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর মতো অসম ছিল না। কিন্তু যে দেশে শতকরা ৫২ ভাগ ভূমি মালিকানার আকার ২.৫ একরের নিচে এবং মাত্র শতকরা তিন ভাগ ভূমি মালিকানা ১২.৫ একরের উপরে সেখানে ৩৩.৩৩ একর ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে উচ্চ বলতে হবে। উদার কৃষি ভর্তুকির সুফল পাওয়েনে কেবল উত্তৃত কৃষিজীবীরা। এসব ভর্তুকি ভূলে নেয়ার সুযোগ ছিল এবং শাসক দলের ভেতর থেকেই সম্পন্ন কৃষকদের কৃষি আয়ের উপর করারোপের বিরোধিতা ছিল। ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি বিদ্যমান পাকা অবস্থায় সরকার এমন কোন পদক্ষেপ নিতে চাইছিল না যার ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতার আগেই নেয়া হয়েছিল এমন কিছু নীতির কথা আওয়ামী লীগের পুনর্বিবেচনা করা উচিত ছিল। পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে ৩৩.৩৩ একর ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে নির্ধারণ করাটা বৈপ্লাবিক সিদ্ধান্ত হলেও, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটি ছিল অতি উচ্চ।

কিছু বিদেশী অধিনীতিবিদ ১৯৭৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এসোসিয়েশানের সম্মেলনে ১০ একরের চেয়ে বেশি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়েই অধিগ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই পরামর্শ যদি যথার্থভাবে বাস্তবায়িত করা হতো তাহলে প্রতিটি ভূমিহীন পরিবার পেত মাত্র ০.৮ একর জমি। এর চেয়েও সাহসী হয়ে যদি ৪ একরকে ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হতো তাহলেও ভূমিহীন পরিবারগুলো গড়ে ০.৮ একর জমি পেত।

এটিও একটি ৬ সদস্যবিশিষ্ট পরিবার চালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না।

বেটসি হার্টম্যান এবং জেমস বয়েস বলেন, ‘এ থেকে প্রমাণিত হয় ভূমি সংস্কার প্রয়োজনীয় হলেও, বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যথেষ্ট নয়। জমির অধিকার পাওয়ার ফলে এদেশের দারিদ্র্য মানুষের সংকটের কেবল অর্ধেকই সমাধান হবে; সমস্যার বাকি অংশের সমাধান সম্ভব হবে সমবায় ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে।’ (ইন্টারন্যাশনাল পলিসি রিপোর্ট, সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসি, ওয়াশিংটন ডিসি)

বাংলাদেশের মোট চাষকৃত জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ২২.৫ মিলিয়ন একর। এ দিয়ে ৭৫ মিলিয়ন লোককে বাঁচিয়ে রাখতে হতো। মুজিব মার্ক্সবাদী না হলেও বিশ্বাস করতেন জাতি হিসেবে টিকতে হলে বাংলাদেশে সমবায় সমিতি দরকার ছিল। বাংলাদেশের একজন চলচিত্র পরিচালক এভাবে বলেছিলেন: ‘তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একটি পিংপং টেবিলে ফুটবল খেলা সম্ভব না।’

হার্ডার্ডের একটি গবেষক দল ১৯৭৪-এ দাবি করেছিল সঠিক চাষ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন চারগুণ বাড়ানো সম্ভব। এটি করা সম্ভব ছিল কেবল সমবায় পদ্ধতিতেই।

বেটসি হার্টম্যান এবং জেমস বয়েস বলেন, ‘কৃষি খাতে সমবায়ের ফলে বাংলাদেশের কৃষকরা আত্মনির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিতে পারবে, যা বিজিন্ন ও ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। অধিক শ্রম নির্ভর পদ্ধতিতে কৃষকরা যৌথভাবে সেচ ব্যবহাৰ নির্মাণ, নিষ্কাশন খাল খনন এবং বাধ নির্মাণ করতে সক্ষম হবে এবং এগুলোর ফলে তারা প্রাকৃতিক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে যা একা একা তাদের কেউই মোকাবেলা করতে সক্ষম হতো না। ঠিক যেমনটি আমাদের গ্রামের লোকেরা বলতেন, ‘একা একটি বাঁশ ভঙ্গুর, কিন্তু একটি বাঁশের আঁটি কোন ত্রুটী ভাঙা যায় না।’ সমবায়ের ফল গ্রামের ভূ-সম্পত্তির পরিবর্তে কৃষকরা নিজেরাই তাদের কাজের ফল ভোগ করবে- এমন ধারণা খুবই জনপ্রিয় ও অনুপ্রেরণাদায়ী হবে।’

২৬ মার্চ ১৯৭৫ সালে সোহরাওয়াদী উদ্যানে শাব্দিনতা দিবস উদয়াপনের জনসভায় মুজিব দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক এবং প্রশাসনিক নীতির ঘোষণা দিয়েছিলেন: এই কর্মসূচি অনুসারে, পরবর্তী পাঁচ বছরে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ৫০০ থেকে ৫০০০টি পরিবার থাকবে। জমি চাষ করার কাজটি সমবায় ভিত্তিতে করা হলেও জমির মালিকানা ঠিকই বহাল থাকবে। সমবায়ের ফলে বেকার ও ভূমিহীনদের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। জমির ফসল জমির মালিক, কৃষি শ্রমিক এবং সমবায় সমিতির মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার পরিকল্পনা ছিল। সকল কৃষি তৎপরতা এবং ওয়ার্ক প্রোগ্রাম ও টেস্ট রিলিফের মতো সকল কর্মসূচি পরিচালিত হবে সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে। এর ফলে সে সময় গ্রাম পর্যায়ে যে স্থানীয় সরকার ছিল সেগুলোর স্থান নিয়ে নিত সমবায় সমিতিগুলো।

দেশের সকল উপবিভাগগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করার কথা ছিল। বিদ্যমান জেলাগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করার পরিকল্পনা ছিল। প্রতিটি নতুন জেলার জন্য একটি করে প্রশাসনিক কাউপিল গঠনের কথা ও ছিল। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দল ও সরকারী কর্মকর্তাদের থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কাউপিল গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

একইভাবে দেশের সবচেয়ে স্কুল প্রশাসনিক ইউনিট অর্থাৎ থানাসমূহের জন্যও একটি থানা কাউপিল গঠন করার কথা ও বলা হয়েছিল।

জমির মালিক জমিতে যে ফসল হতো তার একটি অংশ পাবেন, তবে যার জমি যতক্ষণ অঞ্চল সে ততখানি বেশি ফসলের দাবিদার হবেন। এমনকি ভূমিহীন কৃষকরাও উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ পাবেন।

সর্বজনের রান্নাঘর ও শিশুলালন কেন্দ্রও এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্মসূচিতে বৃক্ষ ভাতার কথা ও উৎপ্রেক্ষিত ছিল।

স্কুল জমির মালিক যাদের ভূমি চাষ করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক না হলেও, তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ভূ-স্বামী ছিলেন, এমন কৃষকরা এই কর্মসূচির ফলে সুফল ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু, এসব কৃষককে উৎসাহিত করার জন্য, এই কর্মসূচির সুফল তাদের বুঝিয়ে কর্মসূচিতে তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বরং তারা ডয় পাছিলেন যে এই কর্মসূচির ফলে তাদের সর্বশেষ আশ্রয় যে সামান্য ভূমি সেটিও হয়তো তাদের থেকে কেড়ে নেয়া হতে পারে, আর তাদের এই ভীতিকেই কাজে লাগিয়েছিলেন যারা যে কোন পরিবর্তনের বিপক্ষে থাকেন এমন গোষ্ঠীগুলো।

একজন বাংলাদেশী কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘বহুমুখী কর্মসূচিটি অনেকে যতটা ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি বৈপ্লবিক ও সর্বান্তক ছিল। মুজিব যথেষ্ট

প্রতিতি ছাড়াই এটি শুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি এটি স্বার্থক করতে সক্ষম হতেন। যদি তিনি তা করতে সক্ষম হতেন তবে এর প্রভাব প্রতিবেশি দেশগুলোর উপরও পড়তো।'

বাংলাদেশের উপবিভাগগুলোকে জেলায় পরিণত করার ধারণাটি নতুন ছিল না। আইয়ুব খান ক্ষমতায় থাকা কালে এমন একটি পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) এর জন্য নেয়া হলেও পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার গভর্নর মোনেম খানের সেটি পছন্দ না হওয়ায় এই পরিকল্পনা নিয়ে আর এগোনো হয়নি। এই একই পরিকল্পনা আবার সামনে এসেছিল ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে আগে। নতুন জেলার প্রধানদের কি বলা হবে? গভর্নর মোনেম খানকে অপছন্দ করতেন এমন একজন প্রস্তাব করেছিলেন এসব নতুন জেলার প্রধানদেরকে গভর্নর পদবী দেয়ার জন্য। এই প্রস্তাব মেনেই মুজিব ১৯৭৪ সালে তার কর্মসূচির আওতায় যে নতুন জেলা তৈরি হবে সেগুলোর প্রধানদের গভর্নর পদবী দেন।

১৯৭৪ সালের সংকটের পর মুজিব একজন বদলে যাওয়া মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। যে সব কঠিন সিদ্ধান্ত তিনি নিতে দেরী করেছিলেন এ সময়ে এসে তিনি সেগুলো নিতে শুরু করেছিলেন। তিনি এ সময় বার বার বলতেন, ‘আমাকে একটা কিছু করতেই হবে।’

১৯৭৪ সালের শেষের দিকে তিনি কিছু ঝণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেন। ঝণ আদায়ও এ সময় শুরু হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয় যে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ ঐ বছরের এপ্রিলের মধ্যে তাদের সম্পদের হিসাব দাখিল করবেন। এপ্রিলে মুজিব দেশে ১০০ টাকা মূল্যমানের নোটগুলোর মুদ্রামূল্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দেশে এর চেয়ে বড় মূল্যমানের ব্যাংকনোটের মুদ্রামূল্য রাহিত করার ঘটনা এর আগে ঘটেনি। এ বিষয়ে মুজিব তখনকার অর্থমন্ত্রী এ. আর. মল্লিকের সাথে পরামর্শ কালে, মল্লিক তাকে বলেছিলেন, ‘আপনি হয়তো পরে আপনার সহকর্মীদের চাপে পড়ে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারেন।’ মুজিব তখন দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, ‘না! সে জন্যই আমি আপনাকে দিচ্ছি থেকে নিয়ে এসেছি।’ এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কেবল আপনি একাই থাকবেন। আমাকে একটি কিছু করতেই হবে। এদেশকে রক্ষা করতেই হবে।’

মুদ্রামূল্য রাহিত হওয়া নোটগুলোর বিপরীতে অর্থ প্রদান প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমিক হওয়ার কথা ছিল, এবং বিনিময় মূল্য শুরু হওয়ার কথা ৬০০ টাকা থেকে।

১০০ টাকার নোটের মুদ্রামূল্য রাহিত করার এ সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল। মুদ্রামূল্য কমতে শুরু করেছিল। মুদ্রা সরবরাহ সূচক ২৫ মার্চ ১৯৭৫-এ ২৩০ থেকে ৩৮ পয়েন্ট কমে ২৫ এপ্রিল ১৯৭৫-এ ১৯২-এ এসে দাঢ়ায়। এর আগে সংকুচিত মুদ্রা নীতির কারণে অভ্যন্তরীণ ঝণ ১৯৭৩-৭৪

অর্থবছরের ৩৩০২ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৯৭৪-৭৫-এ ১৫০১ মিলিয়ন টাকায় নেমে আসে, এবং ব্যাংকগুলোর আউটস্ট্যাডিং এডভাস ডিসেম্বর ১৯৭৪-এর ৮৫৭০ মিলিয়ন টাকা থেকে কমে জুন ১৯৭৫-এ ৮১২৩ মিলিয়ন টাকা হয়।

মুজিব হত্যার পর তার এই প্রগতিশীল উদ্যোগগুলোর বিপরীতমুখী যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। মোন্টাক রাষ্ট্রীর প্রধান চারটি আদর্শ- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িকতা তখনো অপরিবর্তিত ছিল এমন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু নতুন কর্তৃপক্ষ কেবল নামেই অসাম্প্রদায়িক ছিল। ১৯৭৪ সালের জুনে বিদেশী দাতা সংস্থা, বিদেশি ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্পোরেশন এবং যেসব বাঙালী বাণিজ্য, ফটকাবাজারী এবং নির্মাণ খাত থেকে অর্থ উপার্জন করছিলেন তারা মুজিবকে বিনিয়োগের সীমা ২.৫ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ মিলিয়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু এসব বাঙালী ব্যবসায়ী আর তাদের বিদেশী বন্ধুরা এতেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বিনিয়োগের সীমা আরো বাঢ়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন মোন্টাক।

যাদের এতো টাকা ছিল যে তার হিসাব তারা নিজেরাই জানতেন না এমন ব্যক্তিরা ১০০ টাকার নোটের মুদ্রামূল্য রহিত করার সিদ্ধান্তে স্ফূর্ত হয়েছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই মোন্টাক চাওয়া মাত্রই প্রদেয় বিনিয়ম মূল্য ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করেছিলেন।

পরবর্তীতে জানা গিয়েছিল রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় মোন্টাক ঢাকার একটি ব্যাংকে যে ৬৮,০০০ টাকা জমা রেখেছিলেন তার পুরোটুকুর বিনিয়ম মূল্যই তিনি তার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আদায় করে নিয়েছিলেন।

বিভৎস

প্রাথমিক বিহুলতা কাটিয়ে ওঠার পর আবারও মানুষজন ভালোবেসে শুক্ষা ভরে মুঝিবের কথা বলতে তরু করে। অনেক রাজনৈতিক নেতাই প্রকাশ্যে মুঝিবকে বঙ্গবন্ধু বলতে শুরু করেছিলেন। এমন কি সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাও তাকে বঙ্গবন্ধু বলছিলেন। একজন মন্ত্রী সতর্কভাবে একজন মেজর-জেনারেলকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনিও কি তাকে বঙ্গবন্ধু বলেন?’ তখন মেজর-জেনারেল উত্তর দিয়েছিলেন, ‘কেন নয়? আমি তার ছবি সরিয়ে ফেলিনি। আমার অফিসে এখনো স্টো রয়েছে।’

মোতাকের অবস্থা ক্রমেই জটিলতর হচ্ছিল, তিনি নানা উপটোকন দিয়ে সেনাবাহিনীর মন জয় করতে চাইছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতির এক নির্দেশে বলা হয়েছিল, ‘বিগত সাড়ে তিন বছর (মুঝিবে আমলে) সময়কালে দেশের সেনাবাহিনীকে যে উপক্ষা ও অসমান দেখানো হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে ‘জাতীয় জীবনে একটি সম্মানের স্থান দেয়ার’ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে।

মোতাক সেনাবাহিনীকে তোষণ করেছিলেন।

মুঝিবের মৃত্যুর চল্লিশতম দিনটি ১৯৭৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সারা বাংলাদেশে ভাৰ-গান্ধীর্যের সাথে পার্লিত হয়েছিল। এটি প্রকাশ্যে মোতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য অবীকার করা ছিল, এটি ছিল মুঝিবকে সম্পরিবারে হত্যার প্রতিবাদ।

মোতাক বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তার দিন মুরিয়ে আসছে বুৰাতে পেরে তিনি মুঝিব হত্যাকারীদের তার মানে তার নিজেকেও বাঁচানোর একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খুনীদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমা দেয়া হয়, কিন্তু এটি কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হয়নি।

মোতাক সরকারের বিরোধিতা ক্রমেই বাঢ়ছিল। জনরোষ ক্রমেই তীক্ষ্ণতর হচ্ছিল। ৩ অক্টোবর ১৯৭৫ একটি সম্প্রচারে মোতাক ‘১৮ মাস সময়ের মধ্যে’ সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনতার মন গলানোর চেষ্টা করেছিলেন।

সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে নিয়ে এসে তিনি দেশের গণতন্ত্রের এতেওটাই ক্ষতি করেছিলেন যে তা পুনরুদ্ধার করা খুবই কঠিন ছিল।

২/৩ নভেম্বরে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সরিয়ে নিজে সেনাবাহিনীর প্রধানের আসনে বসেন। হত্যাকারী মেজররাই প্রথমে লড়াই করার কথা ভাবলেও পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিচক্ষণতা সাহসের উন্নততর অংশ।

অর্ধবছরের ৩৩০২ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৯৭৪-৭৫-এ ১৫০১ মিলিয়ন টাকায় নেমে আসে, এবং ব্যাংকগুলোর আউটস্ট্যাডিং এডভাস ডিসেম্বর ১৯৭৪-এর ৮৫৭০ মিলিয়ন টাকা থেকে কমে জুন ১৯৭৫-এ ৮১২৩ মিলিয়ন টাকা হয়।

মুজিব হত্যার পর তার এই প্রগতিশীল উদ্যোগগুলোর বিপরীতমুখী যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। মোকাক রাষ্ট্রের প্রধান চারটি আদর্শ- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িকতা তখনো অপরিবর্তিত ছিল এমন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু নতুন কর্তৃপক্ষ কেবল নামেই অসাম্প্রদায়িক ছিল। ১৯৭৪ সালের জুনে বিদেশী দাতা সংস্থা, বিদেশি ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্পোরেশন এবং যেসব বাঙালী বাণিজ্য, ফটকাবাজারী এবং নির্মাণ খাত থেকে অর্থ উপার্জন করেছিলেন তারা মুজিবকে বিনিয়োগের সীমা ২.৫ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ মিলিয়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু এসব বাঙালী ব্যবসায়ী আর তাদের বিদেশী বন্ধুরা এতেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বিনিয়োগের সীমা আরো বাঢ়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন মোকাক।

যাদের এতো টাকা ছিল যে তার হিসাব তারা নিজেরাই জানতেন না এমন ব্যক্তিরা ১০০ টাকার নোটের মুদ্রামূল্য রহিত করার সিদ্ধান্তে স্ফূর্ত হয়েছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই মোকাক চাওয়া মাত্রই প্রদেয় বিনিয়ম মূল্য ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করেছিলেন।

পরবর্তীতে জানা গিয়েছিল রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় মোকাক চাকার একটি ব্যাংকে যে ৬৮,০০০ টাকা জমা রেখেছিলেন তার পুরোটুকুর বিনিয়ম মূল্যই তিনি তার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আদায় করে নিয়েছিলেন।

বিভৎস

প্রাথমিক বিহুলতা কাটিয়ে ওঠার পর আবারও মানুষজন ভালোবেসে শুক্ষা ভরে মুজিবের কথা বলতে শুরু করে। অনেক রাজনৈতিক নেতাই প্রকাশ্যে মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বলতে শুরু করেছিলেন। এমন কি সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাও তাকে বঙ্গবন্ধু বলছিলেন। একজন মন্ত্রী সতর্কভাবে একজন মেজর-জেনারেলকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনিও কি তাকে বঙ্গবন্ধু বলেন?’ তখন মেজর-জেনারেল উত্তর দিয়েছিলেন, ‘কেন নয়? আমি তার ছবি সরিয়ে ফেলিনি। আমার অফিসে এখনো সেটা রয়েছে।’

মোতাকের অবস্থা ক্রমেই জটিলতর হচ্ছিল, তিনি নানা উপটোকন দিয়ে সেনাবাহিনীর মন জয় করতে চাইছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ রাত্রিপতির এক নির্দেশে বলা হয়েছিল, ‘বিগত সাড়ে তিন বছর (মুজিবে আমলে) সময়কালে দেশের সেনাবাহিনীকে মে উপেক্ষা ও অসম্মান দেখানো হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে ‘জাতীয় জীবনে একটি সম্মানের স্থান দেয়ার’ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে।

মোতাক সেনাবাহিনীকে তোষণ করেছিলেন।

মুজিবের মৃত্যুর চালিশতম দিনটি ১৯৭৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সারা বাংলাদেশে ভাৰ-গাঞ্জীর্ধের সাথে পালিত হয়েছিল। এটি প্রকাশ্যে মোতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য অর্থীকার করা ছিল, এটি ছিল মুজিবকে সপরিবারে হত্যার প্রতিবাদ।

মোতাক বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তার দিন মুরিয়ে আসছে বুৰাতে পেরে তিনি মুজিব হত্যাকারীদের তার মানে তার নিজেকেও বাঁচানোর একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খনীদের রাত্রিপতির ক্ষমা দেয়া হয়, কিন্তু এটি কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হয়নি।

মোতাক সরকারের বিরোধিতা ক্রমেই বাঢ়ছিল। জনরোষ ক্রমেই তীক্ষ্ণতর হচ্ছিল। ৩ অক্টোবর ১৯৭৫ একটি সম্প্রচারে মোতাক ‘১৮ মাস সময়ের মধ্যে’ সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনতার মন গলানোর চেষ্টা করেছিলেন।

সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিতে নিয়ে এসে তিনি দেশের গণতন্ত্রের এতোটাই ক্ষতি করেছিলেন যে তা পুনরুদ্ধার করা খুবই কঠিন ছিল।

২/৩ নভেম্বরে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ একটি রক্তপাতহীন অভ্যাসনের মাধ্যমে মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সরিয়ে নিজে সেনাবাহিনীর প্রধানের আসনে বসেন। হত্যাকারী মেজররা প্রথমে লড়াই করার কথা ভাবলেও পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিচক্ষণতা সাহসের উন্নততর অংশ।

লেফটেনেন্ট কর্নেলরা তার পরিবার এবং সতীর্থ চক্রান্তকারীদের নিয়ে ও নভেম্বর ১৯৭৫ ব্যাংককে পাড়ি জমান। কিন্তু ঢাকা ছাড়ার আগে তারা এটা নিশ্চিত করেছিলেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চার জন রাজনৈতিক নেতা এবং বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ চারজন সহযোগী যাতে জীবিত না থাকেন।

মুজিব হত্যার ৮ দিন পর ২৩ আগস্ট ১৯৭৫ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, এম. মনসুর আলী এবং এ. ইইচ. এম. কামরুজ্জামান এই চার নেতাকে সেনা আইনের আওতায় ফ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। ও নভেম্বর রাতে কিছু সেনা সদস্য কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করে এবং ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে এই চার নেতাকে হত্যা করে। খুনীরা দাবি করেছিল, তারা রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছিল, মোতাক সে সময় রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

সামরিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এমন যে চারজন মাত্র নেতা ছিলেন তাদের সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরক্তিক্ষেত্রে যে চক্রান্ত শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়েছিল।

ব্যাংককে পৌছেই ফার্মক দ্রুত পাকিস্তান ও মার্কিন দুতাবাসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। মুজিবকে হত্যা করার জন্য তিনি কোন অনুত্তাপ দেখাননি, 'না, তার জন্য কথনো নয়।' তিনি বলেছিলেন। তার মতে মোতাক মুজিবকে উৎখাত করার চক্রান্তের উদ্দেশ্য হলেও পরিকল্পনার বিস্তারিত জানতেন না।

কিসিং এর কনটেম্পোরারি আর্কাইভে উল্লিখিত রয়েছে যে, যারা মুজিবকে হত্যায় নেতৃত্ব দিয়েছেন তারাই 'সেনা সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এমন' চার নেতাকে হত্যা করেছিল বলে ফার্মক স্বীকার করেছিলেন।

১২ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর রেডিও বাংলাদেশ জেল হত্যার ঘবর প্রচার করেছিল। সারা দেশে আতঙ্ক আর ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছিল।

রেডিওতে বলা হয় রাষ্ট্রপতি মোতাক জেলের ভেতর 'চারজন প্রধ্যায়ত ব্যক্তি'র হত্যার সাথে কারা জড়িত তা খুঁজে বের করার জন্য এবং কি উপায়ে ঐ অপরাধীরা নিরাপদে পালিয়ে যেতে পেরেছিল তা তদন্ত করার জন্য তিন জন বিচারককে নিয়ে গঠিত একটি কমিশনকে নিয়োগ করেছেন।

৫ নভেম্বর ১৯৭৫ ঢাকায় সাধারণ ধর্মস্থ ডাকা হয়েছিল; ছাত্রা মোতাকের পদত্যাগ এবং মুজিব ও চার নেতার হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে রাত্তায় যিছিল বের করেছিল।

জঘন্য চক্রান্তের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ৮০ দিন পর মোতাককে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম মোস্তাকের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি ৬ নভেম্বর শপথ গ্রহণ করেন। এই একই দিনে এক সম্প্রচারে তিনি বলেছিলেন-

‘১৫ আগস্টে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেয়া এবং এখনো বাহিনীতে আছেন এমন কিছু সেনা কর্মকর্তা একটি উত্থান মঞ্চস্থ করেন যাতে রাষ্ট্রপতি সপরিবারে নিহত হন। খোদকার মোস্তাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন এবং দেশে সামরিক আইন জারি করেন। প্রকৃত ঘটনা হলো কোনভাবেই সেনা বাহিনী যা ঘটেছে তার সাথে যুক্ত ছিল না।’ (এখানে জোর দেয়া হয়েছিল)

‘জনগণ আশা করেছিল আইন শৃঙ্খলা পরিষ্কৃতি স্বাভাবিক হবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আমরা সবাই হতাশ হয়েছি। দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর উপরে সাম্প্রতিক অতীতে কয়েকজন বরেণ্য রাজনৈতিক নেতাকে কারাবন্দী অবস্থায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।’

সায়েম সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি বা ‘সম্ভব হলে তার আগেই’ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

চার জন নেতার হত্যার নিদ্দা জানিয়ে ৬ নভেম্বর একজন ভারতীয় মুখ্যপ্রাপ্ত বলেছিলেন, বাংলাদেশে নৃশংসভাবে চারজন রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করার খবরে ভারত সরকার ও সারাদেশের মানুষ আতঙ্কিত ও গভীর শোকাহত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর আবার এমন হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের বঙ্গসূলভ জনগণের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমরা এসব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নিদ্দা জানাই এবং আমাদের বঙ্গসূলভ প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হারানোর শোকের সাথে সমব্যৰ্থী। আমাদের মনের গভীরে বিশ্বাস রয়েছে এত সব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরও বাংলাদেশের মানুষ তাদের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সম্ম হবে, সে লক্ষ্যে এইসব নেতারা যারা বেঁচেছেন, কাজ করেছেন এবং জীবন দিয়েছেন জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, তারা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবেন।’

এই রক্তাক্ত ঘটনা প্রবাহে আরও একটি মোচড় ছিল। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে একটি সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফকে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ উৎখাত করা হয়েছিল। খালেদ মোশাররফ এবং আরও ৪০ জনেরও বেশি সেনা কর্মকর্তা এই বিদ্রোহে নিহত হয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট

৩০ মে ১৯৮১ সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার খবর প্রচারিত হয়। সাত ঘণ্টা পরে রেডিওতে চট্টগ্রাম ব্রিগেডের প্রধান মেজর-জেনারেল মঞ্জুর এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে প্রচারিত হয়। মঞ্জুর ছিলেন জিয়ার একজন সাবেক বন্ধু। সব কিছুই ঠিক জায়গামতো বসে যাচ্ছিল। এটিকে একটি শ্রীক ট্র্যাজেডির মতোই অপরিহার্য মনে হচ্ছিল।

জিয়া ও মঞ্জুর এক সময় ভালো বন্ধু ছিলেন, কিন্তু ১৯৭৭-এ তারা একে অপরের খেকে দূরে সরে যান। ১৯৭৭ সালে দুটি বিদ্রোহ ঘটেছিল- প্রথমটি ৩০ সেপ্টেম্বরে বগুড়ায় এবং দ্বিতীয়টি ২ অক্টোবরে ঢাকায়। ২০০ জনেরও বেশি ২ অক্টোবরের বিদ্রোহে নিহত হয়েছিলেন, এবং সেনা ও বিমান বাহিনীর ৩৭ জনেরও বেশি সদস্যকে এই বিদ্রোহে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার তিনটি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে-মোতাকের নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী গণতান্ত্রিক লীগ, মঙ্গোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি এবং জাতীয় সমাজবাদী দল (জাসদ নামে পরিচিত)।

এই অভূত্যানের চেষ্টা, যা প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল ‘আগের যে কোন কিছুর চেয়ে বেশি পরিমাণে জিয়া সরকারের আত্মবিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।’ ঢাকায় থাকা সেনা কর্মকর্তাদের অন্যত্র বদলি করে দেয়া হয়। ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডারকে খুশোরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল, মেজর-জেনারেল দন্তগীরকে পদচূড় করে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের পদ দেয়া হয়েছিল। চীফ অফ জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল মঞ্জুরকেও একটি কৃতনৈতিক দায়িত্ব নেয়ার প্রস্তাৱ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেছিলেন। তাকে চট্টগ্রাম ব্রিগেডের কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। মঞ্জুর প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

তার জন্য ত্রুটি হতে পারেন এমন যে কোন ব্যক্তিকেই জিয়া সতর্কভাবে সরিয়ে দিতেন। এবং তিনি অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেয়ার পরও তিনি ঢাকা সেনানিবাসেই থাকতেন। তিনি সব সময়েই প্রায় সকারে থাকতেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অথবা বিদেশের মাটিতে। একজন সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, ‘এতে করে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার সত্ত্বাবনা কর্মে।’

তার প্রতি মঞ্জুরের ঘৃণার তীব্রতার কথা জিয়ার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু চট্টগ্রামে বিএনপির মধ্যে যে গুরুতর বিভেদ দেখা দিয়েছিল তা মেটানো জরুরি ছিল। তিনি ইতিমধ্যেই বিএনপি থেকে কিছু সদস্যকে বহিকার করেছিলেন এবং আরও কিছু সদস্যকে বহিকার করতে যাচ্ছিলেন।

চট্টগ্রামের সন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে একটি বৈঠক শেষ করে রাতের জন্য বিশ্রাম নিতে তিনি চট্টগ্রাম রেস্ট হাউসে ছিলেন। ঢাকায় তার স্তুর কাছ থেকে তার কাছে একটি ফোন এসেছিল। তিনি স্তুরে আশ্বস্ত করেছিলেন যে সব ঠিক আছে এবং পরদিনই তিনি ঢাকা ফিরছেন। কিন্তু ছায়ায় তখন মৃত্যু ঘোরাফেরা করছিল।

১৯৭১-এর মার্চ যখন পাক বাহিনী বাংলাদেশ ওপর হামলা চালায় তখন মণ্ডুর শিয়ালকোটে দায়িত্বরত ছিলেন। প্রথমে মণ্ডুর তাহের ও জিয়াউদ্দীন নামে আরও দুজন বাঙালী সেনা কর্মকর্তা যারা শিয়ালকোট হয়ে ভারতে পালাচ্ছিলেন তাদের সাথে যোগ দিতে আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু তার স্তু শিয়ালকোট থেকে পালানোর জন্য তাকে জোর করেছিলেন। তিনি স্তুরে নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুক্তে অংশ নিয়েছিলেন।

এরপরও চীন তার পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকাতে যত তৎপরতা চালিয়েছে তা জেনেও মণ্ডুর চীনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এবং আর সব চীনগাঁহী বাঙালীর মতোই মণ্ডুরও ছিলেন মুজিব-বিরোধী। তিনি তার স্বত্ত্বাকাঞ্চনের প্রায়ই বলতেন, 'আমরা যখন লড়াই করছিলাম মুজিব তখন পাকিস্তানের জেলে আরাম আয়েসে ছিলেন।' পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সন্তুষ্ট সংস্কৃতিতে অভ্যন্ত মণ্ডুর কখনোই গণ বাহিনীতে বিশ্বাস করতে পারেননি। তার মতে কেবল অত্যাধুনিক অঙ্গে সজ্জিত একটি সশস্ত্র বাহিনীই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে পারে এবং সেনা বাহিনীর প্রতি মুজিবের অবজ্ঞার কারণে মুজিবের প্রতি তিনি বিশ্বুক্ত ছিলেন।

১৯৭৪ সালের শেষের দিকে মণ্ডুর দিল্লীতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রতিরোধ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৭৫-এর জুনে তাকে ব্রিগেডিয়ার পদ দেয়া হয়- এখনো বয়স ৩৫ পেরোয়ানি এমন একজন ব্যক্তির জন্য এটি ছিল একটি অতি উচ্চ পদ। কিন্তু এরপরও তার মনে হয়েছিল কূটনৈতিক পদে নিয়োগাটি এক ধরণের শাস্তি ছিল।

দিল্লীতে থাকার সময়টা মণ্ডুর পড়ালেখার কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি মূলত রাজনৈতিক গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন; তিনি ভারতসহ অন্যান্য দেশের সংবিধান পড়েছিলেন। কেউ কেউ ভেবেছিলেন তার মনের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আসলে তিনি সেই দিনটির অপেক্ষা করছিলেন যেদিন তিনিও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবেন। তিনি একজন উচ্চকাঞ্চনী ব্যক্তি ছিলেন।

মুজিবের নিহত হওয়ার দিনে যখন মণ্ডুরের কিছু ভারতীয় বক্তু তার সাথে দেখা করতে যান তখন তারা মণ্ডুরকে মুজিবের মৃত্যু উপলক্ষে উৎসব করতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সব সময়ই মুজিবের সমালোচনা করতেন, কিন্তু মণ্ডুর এতেটাই অমানবিক ছিলেন যে নারী ও শিশুরা মুজিবের সাথে নিহত হয়েছিলেন তাদের জন্যও তার মনে কোন করমণা হয়নি।

মঙ্গুর আকাশ পথে দ্রুত দিল্লী থেকে ঢাকায় এসেছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন তার বক্তু জিয়াউর রহমান তখন সেনা প্রধান হওয়ার ফলে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু জিয়া নিজে তখনো পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিলেন এবং মঙ্গুরকে অপেক্ষা করতে বলেন। এই উপদেশটি যথার্থ প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৭৫ এর ৩ নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ মোন্টাক সরকারকে উৎখাত করেন এবং জিয়াকে গৃহবন্দী করেন এবং নিজেকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ঘোষণা করেন। মঙ্গুর ভীত হয়েছিলেন, কারণ খালেদ মোশাররফের সাথে তার শক্ততা ছিল। কিন্তু দ্রুতই তার ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ তাহেরের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতি-অভ্যন্তর খালেদ মোশাররফ নিহত হন। তাহের জিয়াকে মুক্ত করেন এবং জিয়াকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেন।

খালেদ মোশাররফ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে মোন্টাকের স্থলে রাষ্ট্রপতি করেছিলেন। সংবিধানকে কোন মাত্রায় সম্মুক্ত রাখতে সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি পদে বাহাল রাখা হয়। সায়েম তখন প্রধান সেনা আইন প্রশাসকও ছিলেন এবং তিনি বাহিনীর প্রধানকে উপ প্রধান সেনা আইন প্রশাসক করা হয়েছিল। জিয়াও সে সময় তিনজন উপপ্রধান সেনা আইন প্রশাসকদের একজন ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন তিনি জনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকা রেডিওতে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ একটি আবেগঘন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল; কৃতজ্ঞ জিয়া তাহেরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তাহের জিয়াকে উক্তার করেছিলেন। এর পরদিন তাহেরের দল জাসদের সভাপতি ও মহাসচিবকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু সৈনিকরা যারা কিছু সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করেছিল, তারা বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে ছিল; তারা কোন সেনা কর্মকর্তাবিহীন একটি সেনা বাহিনী চাইছিল। জাসদ নেতারা যে সিপাহী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সেটিকে তারা নিজেরা একটি বিপ্লব বলছিলেন। হয়তো তাদের নিজস্ব তত্ত্বের ভিত্তিতে তাদের মনে হচ্ছিল তখন সৈনিকদের কমিটি গঠন করার সময় এসে গিয়েছিল।

সেনা কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ হারানোর আগেই আঘাত হেনেছিল। যে সমস্ত জাসদ নেতাকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল তাদের ২৩ নভেম্বর ১৯৭৫ আবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর পরদিন তাহেরকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এমন কিছু ঘটতে পারে জাসদ এমনটি ভাবতেও পারেন। জাসদকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়েছিল, অন্তত অস্থায়ীভাবে।

জিয়ার এ সময় তার বকুল মঞ্চেরের কথা মনে পড়েছিল, মঞ্চের সিপাহীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি মঞ্চুরকে ঢাকায় ডেকে পাঠান এবং তাকে চীফ অফিসে জেনারেল স্টাফ করেন।

জিয়ার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মঞ্চের প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং সুবীর ছিলেন। তিনি জিয়াকে একজন সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী যিনি চেতনায় অসাম্প্রদায়িক-এ হিসেবেই সবার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। এয়ার ভাইস মার্শাল এম. জি. তওয়ার এবং বিয়ার এডমিরাল মোশাররফের তুলনায় জিয়াকে অনেকের কাছেই মধ্যমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণকারী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সায়েমের সহযোগিতায় তওয়ারকে সরিয়ে দিয়ে প্রধান সেনা আইন প্রশাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, জিয়া সায়েমকেও আর অংশীদার রাখেননি।

জিয়া কাউকেই বিশ্বাস করতেন না এবং কাউকে প্রয়োজনীয় মনে না হলে তাকে দূর করে দিতে কোন ছিধা করতেন না। যে তাহের তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন সেই তাহেরই ছিলেন জিয়ার প্রথম শিকার। ২১ জুলাই ১৯৭৬ একটি গোপন সেনা আদালত যা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল, সেটিতেই তাহেরের ফাঁসীর রায় কার্যকর করা হয়। এই বিচার ছিল প্রসন্ন।

জিয়া নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করার পর একটি গণভোটের আয়োজন করেছিলেন। দাবি করা হয় ঐ গণভোটে শতকরা আশি ভাগ ভোটার অংশ নিয়েছিলেন এবং শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট জিয়ার পক্ষে পড়েছিল। ৩১ মে ১৯৭৭ লক্ষনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় সাইমন উইনচেস্টার বলেছিলেন, ‘জেনারেলের প্রতি আগ্রহ ভোটারদের চেয়ে পোলিং অফিসারদের মধ্যেই বেশি দেখা যাচ্ছিল।’

জিয়া বহু দিনের প্রতিশ্রূত এবং প্রায়ই ডঙ করা সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রূতি পূরণের আগে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ‘জাগদল’ নামে একটি দল শুরু করার প্রক্রিয়াকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া।

৩ জুন ১৯৭৯ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়া জয়ী হবেন এটি সবাই আগে থেকে জানলেও যে ব্যবধানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেনাপ্রধানের দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাণু জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীর দলকে হারিয়ে জিয়া জয়লাভ করেছিলেন তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠিকেছিল।

যদিও ‘জাগদল’ গঠনে জিয়াই ছিলেন মূল অনুপ্রেরণা তারপরও, তিনি নিজে এটিতে কখনো যোগ দেন নি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর জিয়া এ দলটি ধ্রংস হতে দিয়েছিলেন। দলটির কবর দেয়ার দায়িত্ব তিনি উপরাষ্ট্রপতি আদুস সান্তারের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন।

মঙ্গুর আকাশ পথে দ্রুত দিল্লী থেকে ঢাকায় এসেছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন তার বক্তু জিয়াউর রহমান তখন সেনা প্রধান হওয়ার ফলে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু জিয়া নিজে তখনো পরিষ্কৃতি বোঝার চেষ্টা করছিলেন এবং মঙ্গুরকে অপেক্ষা করতে বলেন। এই উপদেশটি যথার্থ প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৭৫ এর ৩ নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ মোন্টাক সরকারকে উৎখাত করেন এবং জিয়াকে গৃহবন্দী করেন এবং নিজেকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ঘোষণা করেন। মঙ্গুর ভীত হয়েছিলেন, কারণ খালেদ মোশাররফের সাথে তার শক্ততা ছিল। কিন্তু দ্রুতই তার ডয় দূর হয়ে গিয়েছিল। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ তাহেরের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতি-অভূত্বানে খালেদ মোশাররফ নিহত হন। তাহের জিয়াকে মুক্ত করেন এবং জিয়াকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেন।

খালেদ মোশাররফ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে মোন্টাকের হালে রাষ্ট্রপতি করেছিলেন। সংবিধানকে কোন মাত্রায় সম্মুত রাখতে সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি পদে বাহল রাখা হয়। সায়েম তখন প্রধান দেনা আইন প্রশাসকও ছিলেন এবং তিনি বাহিনীর প্রধানকে উপ প্রধান সেনা আইন প্রশাসক করা হয়েছিল। জিয়াও সে সময় তিনজন উপপ্রধান সেনা আইন প্রশাসকদের একজন ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন তিনি জনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকা রেডিওতে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ একটি আবেগঘন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল; কৃতজ্ঞ জিয়া তাহেরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তাহের জিয়াকে উদ্ধার করেছিলেন। এর পরদিন তাহেরের দল জাসদের সভাপতি ও মহাসচিবকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু সৈনিকরা যারা কিছু সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করেছিল, তারা বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে ছিল; তারা কোন সেনা কর্মকর্তাবিহীন একটি সেনা বাহিনী চাইছিল। জাসদ নেতারা যে সিপাহী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সেটিকে তারা নিজেরা একটি বিপ্লব বলছিলেন। হয়তো তাদের নিজস্ব তত্ত্বের ভিত্তিতে তাদের মনে হচ্ছিল তখন সৈনিকদের কমিটি গঠন করার সময় এসে গিয়েছিল।

সেনা কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ হারানোর আগেই আঘাত হেনেছিল। যে সমস্ত জাসদ নেতাকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল তাদের ২৩ নভেম্বর ১৯৭৫ আবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর পরদিন তাহেরকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এমন কিছু ঘটতে পারে জাসদ এমনটি ভাবতেও পারেনি। জাসদকে নিয়ির করে দেয়া হয়েছিল, অন্তত অস্থায়ীভাবে।

জিয়ার এ সময় তার বক্ষ মশুরের কথা মনে পড়েছিল, মশুর সিপাহীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি মশুরকে ঢাকায় ডেকে পাঠান এবং তাকে চীফ অফিসে জেনারেল স্টাফ করেন।

জিয়ার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মশুর প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং সুবী ছিলেন। তিনি জিয়াকে একজন সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী যিনি চেতনায় অসাম্প্রদায়িক-এ হিসেবেই সবার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। এয়ার ভাইস মার্শাল এম. জি. তওয়ার এবং রিয়ার এডমিরাল মোশাররফের ডুলনায় জিয়াকে অনেকের কাছেই মধ্যমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণকারী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সায়েমের সহযোগিতায় তওয়ারকে সরিয়ে দিয়ে প্রধান সেনা আইন প্রশাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, জিয়া সায়েমকেও আর অংশীদার রাখেননি।

জিয়া কাউকেই বিশ্বাস করতেন না এবং কাউকে প্রয়োজনীয় মনে না হলে তাকে দূর করে দিতে কোন বিধা করতেন না। যে তাহের তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন সেই তাহেরই ছিলেন জিয়ার প্রথম শিকার। ২১ জুলাই ১৯৭৬ একটি গোপন সেনা আদালত যা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল, সেটিতেই তাহেরের ফাঁসীর রায় কার্যকর করা হয়। এই বিচার ছিল প্রহসন।

জিয়া নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করার পর একটি গণভোটের আয়োজন করেছিলেন। দাবি করা হয় ঐ গণভোটে শতকরা আশি ভাগ ভোটার অংশ নিয়েছিলেন এবং শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট জিয়ার পক্ষে পড়েছিল। ৩১ মে ১৯৭৭ লক্ষনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় সাইমন উইনচেস্টার বলেছিলেন, ‘জেনারেলের প্রতি আগ্রহ ভোটারদের চেয়ে পোলিং অফিসারদের মধ্যেই বেশি দেখা যাচ্ছিল।’

জিয়া বহু দিনের প্রতিশ্রূত এবং প্রায়ই ভঙ্গ করা সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রূতি পূরণের আগে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ‘জাগদল’ নামে একটি দল তৈর করার প্রক্রিয়াকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া।

৩ জুন ১৯৭৯ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়া জয়ী হবেন এটি সবাই আগে থেকে জানলেও যে ব্যবধানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেনাপ্রধানের দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাণ জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীর দলকে হারিয়ে জিয়া জয়লাভ করেছিলেন তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল।

যদিও ‘জাগদল’ গঠনে জিয়াই ছিলেন মূল অনুপ্রেরণা তারপরও, তিনি নিজে এটিতে কখনো যোগ দেন নি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর জিয়া এ দলটির ধর্মস হতে দিয়েছিলেন। দলটির কবর দেয়ার দায়িত্ব তিনি উপরাষ্ট্রপতি আদুস সান্তারের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নামে জিয়া আরেকটি দল গঠন করেছিলেন, যে দলটির তিনিই ছিলেন সভাপতি। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ৩০০ আসনের ২০৯ টিতে বিএনপি জয়লাভ করেছিল।

জাতীয় সংসদে বিএনপি নেতা কে হবে তা বিএনপির আইন প্রণেতারা নন, বরং জিয়া নিজেই ঠিক করেছিলেন। জিয়া শাহ আজিজুর রহমানকে এ জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, এই শাহ আজিজুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর পরই পাকিস্তানি সামরিক জাতকে সহযোগিতা করার অভিযোগে আটক হয়েছিলেন।

জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধের নায়ক হিসেবেই দেখানো হয়েছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা ছিল প্রশা্বিক। এখানে আমরা সেই আলোচনায় যাবো না। কিন্তু, কেন এই মুক্তিযুদ্ধের নায়ক স্বাধীনতা-বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন?

জিয়া একটি গোষ্ঠীকে অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই ভারসাম্য রক্ষার খেলা তিনি দীর্ঘ দিন ধরে খেলতে পারলেও এই প্রক্রিয়ায় এক কালে যারা তাকে শুন্দি করতো তাদের সাথে দূরত্ত তৈরি করেছিলেন। তার অসংখ্য সমর্থক ছিল এবং হয়তো প্রকৃত ভক্তও ছিল কিছু; কিন্তু তার কোন বক্তু ছিল না।

সংসদে বিএনপির নিরুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু বিএনপি প্রকৃত অর্থে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। বিএনপির ভাসন ঠেকানো জিয়ার জন্য জন্মেই কঠিন হয়ে পড়ছিল। এটা বলা যায় যে, জিয়ার মৃত্যুর পর বিএনপি দ্রুতই বিভাজিত হয়ে পড়বে।

ভারপ্রাণ রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার মূলত পশ্চিমবঙ্গের লোক এবং বাংলাদেশে তার কোন ভিত্তি নেই। সত্যি কথা হলো তিনি কোন রাজনীতিকই নন। তার একমাত্র যোগ্যতা হলো তিনি মানিয়ে নিতে পারেন। তিনি কেবল একজন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিই হতে পারেন।

শাহ আজিজুর রহমানও পশ্চিমবঙ্গের লোক, তিনি অভিজ্ঞ রাজনীতিক হলেও এখন খুবই ক্লান্ত প্রবীণ মাত্র।

১৫ আগস্ট যারা বিভৎস নাটক মঞ্চে করেছিল তারা কোথায়?

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর বন্দকার মোতাক আহমদ ঐ একই দিনে জাতির উদ্দেশে সম্প্রচারিত ভাষণে বলেছিলেন, ‘আমি বিধানতাবে ঘোষণা করতে চাই এই সরকার কোন ধরণের দুরীতি, সজনপ্রাপ্তি এবং অসামাজিক কার্যক্রমের সাথে আপোষ করবে না।’ পরিহাসের বিষয় হলো পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে দুরীতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল এবং তাকে পাঁচ বছরের কারাবাসের সাজা দেয়া হয়েছিল।

১৯৮০ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে যুক্তি পাওয়ার পর মোন্টাক
রাজনৈতিকভাবে অনেক সক্রিয় হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোন অগ্রগতি করতে
পারেননি।

এখন মোন্টাকের দাঢ়ি হয়েছে এবং তিনি একটি লঘা কোর্টি পড়ায় তাকে একজন
যোদ্ধার মতো দেখায়। তার দল- গণতান্ত্রিক লীগকে প্রায় কোনভাবেই মুসলিম
লীগ থেকে আলাদা করা যায় না। তার কোন জনপ্রিয়তা নেই এবং তার বয়সও
তার বিরুদ্ধে; তবুও তিনি চক্রান্তের রাজনীতির একজন পুরোনো খেলোয়াড়।

সংক্ষিপ্ত কারাবাসের পর তাহেরউদ্দীন ঠাকুর রাজনীতি ছেড়ে দাঢ়ি রেখে এখন
ধর্মের মধ্যে শান্তি খুঁজছেন। এখন তিনি বেশ খানিকটা সময় মাজারে ব্যয় করেন,
পাশাপাশি ব্যবস্থা করে থাকেন।

মাহবুবুল আলম চাহী ব্যস্ত থাকেন সমবায় সমিতি কার্যক্রম উৎসাহিত করা নিয়ে।

১৯৭৯ সালের জুনে ব্রিটিশ সরাই মন্ত্রণালয় আব্দুর রশিদের লভনে আশ্রয় প্রার্থনা
খারিজ করে দেয় এবং বেলজিয়ান মেরিন সেনাদের মাধ্যমে ওস্টেন্ট থেকে ২৭
জুন ১৯৭৯ সন্ধ্যা ৬ টা ২০ মিনিটে তাকে সরিয়ে দেয়। ঐ নির্দেশে বলা হয়,
'আমার কাছে মুজিব হত্যার আপনার জড়িত থাকার যে তথ্য আছে তার ভিত্তিতে
আমি মনে করছি আপনাকে সরিয়ে দেয়া জনস্বার্থের জন্য মঙ্গলজনক।'

অথচ যে সেনা কর্মকর্ত্তা ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হত্যাকাণ্ডলো কার্যকর করেছিলেন
তাদের সবাইকেই বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী মিশনগুলোতে কূটনৈতিক দায়িত্ব দেয়া
হয়েছে: লেফটেনেন্ট কর্নেল শরিফুল হক (ভালিম), ফাস্ট সেক্রেটারি (চীন);
লেফটেনেন্ট কর্নেল আজিজ পাশা, ফাস্ট সেক্রেটারি (আর্জেন্টিনা); মেজর
শাহরিয়ার, সেকেন্ড সেক্রেটারি (ইন্দোনেশিয়া); মেজর বজ্রুল হসা, সেকেন্ড
সেক্রেটারি (পাকিস্তান); মেজর রাশেদ চৌধুরি, সেকেন্ড সেক্রেটারি (সৌদি
আরব); মেজর নূর, সেকেন্ড সেক্রেটারি (ইরান); মেজর শরিফুল হসাইন, থার্ড
সেক্রেটারি (কুয়েত); ক্যাপ্টেন কিসমত হসাইন, থার্ড সেক্রেটারি (আরুধাবি);
লেফটেনেন্ট খায়রুজ্জামান, থার্ড সেক্রেটারি (কানাডা); লেফটেনেন্ট আব্দুল
মজিদ, থার্ড সেক্রেটারি (সেনেগাল)।

কেবল লেফটেনেন্ট কর্নেল ফার্মক রহমান এবং লেফটেনেন্ট কর্নেল আবদুর
রশিদকেই কোন কূটনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়নি। অবশ্য প্রস্তাব
দিলেও তারা কোন কূটনৈতিক দায়িত্ব নিতেন না। তারা এভেটাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী
ছিলেন যে সর্বোচ্চ পদের ক্ষেত্রে কেবল কিছুর প্রস্তাব তারা গ্রহণ করতেন না। তার
ওপর, তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করেছিলেন।

ফার্মক লিবিয়ায় বসবাস করছিলেন, ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে
ঢাকায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। তাকে বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের

চেষ্টা করায় আটক করা হয়েছিল। তার কারা জীবন শেষ কর্তৃর পর ১৯৮০ সালের ১ মার্চ তাকে ময়মনসিংহ কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। ৭ মার্চ ১৯৮০ তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে লিবিয়ায় পাড়ি জমান। তার বোনের স্বামী রশিদও লিবিয়ায় বসবাস করছিলেন।

২ নভেম্বর ১৯৭৫ ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দেন আহমদ, ম. মনসুর আলী এবং এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয়েছিল। এই চারজনই মুক্তিযুক্তকালীন পাঁচ সদস্যের প্রবাসী সরকারের সদস্য ছিলেন এবং মুজিবের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন।

২ নভেম্বরের এই হত্যাকাণ্ডের খবর রেডিওতে প্রচারিত হয় ৪ নভেম্বর হত্যাকারী মেজররা পালিয়ে যাবার পর এবং রাষ্ট্রপতি মোস্তাক তিন জন বিচারককে সদস্য হিসেবে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশনকে নিয়োগ দিয়েছেন যারা ‘এই ঘটনা’ তদন্ত করবেন এবং ‘যে পরিস্থিতিতে দুর্ভুত্রা (মেজররা) পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে’ তা ব্যক্তিয়ে দেখবে।

কিন্তু পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পরও ঐ কমিশন যদি কিছু পেয়ে থাকে তা জানাবে হয়নি।

যে কনিষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের বিভিন্ন কৃটনৈতিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের যে সমস্ত রাষ্ট্রদণ্ডের অধীনে কাজ করার কথা তাদের চেয়েও ক্ষমতাধর। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আতঙ্কের মধ্যে আছেন। এরকম খবর আছে যে তাদের মধ্যে দুজন— লেফটেনেন্ট কর্নেল শরিফুল হক (ডালিম) এবং মেজর হৃদা সরকারী দায়িত্ব পরিত্যাগ করেছেন এবং পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই দুজন জিয়াউর রহমানকে উৎখাতের চক্রান্তে জড়িত সেনা কর্মকর্তাদের অন্যতম বলে জানা গেছে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তোরে যে আক্রমণকারী দলটি মুজিবের বাড়িতে হামলা করেছিল হৃদা সে দলটির নেতৃত্বাদাকারী কর্মকর্তা ছিলেন।

ডালিমই ঢাকা রেডিওতে মুজিবের নিহত হওয়ার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন।

হাসিনা এবং তার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া তাদের দুই সন্তানকে নিয়ে দিল্লীতে বসবাস করেন। রেহানা ও তার স্বামী লভনে বাস করেন। তাদের একটি পুত্র আছে : রিদওয়ান মুজিব সিন্ধীক।

হাসিনা বুবই উষ্ণ এবং অতিথিপরায়ণ, কিন্তু তিনি বুব কমই বাইরে বের হন। তার পুত্র সজীব ওয়াজেদ (জয়) এবং কল্যা সায়মা শারমিন (পুতুলি), কুলে যাওয়ার সময় বাদে অধিকাংশ সময় তাদের সাধারণ ফ্যাটেই খেলাধুলা করে। অন্য সব বাচ্চাদের মতো তারাও মাঝে মাঝে বালি দিয়ে ঘরবাড়ি বানানোর খেলা খেলে। তবে অন্যদের সাথে তাদের একটু পার্থক্য আছে: তারা সব সময়ই বাড়ির সাথে একটি কবরও তৈরি করে।

কোন এক শীতের সকালে জয় যখন আমাকে প্রথমবার তাদের ফ্ল্যাটের টেরাসে সে যা তৈরি করেছে তা দেখাচ্ছিল তখন আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘এগুলো কি?’ জয় উভর দিয়েছিল ‘কবর’ তখন সে কবরগুলো ঠিকঠাক করছিল।

পুতুলি বলেছিল, ‘আমরা তো অনেকজন ছিলাম, কিন্তু সবাই এখন মৃত। ওদের কেন খুন করা হয়েছিল?’

এমন কি আট বছর বয়সী পুতুলির মনেও ঘূরে ফিরে মৃত্যু এসে হানা দেয়।

হাসিনা প্রায়ই বলেন, ‘একজন প্রকৃত মুসলিম তার শক্তিকেও ঠিকমতো কবর পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। কিন্তু আমার মা, ভাইয়েরা, ভাইদের স্ত্রীদের এবং অন্যান্য আত্মীয়দের তাদের রক্তাক্ত জামা কাপড় পরিহিত অবস্থাতেই বনানীর কবরস্থানে কবর দেয়া হয়েছিল। অথচ যারা এই জগন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল তারা দাবি করে যে তারা মুসলিম’

পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ছায়ায় বসবাস করার পর, হাসিনা হঠাতে আবিক্ষার করেন পাদপ্রদীপের আলো এবন তার উপর। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১তে হাসিনাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোনীত করা হয়। হাসিনা সব সময়ই আশা রাখতেন একদিন তিনি নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবেন এবং এই আশাটুকুই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এবার তার দেশে ফেরার সময় হয়েছিল।

বাংলাদেশে ফেরার দুই দিন আগে ১৫ মে ১৯৮১ তে একটি বিবৃতিতে হাসিনা ভারত সরকার ও সেদেশের জনগণের প্রতি তারা যে সমব্যাহিতা ও আতিথেয়তা দেখিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রতিশ্রূতি দেন যে তিনি তার বাবার আদর্শ ধরে রাখবেন এবং তার বাবার অসমাঙ্গ কাজ এগিয়ে নেবেন। দেশের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম থেকে যে প্রধান আদর্শগুলো উৎসরিত হয়েছিল সেই জাতীয়তাবাদ, গৃণত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজতন্ত্রের প্রশংসনে কোন আপোষণ্যই করা হবে না।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ যে হত্যাক্ষেত্রে চালানো হয়েছিল তার দিকে নির্দেশ করে হাসিনা বলেছিলেন :

‘আগস্ট ১৫, ১৯৭৫ অল্প সময়ের মধ্যে আমার বাবা, মা, তিনি ভাই, দুই ভাইয়ের স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ২ নভেম্বর ১৯৭৫ আমার বাবার চারজন ঘনিষ্ঠতম রাজনৈতিক সহযোগীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছিল। এই জগন্য হত্যাকাণ্ডগুলো আমাদের জাতীয় সম্মানের জন্য কলক। ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং জাতির আত্মসম্মান রক্ষার্থে এসব আত্মঘোষিত খুনিদের বিচার হওয়া প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব খুনিদের বিচার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি সত্যিকারের বাতালীর হস্তয়ে এ ক্ষত থেকে যাবে।

এখনো পর্যন্ত যে এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি তা মানবতার জন্যই একটি অপমান।

যে সব রাজনৈতিক নেতাকে তাদের প্রতি জনগণের প্রতি ভালোবাসার কারণে আইন সম্মতভাবে ক্ষমতা থেকে সরানো যায় না তাদেরকি হত্যা করার মাধ্যমে সরানো হবে? খুনকে কি রাজনৈতিক জীবনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে? সভ্য দেশগুলো কি নিজেদের ক্ষয় ক্ষতি না করে এসব আত্মীকৃত ঝুনিদের আশ্রয় দিতে পারবে? এসব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে। সারা বিশ্বের জনমতের প্রতিনিধিত্বকারীদের কাছে আমি আবেদন জানাতে চাই এই প্রশ্নগুলো বিবেচনায় নেয়ার জন্য।'

১৭ মে তারিখে শেখ হাসিনাকে শাগত জানাতে সারা ঢাকা শহর কুর্মিটোলা বিমান বন্দরগামী মিছিলের শহরে পরিণত হয়েছিল। দূরের এবং কাছের হান থেকে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে আসা হাজারো মানুষ শেখ হাসিনা কোলকাতা থেকে ঢাকায় পৌছানোর পর তাকে এক অভাবনীয় সংবর্ধনা দিয়েছিল।

যখন শেখ হাসিনাকে বহন করী ভারতীয় বোয়িং বিমানটি ঢাকায় অবতরণ করে তখন হাজার হাজার মানুষ পুলিশ প্রহরা ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বিমানটি ঘিরে ধরেছিল। কিছু আওয়ামী লীগার শেখ হাসিনাকে বিমান থেকে নেমে ট্রাকে উঠতে সহায়তা করেছিলেন।

যখন হাসিনা কথা বলছিলেন তখন চারিদিকে আকাশ বাতাস বাঁপিয়ে ‘জয় বাংলা’, ‘বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ’, ‘শেখ হাসিনা’ এসব ট্র্যাগান হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন তিনি তার বাবার আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করবেন। জনগণের পক্ষ থেকে জবাব আসছিল ‘আপনি এগিয়ে যান—আমরা আপনার সাথে আছি।’ তার চোখে পানি এসেছিল, জনতার চোখেও পানি ছিল।

এ দৃশ্যগুলোর সাথে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ মুজিবের বিজয়ীর বেঁশে দেশে ফেরার দৃশ্যগুলোর অনেক মিল ছিল।

হাসিনা একটি খোলা ট্রাকে করে বনামী কবরস্থানে যান, যেখানে তার মা, তিন ভাই, আত্মীয় স্বজনসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এর হত্যাকাণ্ডের অন্যান্য শিকারদের কবর হয়েছিল।

১৮ মে ১৯৮১ হাসিনা তার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে লঞ্চযোগে যাত্রা করেন। মুজিবের দেশে ফেরা কন্যাকে সন্তান জানাতে হাজারো মানুষ নদীর দুধারে তীড়ি জমিয়েছিল।

ঢাকায় থাকা অবস্থাতেই হাসিনা অসুস্থ ছিলেন, ১৯ মে বিকেলে টুঙ্গিপাড়ায় পৌছাতে পৌছাতে তার প্রচও জ্বর আসে। তার বাবার কবরের সামনে ‘ফাতেহা’ পাঠ করার সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।